সুভাষচন্দ্র
ও
নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চীফ এক্‌জিকিউটিভ কলিকাতা কর্পোরেশন। ১৯২৪

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

জয়শ্রী প্রকাশন
কলিকাতা ২৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

করকমলেষু

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

"নেতাজী" এবং "আজাদ হিন্দ ফৌজ" সম্বন্ধে বাঙলায় একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে ; তথ্যপূর্ণ হলেও সেগুলি প্রধানত সংকলন বা অনুবাদ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত "সুভাষচন্দ্র" সম্বন্ধে এমন কোনো বই বের হয় নি যা থেকে তাঁর ক্রমবিকশিত কর্ম-জীবনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। সাময়িক পত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধ থেকে দেশ-সেবক ও কর্মী সুভাষচন্দ্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও মানুষ হিসাবে তাঁকে বুঝবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। বর্তমান বইখানিতে সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

এ কথা সত্য যে পূর্ব এশিয়ায় "নেতাজী"র কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস সংক্ষিপ্ত হলেও তার গুরুত্ব ও চমৎকারিত্বে দেশবাসী আজ অভিভূত। কিন্তু যুবক সুভাষচন্দ্র যখন দেশ-সেবার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন তখনকার ঘটনাগুলি তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মী রূপে বর্তমান লেখকের কাছে অনেকাংশে প্রত্যক্ষ ছিল বলেই এ কথা আজ মনে করার সংগত কারণ আছে যে, পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্য থাকলেও "নেতাজী" সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সে দিনের "কংগ্রেসী" সুভাষচন্দ্রের বিশেষ মিল আছে। সেই কারণেই প্রত্যক্ষ ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে গল্প বলার মতো সাজানো হয়েছে ; তাতে "নেতাজী"র অপ্রত্যক্ষ কার্যকলাপ পাঠকের কাছে আকস্মিক বলে মনে হবে না বরং তুলনামূলক বিচার করার সুযোগ পেয়ে সুভাষচন্দ্রকে নিরপেক্ষভাবে বুঝবার সুবিধা হবে।

আমাদের বিশ্বাস, "সুভাষচন্দ্র"কে না জানলে "নেতাজী"কে সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। এ সম্পর্কে স্বদেশীযুগের 'সন্ধ্যা'-সম্পাদক স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। তিনি বলেছেন—

"অতীতের সহিত বর্তমানের সম্বন্ধ-সূত্রকে যাহারা অস্বীকার করে তাহারা মূঢ় ; পারম্পর্য হারাইয়া অচিরে তাহাদের বিনাশ ঘটে। অতীতকে ভুলিতে নাই, ভুলিলে অনাগতের ক্রমবিকাশের ব্যাঘাত ঘটে। যাহাদের বিগতের সহিত যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে— অথবা তাহা নাই, তাহারা সংকর জাতি, বর্তমানের অভ্যুদয় তাহাদের কাছে অসম্ভব, ভবিষ্যতের আশা তাহাদের নিকট নিরর্থক।

"আমি কে ? আমি ত আকস্মিক কিছু নই, আমি যে একটি অনন্তপ্রবাহী প্রবাহ ধারার বীচিবিক্ষোভ মাত্র ; ঐ ধারার পারম্পর্যের সহিত অংগাংগী হইয়াই আমার পরিচয় ; উহা হইতে ব্যবচ্ছিন্ন হইলে আমি মরুপ্রান্তরে শুকাইয়া যাই —অনন্তের দিকে আমার যে গতি ছিল তাহা চিরতরে স্তব্ধ হইয়া যায়।

"এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না যে, আমাদের পিছনে একটি মহিমাময় অতীত রহিয়াছে— তাহার ধারা আমাদের মধ্যে বহিয়া চলিয়াছে, উহা আবার সেই বিগত বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবে। কেবল ধারাটি বজায় রাখা চাই।"

সেইজন্য আমি মনে করি—অতীত দিনের স্মৃতির বিস্মৃত উপাদান এবং পরবর্তী দিনের ঘটনা ও তথ্য সমাবেশে রচিত এই বইখানি সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের সেতুবন্ধন তৈরি ক'রে তাঁর সম্পূর্ণ চরিত্র-পরিক্রমার পথকে সহজ ও সুগম ক'রে দিবে। প্রধানত এই উদ্দেশ্য নিয়েই বইখানি লেখার চেষ্টা হয়েছে।

যে সময় থেকে সুভাষচন্দ্রের সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব ঘটেছিল সে সময়ের ঘটনাগুলির জন্য আমাকে স্বভাবতই বাহিরের উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়েছে ; কিন্তু সেগুলির সংগ্রহ, সঞ্চয়ন, বিন্যাস-পদ্ধতি ও বর্ণনাভংগির একটি নিজস্ব ধারা আছে ; এতে করে সুভাষচন্দ্রের অতি আশ্চর্য কর্মজীবনের একটা সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ ও নিরন্তর গতিশীল ধারাবাহিকতা প্রকাশ পাবে বলে আমি আশা করি।

আত্মত্যাগ, দুঃখবরণ ও নির্যাতন ভোগের মধ্যে কংগ্রেসের অগ্রগতি ও অসামান্য সাফল্য আজ ঐতিহাসিক তথ্যে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেসের সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনুপ্রাণিত ও আরব্ধ সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রিক অবদানের কথা প্রত্যেক দেশবাসীর আজ জানা দরকার। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এই নূতন অধ্যায়টি তার বৈশিষ্ট্য ও গৌরবে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়েই থাকবে।

'সুভাষচন্দ্রের সত্যকার পরিচয়ে নেতাজীর চরিত্র উজ্জ্বলতর হোক'— এই আন্তরিক প্রেরণাই আমাকে এই বইখানি লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবনের ঘটনাগুলিকে তালিকাবদ্ধ করা বা সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে অপরিচিত জীবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্রকে অবলম্বন করে মহৎ ব্যক্তির জীবনী লেখার কোনো সার্থকতা আছে ব'লে আমি মনে করি না। সেই কারণেই আমার বিশেষ পরিচিত "মানুষ"

সুভাষচন্দ্রকে সম্মুখে রেখে আমি তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছি। মহামানবত্ব আরোপ করে তাঁকে কোনোখানেই ছোটো করি নি। বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ, দুর্লভ মহানুভবতা ও চরিত্রবত্তা এবং দুঃসাধ্য রাষ্ট্রিক সাধনার অসাধারণত্বে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র ও জীবন, আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু। সেই আশ্চর্য জীবন ও মধুর চরিত্রকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার মতো অন্তরদৃষ্টি আমার আছে কিনা জানি না। তবে তাঁকে জীবন্ত করে দেখবার আন্তরিক চেষ্টা আমি করেছি, কারণ জীবনে তাঁকে জীবন্তভাবেই দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে পাঠকের সংখ্যা আজ অগণিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁরা যদি এই বইখানি পাঠ ক'রে তৃপ্ত পান, তা হলে আমি মনে করব আমার এই আন্তরিক চেষ্টা সার্থক হয়েছে।

ব্যাপক ধর্মঘট এবং সাম্প্রদায়িক কলহের পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠুর আত্ম-প্রকাশের জন্য বইখানি প্রকাশ করতে বিলম্ব ঘটল এবং আবশ্যক দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য ইচ্ছানুরূপ সৌষ্ঠব সম্পাদন করতে পারা গেল না। তার জন্য পাঠকদের কাছে আমি পূর্বাহ্লেই ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

আমার এই বইখানির জন্য প্রাসঙ্গিক ফোটো বা ব্লক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন— শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার), শ্রীযুক্ত ভবতোষ ঘটক (বসুমতী), শ্রীযুক্ত অমল হোম (মিউনিসিপ্যাল গেজেট) শ্রীযুক্ত অজিত গুপ্ত (ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও), ন্যাশানাল হাফটোন কোঃ; শ্রীমান সুনীলকুমার বসু (প্রেসিডেন্সি ফার্মেসি), ডি. রতন (ফোটোগ্রাফার), শ্রীযুক্ত অজিত সেন (স্টুডিও লুসি) এবং ওমেগা প্রেস। আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

এখানে বলা দরকার যে সুভাষচন্দ্র বা নেতাজী সম্বন্ধে বই লিখবার ইচ্ছা থাকলেও একাধিক কারণে ইতস্ততঃ করেছি— কিন্তু "নালন্দা প্রেস"-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্রের বিশেষ আগ্রহে আজ 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' বইখানি প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল। এই বইখানি প্রকাশে সহায়তা করে তিনি আমার এবং দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

স্বপ্ন-সায়র
১৬এ বিপিন পাল রোড
পোঃ কালীঘাট। কলিকাতা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের

ভূমিকা

কবি-সাহিত্যিক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' প্রকাশিত হবার পর প্রায় চার দশককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সুভাষচন্দ্র ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগ দেবার গোড়ার দিনগুলি থেকে ১৯২৪-এর অক্টোবরে রাজবন্দী না হওয়া পর্যন্ত এই বইয়ের লেখক গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছেন। লেখকের ভাষায়: "...আমার বিশেষ পরিচিত "মানুষ" সুভাষচন্দ্রকে সম্মুখে রেখে আমি তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছি।" নেতাজীরূপে সুভাষচন্দ্রকে লেখক দেখেছেন অপ্রত্যক্ষভাবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং তার পূর্বে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় বিপ্লবের মহানায়করূপে এবং তাঁর সৃষ্ট আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর অতুলনীয় ত্যাগ, দুঃখবরণ, মাতৃভূমির শৃংখল-মোচনের জন্য অকুতোভয় সংগ্রামের সীমাহীন বীর্যবত্তায়। লেখকের দৃষ্টিতে, 'অসহযোগ' যুগের সুভাষচন্দ্রের উত্তরণ হয়েছে যুদ্ধকালীন বৈপ্লবিক সংগ্রামের নেতাজী সুভাষচন্দ্রে এবং লেখক মনে করেন: "এই বইখানি সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনের সেতু বন্ধন তৈরি করে তার সম্পূর্ণ চরিত্র পরিক্রমার পথকে সহজ ও সুগম করে" দিয়েছে।

কিন্তু আরম্ভেরও আরম্ভ রয়েছে। সুভাষ-চরিত্রের অংকুরোদ্গম হয়েছিল 'অসহযোগ' যুগেরও বহু পূর্বে— বাল্যে ও কৈশোরে কটকের স্কুলজীবনে। তারও পূর্বে শৈশবের পারিবারিক পরিবেশে নিজেকে তিনি একেবারেই তুচ্ছ মনে করতেন। অনেক ভাই-বোন-আত্মীয়-পরিজন-সেবক-পরিচারকদের বৃহৎ পরিবারে শিশু সুভাষ নিজেকে যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলতেন, নিজের কোনো বৈশিষ্ট্যের সন্ধান তিনি খুঁজে পেতেন না। ফলে একদিকে যেমন তিনি নিঃসংগতাবোধে পীড়িত হয়েছেন তেমনি তাঁর এই অকিঞ্চিৎকরতাবোধকে কাটিয়ে ওঠবার জন্য কঠিন পরিশ্রমের ও নমনীয়তার প্রেরণা ধীরে ধীরে তাঁর অবচেতন মনে দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু বৃহৎ পারিবারিক পরিবেশে বর্ধিত হবার অন্যদিকও রয়েছে যা তাঁর শিশুমনকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। বৃহৎ পরিবারে একসঙ্গে মানুষ হয়ে ওঠা, পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, অতিথিপরায়ণতা, পরিবারের সেবক-পরিচারক-আশ্রিতদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা,

আপন-পরবুদ্ধি পরিহার করে সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকার একটা সমাজ-সচেতনতা, সেই শিশুকালেই সুভাষমানসে ঠাঁই পেয়ে যায়। তাঁর জীবনের পরার্থ-পরতাবোধও এই পারিবারিক পরিবেশেই নিহিত ছিল। পরার্থপরতার এই মূল্যবোধই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণতার অভিশাপ থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে। পরার্থপরতার মূল্যবোধ সেদিনকার সমাজেও যেমন ভাস্বর ছিল বর্তমান শিল্পাশ্রয়ী সমাজেও মানব-চরিত্রের এই মহৎ উপাদানটি স্বার্থপরতার গ্লানি থেকে বেশ-কিছু মানুষকে দূরে রেখেছে।

কটকের প্রটেস্টান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে পাঁচ বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স পর্যন্ত পাঠ নেবার সময় বালক সুভাষচন্দ্র স্কুলের ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি স্কুল-কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণে বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় হিসাবে তাঁরা আর এক জাতের লোক ;— "as Indians we are a class apart, though we belonged to the same institution." কটকের সেই ইউরোপীয় স্কুলের বিজাতীয় পরিবেশে বালক সুভাষচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে তাঁরা স্কুলের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথিবীতে বাস করছেন। আত্মজীবনীতে তিনি পরিষ্কারই বলেছেন : "We had been living in two distinct worlds"— একটি ইউরোপীয় স্কুলের বিজাতীয় ভাবধারার পৃথিবী, দেশের মানুষ ও মাটির সঙ্গে যা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন, আর অপরটি ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারায় সমৃদ্ধ, ভারতীয় জীবনবোধের পৃথিবীরূপে যার পরিচয়।

ভারতীয়ত্ববোধের এই সচেতনতা নিয়েই বালক সুভাষ মিশনারি স্কুলের বিজাতীয় পরিবেশে সাত বছর পাঠ নেবার পর ১৯০৯ সালে কটক র‍্যাভেন্‌শ স্কুলের ভারতীয় পরিবেশে স্থান করে নিলেন। এবার আর দুই পৃথিবীতে বাস নয়। এবার আর তাঁর সমাজ, পরিবার ও স্কুলের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে কোনো বিরোধ রইল না। র‍্যাভেন্‌শ স্কুলের নূতন পরিবেশে বালক সুভাষ-চন্দ্র যেন নিজেকে খুঁজে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি একেবারে তুচ্ছ নন— তাঁরও কিছু মূল্য আছে। নূতন পরিবেশে আত্ম-মূল্যায়ন তাঁকে তৃপ্তি ও প্রশান্তি দিয়ে তাঁর চরিত্রে আত্ম-প্রত্যয়ের ভিত্‌ গড়ে তুলল। আর আত্ম-প্রত্যয়ই তো জীবনে সাফল্যের সোপান। সুভাষ-মানসের এই বনিয়াদ কৈশোর-যৌবনের দিকে যতই অগ্রসর হতে লাগল, নূতন নূতন কঠিন পরীক্ষা এসে তাঁকে ঘিরে ধরল। যৌবনের সংশয়-জীর্ণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আবর্ত

থেকে কিশোর সুভাষ যখন উত্তরণের পথ খুঁজছেন, তাঁর অন্তর্মুখীন মন যখন মানসিক সংঘাতের তীব্র দহনে আকুল হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক আচার্য বেণীমাধব দাসের ব্যক্তিত্ব সুভাষচন্দ্রের মানস-লোকে সুপ্ত নৈতিকতাবোধে নাড়া দিয়ে যায়। আচার্য বেণীমাধবের মননলোকের আরো সান্নিধ্যে এসে কিশোর সুভাষ জীবনে একটি আদর্শের সন্ধান পেলেন। আচার্য বেণীমাধব তাঁকে নির্দেশ পৌঁছে দিলেন 'প্রকৃতির কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দাও'— প্রকৃতির সংগে একাত্ম হবার সাধনা মনে প্রশান্তি দেবে, অনাবিল আনন্দ দেবে এবং দুর্জয় শক্তি দেবে।

প্রকৃতির সংগে একাত্মবোধের সাধনা কিছুটা পথের সন্ধান দিলেও অশান্ত কিশোরের উত্তাল মনে প্রশান্তির স্নিগ্ধতা দূরের বস্তুই রয়ে গেল। এমন একটি আদর্শবোধের সন্ধান চাই, যা জীবনের সকল জিজ্ঞাসার মীমাংসাও যেমন দেবে, তার চাইতেও আরো বেশি, যে আদর্শের বেদীমূলে জীবনকে একান্তভাবে নিবেদন করা চলবে। কিশোর সুভাষ এইভাবে জীবন-জিজ্ঞাসার সংকটের আবর্তে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মানুসন্ধানে নিজেকে যে-সময় তোলপাড় করে তুলছেন, সেই মর্মন্তুদ মানসিক দহন-পীড়নের মধ্যে অকস্মাৎ তাঁর জীবনে বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলেন। বয়স তাঁর তখন সবেমাত্র পনেরো। তাঁর জীবনে বিবেকানন্দর আবির্ভাবের সংগে সংগে আত্ম-আবিষ্কারের প্রহরও শুরু হয়ে গেল। আত্মজীবনীতে সুভাষচন্দ্র নিজেই বলছেন: 'আমার জীবনে অকস্মাৎ বিপ্লব ঘটে গেল এবং সবই ওলটপালট হয়ে গেল।' তিনি আরো বলেছেন যে তাঁর প্রধান শিক্ষক তাঁর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধের ও নৈতিকতা-বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছেন বটে কিন্তু তিনি এমন আদর্শবোধের সন্ধান দিতে পারেন নাই যার বেদীমূলে সমগ্র সত্তাকে পরম ঐকান্তিকতায় নিবেদন করা যায়। বিবেকানন্দ তাঁকে এই অনির্বচনীয় সম্পদের সন্ধান দিলেন। বিবেকা-নন্দ তাঁর জীবনের লক্ষ্যপথ স্থির করে দিলেন— দ্বৈত-সাধনার পথ; 'নিজের মুক্তি-সাধন ও মানবসেবা'। অবশ্য বিবেকানন্দ একথাও বলেছেন যে আত্মমুক্তির চিন্তাও আত্মস্বার্থের চিন্তা, অতএব এই চিন্তাও বর্জন করতে হবে। মানবিকতার বেদীমূলে নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করতে হবে। এই আদর্শ-বোধই তাঁকে অধ্যাত্মসাধনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যোগাভ্যাসের প্রয়াস যার ফলশ্রুতি। মানবসেবার আদর্শ থেকে স্বদেশসেবায় এবং স্বদেশসেবা থেকে বিপ্লবসাধনায়— এই পর্যায়ক্রমিক পথ পরিক্রমা করে আত্মোপলব্ধির গভীরে

সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করলেন। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে দেখেছিলেন দেবতাত্মা মাতৃভূমিরূপে— Divine Motherland রূপে, চিন্ময়ী দেশমাতারূপে। ত্যাগব্রত, সেবাব্রত ও শক্তি-সাধনার স্পন্দন আত্মার গভীরে সংহত হয়ে যেমন পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন অনিবার্য করে তুলবে তেমনি ভারতবর্ষের দুঃখ-দৈন্য-জর্জর অগণিত সাধারণ মানুষকে শোষণ-পীড়ন-লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি দেবে। ত্যাগ, সেবা ও শক্তিসাধনার আদর্শ— ভারতীয়ত্ববোধের এই শিক্ষা বিবেকানন্দের জীবনবেদ থেকে যেমন সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি তার অনুষঙ্গরূপে মানবতাবোধের— 'জগদ্ধিতায় চ'— শিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনবোধের গভীরে তাই কালক্রমে এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল হয়েছিল যে ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তিতে বিশ্বমানবতার নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে। হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণের উপসংহারে তাই সুভাষচন্দ্র নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন: "India freed means humanity saved."

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন সুভাষচন্দ্রকে দিয়েছিলেন 'মানুষ' হবার দুর্জয় সংকল্প, তেমনি দিয়েছিলেন অকুতোভয় শক্তি-সাধনা। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব-এর 'টাকা-মাটি-মাটি-টাকা'র সাধনাই সুভাষচন্দ্রকে পরিপূর্ণ ত্যাগের পথ দেখিয়ে দেয়। সুভাষচন্দ্রের জীবনে কৈশোরের জীবন-জিজ্ঞাসায় যেমন ভগবদ্ভক্তির প্রবণতা দেখা গেছে, তেমনি নিজের সত্তা সম্পর্কে নানা প্রশ্নে নিজেই অঙ্কুশবিদ্ধ হয়েছেন। মানুষ জন্মগ্রহণ করে কেন? কী উদ্দেশ্যে জীবনধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের লক্ষ্যই বা কী?— এই আত্ম-জিজ্ঞাসা থেকেই অন্তিম সাধনার পথ অবারিত হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র অনন্তের সন্ধানে একবার গৃহত্যাগ করেছিলেন। যে বালক কটকের ইউরোপীয় স্কুলে নিজেকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে করতেন সে তার কৈশোরের আঠারো বছর বয়সে, ১৯১৫-র আগস্ট মাসে গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লিখছেন "...আমি এটা দিন দিন বুঝিতেছি যে আমার জীবনের একটা definite mission আছে তারই জন্য আমার শরীর ধারণ..."। আরো লিখলেন সেই চিঠিতেই, "মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিষ চাই"— ব্যক্তিকে 'অতীতের প্রতিভূ হতে হবে', 'বর্তমানের ফসল হতে হবে' এবং 'ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে'। 'এই আদর্শগুলিকে একটি জাতির জীবনে সার্থক করে তুলতে হবে— ভারতবর্ষ থেকেই শুরু করা যাক-না?'

১৯১৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে উনিশ বছর বয়সে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন, কলেজের অধ্যাপক ওটেনের দুর্বিনীত আচরণের বিরুদ্ধে সহপাঠী ছাত্রদের প্রতিবাদের প্রতিভূরূপে। এই ঘটনায় সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রবল আত্ম-শক্তির যে পরিচয় নিজেই পেয়েছিলেন তা বিবৃত করে আত্ম-জীবনীতে বলছেন : "অধ্যক্ষ আমাকে বহিস্কার করে দিয়েছিলেন কিন্তু আমার জীবনের ভবিষ্যৎও তিনি নির্ধারিত করে দেন।... যে আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যমের পরিচয় সেদিন আমার মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, পরবর্তীকালে সেই ছিল আমার পাথেয়। আমি নেতৃত্বের স্বাদ সেদিন পেয়েছি এবং পেয়েছি দুঃখবরণের গভীর আনন্দ।"

মাত্র কয়েক মাস লন্ডনে প্রস্তুতির পর সুভাষচন্দ্র ১৯২০ সালে ২৩ বছর বয়সে সিভিল সার্ভিসে চতুর্থ স্থান অধিকার করে সাতমাস পরই আ.ই. সি. এস. চাকুরি থেকে পদত্যাগ করলেন। পরীক্ষার ফল বার হবার পর ১৯২০-র ২২ সেপ্টেম্বর 'মেজদা' শরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন যে তার পক্ষে... "স্রোতে গা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়াটাই শ্রেষ্ঠ পথ নহে। সংগ্রাম ভিন্ন, বিবাদ ভিন্ন জীবনের স্বাদই অনেকখানি অন্তর্হিত হইয়া যায়...।" ১৯২১-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি 'মেজদা'কে লিখছেন : "—আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই।... বিদেশী শাসকের অধীনে চাকুরী করা ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথ আমার নিকট নিঃস্বার্থ ও অনুপ্রেরণার পথ—।" এর পর ২৩ ফেব্রুয়ারির চিঠিতে জাতীয় বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে আত্মনিবেদনের সংকল্প জানিয়ে সুভাষচন্দ্র বলছেন :—"সাংসারিক উন্নতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিলেই তবেই জাতীয় কর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করা সম্ভব।... আমার বিশ্বাস এই আত্মত্যাগের দ্বারা সেই দাবি মিটাইতে পারিব।"

বিপ্লবী সুভাষের অঙ্কুর এই চিঠিগুলিই বহন করছে।

ছাত্র অবস্থায় সুভাষচন্দ্র অহিংসার পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বিচার করেছিলেন। গান্ধীজীর কাছে অহিংসা জীবনের একটি মৌলিক নীতিরূপে দেখা দিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র শান্তিপূর্ণ অহিংসা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছিলেন দেশের পরিস্থিতি বিচারে। ১৯১৪ সালে গুরু-সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। সুস্থ হয়ে ওঠার সময় শয্যাশায়ী অবস্থায়ই তিনি তাঁর সকল ধারণার পুনর্বিচার করেন। ভারতবর্ষের সামরিক প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সে-সময়কার ভাবনা সম্পর্কে আত্মজীবনীতে লিখেছেন :—

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা অবিভাজ্য।... যুদ্ধ দেখাইয়া দিয়াছে যে জাতির সামরিক শক্তি নাই, সে জাতি তাহার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে এরূপ আশা করা যায় না।" ১৯১৪ সালে জাতীয় সামরিক শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা ১৯২৮-এ সামরিক কায়দায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের মধ্যে তা রূপ নেয় এবং তা চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর জন্মলগ্নে।

১৯২১ এর ১৬ জুলাই আই. সি. এস. বর্জন করে সুভাষচন্দ্র যেদিন জাহাজ থেকে বোম্বাই-এ নামলেন তার পূর্বেই তার মধ্যে বিপ্লবী মহানায়কের অংকুরোদ্গম দেখা যায়। অসহযোগ আন্দোলন থেকে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি অনিবার্য-ভাবে মুঞ্জরিত হয়ে সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্ররূপে ইতিহাস-পুরুষের প্রতিষ্ঠা দিয়ে যায় ৮

গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণে প্রথম মুদ্রণের পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত সুভাষ-চন্দ্রের রচনাগুলি : তরুণের আহ্বান দলাদলির হোক অবসান, জাতীয় শিক্ষার কথা, স্বামী বিবেকানন্দ 'সুভাষ-রচনাবলী' ভুক্ত হয়েছে বিবেচনায় বর্জিত হল। পূর্বের আলোকচিত্রের পরিবর্তে স্বতন্ত্র কয়েকটি আলোকচিত্র মুদ্রিত হল।

গ্রন্থকারের সহধর্মিণী শ্রীমতী সতী দেবীর সহৃদয় অনুমতি প্রদানের জন্য বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হল, এজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুনীল দাস

বিষয়সূচী

বিপ্লবী জীবনের প্রথম অধ্যায়

[১৯২০—১৯২৪]

দেশ-কারাগার ৩, চিত্ত-বিক্ষোভ ৪, চিত্তরঞ্জনের সর্বস্বত্যাগ ৫, স্টার থিয়েটারে-ছাত্রসভা ৮, কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়াতন ১১, বিদ্যাপীঠ ও আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় ১৩, জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ১৫, বিদ্যাপীঠে বিশৃংখলা ১৬, সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকর ১৮, সুভাষচন্দ্র ও বিদ্যাপীঠ ২৩, দেশবন্ধুর হৃদয়-মাধুর্য ২৫, বিদ্যাপীঠে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ২৬, রবীন্দ্র-সন্দর্শনে সুভাষচন্দ্র ৩০, কিরণশংকর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ৩১, যুবরাজ সংবর্ধনা-বয়কট ৩২, দমন-নীতির প্রকোপ ৩৫, উত্তরবঙ্গ বন্যায় আর্তের সেবা ৩৮, গান্ধীজির বীরভূম সফর ৪০, বিদ্যাপীঠে অভিনন্দন ৪১, চিত্তরঞ্জন 'দেশবন্ধু' নামে অভিনন্দিত ৪২, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ৪৩, দেশবন্ধুর নামের মাহাত্ম্য ৪৫, স্বাপ্নিক সুভাষচন্দ্র ৪৮, 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন ও 'ফরওয়ার্ড'এর সূচনা ৪৮, নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনী ৫১, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ ৫২, কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র ৫৬, 'ফরওয়ার্ড' অফিসে ৫৮, কে কাকে ভয় দেখায় ? ৫৮, শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র ৫৯, গোপীনাথ সাহার ফাঁসি ৬১, সহকর্মী ও বন্ধুর প্রতি দরদ ৬৩, নদীয়ায় কাউন্সিল-নির্বাচন ৬৬, সাহেব কোম্পানির বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ ৬৭, 'ফরওয়ার্ড' পরিচালনা ৬৯, স্বরাজ্যপার্টি ও নলিনীরঞ্জন ৭০, কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের কর্মব্যস্ততা ৭১, সুভাষচন্দ্র ও সন্ত্রাসবাদ ৭২

[১৯২৫-১৯৩০]

দেশবন্ধুর তিরোধান ৭৬, কিরণশংকর রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি ৭৯, বিপিনচন্দ্র পালের শ্রদ্ধাতর্পণ ৮১, "মৃত্যুহীন প্রাণ" ৮২, সাইমন কমিশন ও ছাত্র-সংগঠনে সুভাষচন্দ্র ৮৫, কলিকাতা-কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রদর্শনী ৮৭, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা ৮৯, ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ৯০, পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ ৯০, বাঙলা কংগ্রেসের দলাদলি ৯১

[১৯৩১-১৯৩৯

গোল টেবিল বৈঠক ৯৪, 'স্বাধীনতা দিবস'-এ শোভাযাত্রা ৯৪, আইন-অমান্য ও বন্দাবিলা সত্যাগ্রহ ৯৫, আইন-অমান্য আন্দোলনে নলিনীরঞ্জন ও বিধানচন্দ্র ৯৬, হিজলী বন্দী-আবাস ৯৭, জাতীয় পতাকা উৎসব ৯৭, আবার বন্দীজীবন ৯৯, সুভাষচন্দ্র ও ভি. জে. প্যাটেল ৯৯, সুভাষচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ ১০০, পুনরায় ইউরোপ যাত্রা ১০০, ৩ আইনে আবার বন্দী ১০১, বিনাশর্তে মুক্তিলাভ ১০১, আবার ইউরোপ যাত্রা : হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত ১০১, শান্তিনিকেতন যাত্রা ১০২, ত্রিপুরী-কংগ্রেস ১০২

বিপ্লবী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

[১৯৩৯-১৯৪১]

রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা ১০৫, 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সংগঠন ১০৫, রবীন্দ্র-নাথ-কর্তৃক অভিনন্দিত ১০৬, 'মহাজাতি সদন' প্রতিষ্ঠা ১০৬, রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলন ১০৭, বাঙলাদেশে কর্মপ্রচেষ্টা ১০৭, সুভাষচন্দ্রের সংগে শেষবার সাক্ষাৎ ১০৮, ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ১১২

বিপ্লবী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়

[১৯৪১]

অন্তর্ধানের আয়োজন ১১৫, সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ১১৫, নিরুদ্দেশ-যাত্রা ১১৭, ভারতসরকার-কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের সংবাদ জ্ঞাপন ১২০, সুভাষ-চন্দ্রের মৃত্যু রটনা ১২১, ক্রীপ্‌স্‌ ও অ্যামেরির বিবৃতি ১২১

বিপ্লবী জীবনের চতুর্থ অধ্যায়

[১৯৪১-১৯৪৫]

ইউরোপে আজাদ হিন্দ সংঘ ১২৫, ব্রিটিশ দূতাবাসে সিনর ও-মোজোটা ১২৫, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা ১২৬, ইউরোপ ত্যাগের চেষ্টা ১২৮, টোকিওতে আগমন ১২৮, ভারতীয় স্বাধীসতা সংঘ ও প্রথম আই. এন. এ. ১২৮, জাতীয়বাহিনী পুনর্গঠনের চেষ্টা ১৩০, ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও প্রথম আই. এন. এ.-র পুনর্গঠন ১৩২, সেবা-শুশ্রূষার জন্য মহিলা বিভাগ

১৩২, জাপানীদের প্রতি মনোভাব ১৩৩, পূর্ব-এশিয়ার ভ্রাতৃসংঘ ১৩৪, টোকিওতে সুভাষচন্দ্র ১৩৫, সুভাষচন্দ্রের আগমনের পূর্বে ১৩৭, সিংগাপুরে স্বাধীনতা সংঘের অধিবেশন ১৩৯, সিংগাপুরে সামরিক পরিদর্শন ১৪০, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট ১৪১, সুভাষচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ ১৪৪, হেডকোয়াটার্স স্থানান্তরিত ১৪৬, ইম্ফল আক্রমণ ১৪৮, পূর্ব-এশিয়ায় সংগ্রামের শেষ অধ্যায় ১৪৯, নেতাজীর দ্বিতীয়বার মৃত্যু ১৫১, ঘটনা ও রটনা ১৫৩, আলফ্রেড ওয়াগের বিবৃতি ১৫৫, নেতাজী জীবিত না মৃত ? ১৫৯

পূর্বানুবৃত্তি

আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্টের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ১৬১, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য ১৬৮, সাধারণ সৈনিকের বিবৃতি ১৭৫, ঝাঁসীরানী বাহিনীর কার্যকলাপ ১৮২, দৈনন্দিন জীবনে সুভাষবাবু ১৮৩, কারাগারে সুভাষচন্দ্র ১৮৫, সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ১৮৯, বসু-পরিবার ১৯৩, সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র ১৯৫, সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড-ব্লক ১৯৬, গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য ১৯৯, সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ও সহকর্মী ২০৩, সুভাষচন্দ্র ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ২০৫, বৈদেশিক শক্তির সহিত যোগাযোগ ২০৭, জাপানের সহায়তা লাভের চেষ্টা ২০৯, সম্মিলিত এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ২০৯, চীনের সহিত যোগাযোগ সাধন ২১০, সাময়িক স্বাধীন গভর্নমেন্ট স্থাপন ও বৈদেশিক সহায়তা লাভ ২১০, জার্মানী ও জাপানের সংগে সম্বন্ধ ২১২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২১৭

পরিশিষ্ট

দেশনায়ক ২২১, হুকুমনামা ও বাণী ২২৬, সুভাষচন্দ্রের চিঠি ২৩৩

চিত্রসূচী

১, চীফ একজিকিউটিভ কলিকাতা কর্পোরেশন। ১৯২৪

২, বাংলাদেশের এক পল্লীতে— বরিশালের উজিরপুরে প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর বাড়ীতে। ১৯৩১

৩, কার্লসবাদ। ১৯৩৫

৪, সিংগাপুর ক্যাথে হলের সম্মুখে

৫, এস. চ্যাটার্জী, এম. জেড. কিয়ানী এবং হবিবুর রহমান-এর সংগে

৬, বেতার ভাষণরত। সিংগাপুর

বিপ্লবী জীবনের প্রথম অধ্যায়

দেশ-কারাগার : ১৯২০-২৪

১৯২০ সালের বাঙলা— সে বাঙলা সোনার বাঙলা নয় ;— সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙলাদেশের বাণীমূর্তি কবি-কল্পনায় সমাদৃত কিন্তু তার বাস্তব রূপ দেখলে বেদনায় ভরে ওঠে মন— এ যেন এক বিশাল কারাগারে বন্দী হয়ে থাকা। আশা নাই, উৎসাহ নাই— ধ্বংসোন্মুখ জাতির স্তিমিত জীবনে "আলোর ইশারা আসে"— কিন্তু সে কদাচিৎ। দেশ-কারাগারে বন্দী মানবাত্মার মর্মব্যথা নিরুপায় আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত করে তোলে। কিন্তু যে অন্তর্দাহে মানুষ নিজে জ্বলে উঠে অপরকে জ্বালিয়ে দেয়— সে দেহের একান্ত অভাব ঘটেছে বলেও মনে হয় না।

অন্ধ সংস্কারের মোহ, দাসসুলভ মনোভাব, স্বজন-বিদ্বেষ ও আত্মপ্রবঞ্চনা সমগ্র জাতির চেতনাকে মূঢ় ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তার উপর পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি, পরবশ্যতার কলঙ্ক, প্রতিদিনের অন্যায় বিধানের কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ, স্বজন সংগ্রামে শক্তিক্ষয়, পরমত-সহিষ্ণুতার অভাবে গৃহ-বিচ্ছেদ— বাঙালীর জীবনকে তখন দুর্বহ করে তুলেছে। প্রত্যহের বিড়ম্বনার সঙ্গে পদে পদে অপমান অসহ্য হয়ে উঠেছে তখন পরাধীনতার মর্মান্তিক উপলব্ধিতে।

> শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি
> শরমের ডালি,
> নিশি-নিশি রুদ্ধ ঘরে, ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
> ধূমাঙ্কিত কালি,
> লাভক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
> কলহ সংশয়—
> সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
> দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

পরাধীন জাতির দুর্বলতার মধ্যে তার আত্মবিস্মৃতির গ্লানি সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ও মর্মান্তিক। জাতিকে পঙ্গু করতে, দেশ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভুলিয়ে দেবার পক্ষে এমন প্রতিক্রিয়াশীল মানসিক দুর্বলতা আর দ্বিতীয়টি নাই। তাই তখন দেখতে পেলাম উর্বর-মস্তিষ্ক বাঙালী মাদ্রাজীর বুদ্ধি দেখে তারিখ করে, সর্বত্যাগী বাঙালী মারোয়াড়ীর ত্যাগ দেখে মুগ্ধ হয়, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত নির্ভীক বাঙালী মারহাট্টির বীরপনার কথা শুনে

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয় ; রাজা দিব্য, প্রতাপাদিত্য ও ঈশাখাঁর স্বজাতি বাঙালী পাঞ্জাবীর সামরিক শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়, নিখিল ভারতের রাষ্ট্রগুরু বাঙালী বোম্বায়ের রাজনৈতিক আতসবাজি দেখে বাহবা দেয়। আদর্শ-প্রচারক বাঙালী আদর্শের অন্বেষণে বাহির হয় বাঙলার বাহিরে গুজরাটে ; চিন্তা ও ভাবুকতা, জাতীয় প্রচেষ্টা ও কর্মকুশলতায় অগ্রণী বাঙালী সেদিন নেতৃত্বের দায়িত্ব বাঙলার বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে স্বজাতির নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে।

বাঙালী চিত্তরঞ্জন একথা মর্মে মর্মে বুঝলেন ; বুঝলেন বাঙালীকে এই মোহমুগ্ধ দুর্গম্বার ভেঙে জাগিয়ে তুলতে হবে তার আত্মবিস্মৃতির অচৈতন্য অবস্থা থেকে। নিজের সত্যকার পরিচয়ে সেদিনই হবে বাঙালী জীবনের নব অভ্যুদয়। তিনি বললেন— "সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ চিত্তে পবিত্রপ্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না।" সেইসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী সেদিন বাঙালীকে তার কল্যাণ-বুদ্ধিতে জাগিয়ে তুলল—

"বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট।

চিত্ত-বিক্ষোভ

আমি তখন বাঙলায় এম.এ. পড়ছি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের 'ইন্ডিয়ান বুক ক্লাব' থেকে অধ্যাপক হেমন্তকুমার সরকার আমার প্রথম কবিতার বই 'পল্লী-ব্যথা' সবেমাত্র প্রকাশ করেছেন। তখনকার দিনে ইন্ডিয়ান বুক ক্লাবে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ছোটো বড়ো নেতাদের নিয়ে বেশ একটি মজলিশ গড়ে উঠেছিল— তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে— নদীয়া জেলাটি বাঙলাদেশের মধ্যে যেমন

দরিদ্র তেমনি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত। পল্লীগ্রামে সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নাই, হাসি নাই, উৎসব নাই, ক্রমশ জনশূন্য হয়ে বাঙলাদেশের বুকে শ্মশানের পর শ্মশান সৃষ্টি করে চলেছে। স্বতসর্বস্ব পল্লীবাসীর মলিন মুখ দেখলে মনে হয় পল্লীগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁর চির আদরের পল্লীমন্দির ছেড়ে, তাঁর স্নেহের সন্তানদের এই দুর্ভর দুর্ভাগ্যের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেছেন। কী ব্যথায় ও কী নৈরাশ্যে তিনি তাদের পরিত্যাগ করেছেন-- সেই কথা ভাবতে ভাবতে মনটা মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠত। কতখানি যে তাঁর দুঃখ, কী গভীর যে তাঁর অভিমান, কী মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে যে তিনি নিরুদ্দিষ্ট, সেকথা একদিন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে, প্রেতলোক ও নরলোকের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। তাই আমার ব্যথাতুর মন পল্লীমায়ের সন্ধানে গ্রামে গ্রামে, পথে পথে ঘুরে বেড়াত— কিন্তু কোনো সন্ধানই তাঁর মিলত না। মা আমার ভগ্নমন্দিরে নাই, জীর্ণ অট্টালিকায় নাই, দরিদ্রের কুটীরে নাই, গৃহস্থের মণ্ডপে নাই, ধানের ক্ষেতে নাই, স্নানের ঘাটে নাই, ধেনুচরা মাঠে নাই, নির্জন খেয়া-পারাপারের প্রায় পরিত্যক্ত নদীর ধারেও নাই। ঘনশ্যাম আম্রকুঞ্জের সদা-অন্ধকার সংকীর্ণ পথে পথেও তাঁর সন্ধানে ফিরেছে আমার ভারাক্রান্ত মন, তাই 'পল্লীব্যথা'য় নিরুদ্দিষ্ট পল্লীমায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করেছিল তাঁর একজন দীনতম পল্লীকবি। কিন্তু তার কাতর আহ্বান ফিরে এল তারি বুকের মাঝে। এলোমেলো হাওয়ায় জাগল নৈরাশ্যের হাহাকার— বহুদূর থেকে ভেসে আসা কার যেন চাপা কান্নার করুণ সুর। অভিশপ্ত পলাশীর প্রান্তর থেকে সে কান্না ভেসে গিয়ে লাগল লুপ্তগৌরব নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে। অনুভব করলাম, সেই অস্ফুট আর্তনাদই তো আমার বুকে বার বার আঘাত করেছে, অবিরাম শুনেছি মায়ের দীর্ঘশ্বাস— বেদনা ও নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস। মনে হল পল্লী-মায়ের চোখের জলে যেন গঙ্গার গেরুয়া রঙেও সেদিন মালিন্য দেখা দিয়েছে।

চিত্তরঞ্জনের সর্বস্বত্যাগ

ঠিক এমনি সময়, ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজীর "অহিংস অসহযোগ"-এর প্রস্তাব গৃহীত হল। গান্ধীজী বললেন —

"If India had the sword today, she would have drawn the sword."

অর্থাৎ নিরস্ত্র ভারতের হাতে তরবারি থাকলে সে তাই নিয়ে আজ যুদ্ধ করত। তা' যখন নাই তখন নিরস্ত্র দেশের পক্ষে অহিংস অসহযোগই হবে তার স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রকৃষ্ট অস্ত্র।

গান্ধীজীর সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করবেন বলে স্থির করলেন। নাগপুর কংগ্রেস থেকে প্রত্যাবর্তন করে, অহংকারশূন্য মনে, শান্ত সমাহিত চিত্তে বাঙলাদেশে বাঙালী জাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে— চিত্তরঞ্জন যেদিন সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন, সেদিন বাঙলাদেশে আশ্চর্যরকম সাড়া পড়ে গেল। তার পর থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে গ্রামে গ্রামে ভেসে চলল বাঙলাদেশের অন্তস্থল আলোড়িত করে। এক বিরাট বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হল জনগণমনের মরানদীর কূলে কূলে। ইতিপূর্বে গান্ধীজী স্বয়ং বাঙলাদেশ ঘুরে যা করতে পারেন নি, একা চিত্তরঞ্জন তা সফল করে তুললেন। চিত্তরঞ্জন আইন ব্যাবসা ত্যাগ করলেন— সে খবরটা মির্জাপুর পার্কের (বর্তমান শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) জনসভা থেকে সারা বাঙলাদেশ ছড়িয়ে পড়ল।— অনতিকালমধ্যে দেশবাসীর মনে এমন উন্মাদনার সৃষ্টি হল যে উকিল ওকালতি ছাড়ল, অধ্যাপক অধ্যাপনা ছাড়ল, ছাত্রেরা স্কুলকলেজ ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগদান করবার জন্য দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। মনে হল— "এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে ?"

সরকারী ও বেসরকারী বহুজনের সম্মেলনে বাঙলা কংগ্রেস ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এলেন না, তাঁরাও অন্তরাল থেকে আন্দোলনের সহায়তা করতে লাগলেন।

দেশসেবার সৌভাগ্য কজনের হয় ? দেশসেবার মধ্যে বিনীত অন্তরের পরিপূর্ণ নিবেদন দেশ-দেবতার চরণে ঢেলে দেওয়ার আনন্দই বা কজনের ভাগ্যে ঘটে ? চিত্তরঞ্জন বললেন, "যাঁদের জন্য আমাদের কাজ, সর্বপ্রথম তাদেরকেই ভালোবাসতে হবে— দেশের মঙ্গলের জন্য কাজে হাত দেওয়া মানে দেশবাসীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। অনুদার অনুকম্পামিশ্রিত দেশসেবার কোনো মূল্য নাই ; সমবেদনা যেখানে স্বজন জ্ঞানে, আত্মীয়জ্ঞানে গভীর, সেখানেই তার সার্থকতা" —এই উপলব্ধির সত্যকার পরিচয় পেলাম আমরা চিত্তরঞ্জনের স্বদেশ সেবার পরিকল্পনায়। যে গণ-আন্দোলন এবং জনগণের সঙ্গে সহজ সংযোগের কথায় আজ কোনো কোনো স্বয়ং-স্বতন্ত্র দল মুখরিত, আমরা চিত্তরঞ্জনের কৃষক ও মুটে-

মজুরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ বাণীর মধ্যে সেই কথাই নূতন করে শুনতে পেলাম। অনশনক্লিষ্ট, রোগশীর্ণ, বহুদিনের অত্যাচারে অবসন্ন, অনাদর ও উপেক্ষায় ম্রিয়মাণ যে বাঙলাদেশের দরিদ্রের দল— তাদের মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন।

স্বামী বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণের সেবার আদর্শ চিত্তরঞ্জনের এবং উত্তরকালে সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার আদর্শে মূর্ত হতে দেখা গেল।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি। এখনো মনে পড়ে— সেদিন সেই শীতের রাত্রে আকাশের ঘনঘটার কথা। সাগরদ্বীপের ঝোড়ো হাওয়া প্রবলবেগে ছুটে চলে গেল কলিকাতা শহরের মাথার উপর দিয়ে। আকাশে মেঘ থম্‌থম্‌ করছে, বিদ্যুৎস্ফুরণের বিরাম নাই— সেই বিনিদ্র রাত্রির নির্জন অন্ধকারে ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসে— উৎকণ্ঠিত শয্যায় শুয়ে শুয়ে মানসচক্ষে দেখতে পেলাম দেশমাতৃকার বিষণ্ণ মূর্তি— ব্যথায় মন ভরে উঠল। নির্বাক নিশ্চল মায়ের সে মূর্তি, এলায়িত ঘন কুন্তলে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের সঞ্চার; সেই ঘনায়মান নিরাশার অন্ধকারে মানসচক্ষে দেখতে পেলাম— কালভৈরবের শ্মশান জাগরণ— শুনতে পেলাম, তাল-বেতালের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাজছে শত সহস্র নর-কপাল, শুনতে পেলাম, অযুত লক্ষ জীর্ণ পঞ্জরের কঠিন সংঘাতের বিকট শব্দ। সেই দুর্যোগে দূর দুর্গম পথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছে আজ এ কোন্‌ অগণ্য নরনারী ও শিশুর মিছিল? আমার শয়নশিয়রের মূর্তি মুহূর্তের মধ্যে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। তার স্থানে দেখতে পেলাম, মৃত্যুবিজয়িনী শ্মশানচারিণী ভৈরবী— যোগাসনে ধ্যানমগ্না।

মাগো, তুমি আজ কোন্‌ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আলুলায়িতকুন্তলা, রক্তাম্বরা, নিমীলিত-লোচনা, যোগারূঢ়া ভৈরবী? কিসের এ দুশ্চর্য তপস্যা তোমার? স্তিমিত জীবন-দীপে কোন্‌ মন্ত্রে তুমি আজ জ্বালাবে শান্তি ও কল্যাণের অনির্বাণ স্নিগ্ধ শিখা? সন্তানের বেদনাতপ্ত ললাটে তোমার স্নেহশীতল স্পর্শ কবে এঁকে দেবে 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'র রেখা? তাদের অবরুদ্ধ কণ্ঠে তোমার বরাভয়ে কবে ফুটে উঠবে মা, নব অভ্যুদয়ের নবতম বাণী?

বহুদূর থেকে মিলিতকণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"বন্দেমাতরম্‌। বন্দেমাতরম্‌। বন্দেমাতরম॥"

এ স্বপ্ন মানুষ কদাচ কখনো দেখবার সুযোগ পায়। পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাম কাটিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলাম।

আমি তখন স্বর্গীয় মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী -প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক— অধ্যাপক ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক। ১১ নং কলেজ স্কোয়ারে 'উপাসনা' কার্যালয়ে এসে ছাত্রবন্ধুদের মজলিস বসল। বেলা চারটার মধ্যে আমাদের ক্লাসের আমারই মতো ছয় জন বৃত্তিভোগী ছাত্র. বাঙলার এম.এ. ক্লাস থেকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচে গেলাম। কলেজে যাই, অধ্যাপকের বক্তৃতা কানে যায় না, সময় যেন আর কাটে না, বিরক্তিতে মন যেন বিষিয়ে ওঠে। তা থেকে যেন নিষ্কৃতি পেলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে অধ্যাপনা করতেন শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার (হেমন্তদা)। তাঁর সঙ্গে এই নিয়ে গোপনে আলাপ-আলোচনা চলত। কখনো সেনেট হলের পিছনে, কখনো বা কলেজ স্ট্রীটে তাঁর পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসের (মন্নু ব্রাদার্সের উপর) তিন তলার ঘরে।

তিনি একদিন বললেন, পি-এইচ-ডি.-র 'থিসিস' ফেরত নিয়ে এলাম। তাঁর 'রুমমেট' শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাগচী (ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ডি-লিট, প্যারিস) বললেন, "আমার এত কষ্ট করে টাইপ করা তা হলে সব ব্যর্থ হয়ে গেল ?" হেমন্তদা উদাসীনভাবে বললেন, 'উপায় কি ? কিছু ভালো লাগে না ভাই। ঠিক হয়ে গেছে, সাবিত্রী, দু-একদিনের মধ্যেই চাকরি ছাড়ছি।" আমি বললাম, 'শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী' হতেও পারে। তিনি বললেন, "আমার চাইতে বোধ হয় আর কেউ বেশি খুশি হবে না।"

এর ঠিক দুদিন পরেই আমি কলেজ ছেড়ে দিই। কলেজ ছাড়ার পর থেকে বুকের ভার যেন নেমে গেল। তাই বলছিলাম, 'উপাসনা' অফিসের দরজা-জানালাহীন ঘরটিতে এসে সেদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেন বেঁচেছিলাম।

স্টার থিয়েটারে ছাত্রসভা

তার পরের দিনই কলকাতায় ছাত্রদলের বিরাট সভা ; স্থান : স্টার থিয়েটার (স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, কারণ তিনি সভার জন্য জায়গা দিয়ে সেদিন খুব নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন) সময় : অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা। বক্তা : মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলি, চিত্তরঞ্জন দাশ এবং

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের গান্ধী-শিষ্য (নামটি ঠিক স্মরণ নেই, বোধ হয় মি. টমাস) এই মর্মে হ্যান্ডবিল বিলি হয়ে গেল। 'উপাসনা' কার্যালয়ে বসে বসে বেলা যেন আর পড়ে না। বেলা চারটার মধ্যে ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এসে হাজির হলেন। তাঁদের মুখচোখের ভাব দেখে মনে হল কিছু একটা ব্যাপার যেন ঘটেছে। তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারা গেল —মাত্র পাঁচ-ছয় জন ছাড়া সকলেই প্রায় 'অসহযোগ' করেছেন। শুনেছি, যখন অধ্যাপক রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ স্যার আশুতোষকে সংবাদটি জানিয়ে বলেছিলেন, আমার বাঙলা ক্লাসের সব ভালোছেলেগুলিই আজ কলেজ ছেড়ে দিলে, তখন স্যার আশুতোষ উত্তর দিয়েছিলেন—'ভালো ছেলে বলেই ছেড়ে দিয়েছে।'

পাঁচটা বাজতে-না-বাজতে আমরা স্টার থিয়েটার অভিমুখে রওনা হলাম। গিয়ে দেখি তিল ধারণের স্থান নাই। চিরদিনই দলের পান্ডা বলে স্থান সংগ্রহে আমায় বেগ পেতে হল না। সেদিন সেই অগণিত ছাত্র-বন্ধুদের দেখে মনে হল, এদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশও যদি দেশের কাজে সাড়া দেয় তা হলে বাঙলাদেশের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া সার্থক হবে।

অধীর প্রতীক্ষায় কখন ৬টা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। নেতৃবৃন্দের দেখা নাই। স্টেজের উপর হঠাৎ চিত্তরঞ্জনকে দেখা গেল ; তাঁর পিছনে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। গান্ধীজী কাঁধ থেকে একটা মস্ত বড়ো বোঁচকা নামিয়ে বসে পড়লেন। পাশে বসলেন কস্তুরবাঈ গান্ধী, অ্যাটর্নি কুমারকৃষ্ণ মিত্র দাঁড়িয়ে বললেন যে নেতৃবৃন্দ এতক্ষণ নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে 'তিলক স্বরাজ্য ভান্ডার'-এর জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁদের আনতে বিলম্ব হয়েছে, এবার সভার কাজ আরম্ভ হবে।

চিত্তরঞ্জন সামনের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'ছাত্রদের মধ্যে যিনি প্রথম কলেজ ছেড়েছেন তিনিই এই ছাত্র-সভায় সভাপতিত্ব করবেন।'— বন্ধুবর চারু সরকার আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন "এবার তোমার পালা।" হেমন্তদা সমবেত ছাত্রগণের মধ্যে আমাকে খুঁজছিলেন। বন্ধুরা হৈ-হৈ করে আমাকে ঠেলে এগিয়ে দিলেন। তিনি আমার হাত ধরে তুলে নিলেন স্টেজের উপর। চিত্তরঞ্জন বললেন 'That's right', আমার তখন বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। পাঞ্জাবির নীচের গেঞ্জিটা ভিজে উঠেছে। হেমন্তদার প্রস্তাবে এবং চিত্তরঞ্জনের সমর্থনে সভাপতি হয়ে চেয়ারে বসতে গিয়ে আমার যেন বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। কী এমন কাজ আমি করেছি ? কতটুকুই বা আমার

সামর্থ্য ? দেশের কাজের যোগ্যতা আমার মতো সামান্য ছাত্রের আছেই বা কী? সভার কাজ আরম্ভ হতেই অনেকটা নিজেকে সামলে নিলাম। হেমন্তদা টেবিলের উপর কর্মসূচী রেখে বললেন: আরম্ভ করো। তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জন অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন ইংরাজীতে। কর্মসূচীও লেখা থাকত দেখেছি ইংরাজীতে। আমি একে একে বলে যেতে লাগলাম: I call upon C.R. Das to address the students. যতদূর আমার মনে আছে চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতার সারাংশ এই— তোমরা যে গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ আমার আহ্বানে, এতে আমার যে কী আনন্দ হয়েছে তোমরা সেটা বুঝতে পারবে না। তোমরাই আমাদের আশা-ভরসা, তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে আমার বুকের বল বেড়ে যাবে চতুর্গুণ। আমি ইংরাজের রক্তচক্ষুকে ভ্রূক্ষেপও করব না। জানি দেশের অনেক কাজ তোমাদের মুখ চেয়ে আছে। তবু আমি চাই, সর্বাগ্রে তোমরা শিক্ষিত হও। তাই আজ আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, বাঙলাদেশের জাতীয় শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে তোমাদের নিয়ে। আমি এমন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব, যার গৌরবে সারা ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হবে। তোমরা জান না —ছাত্রসম্প্রদায় আমার কতখানি প্রিয়, কতখানি নির্ভর করি আমি তাদের শক্তি ও উদ্যমের উপর। আজ তোমাদের যাত্রাপথের পাথেয় বঙ্গবাণীর আশীর্বাদ, সকল দেশের শুভ ইচ্ছা আজ তোমাদের জয়যাত্রার পথকে সুগম করে দেবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর গান্ধীজী, মৌলানা মহম্মদ আলি, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হেমন্তবাবু ও মি. টমাস ছাত্রদের অভিনন্দিত করে বক্তৃতা দিলেন। আমার বেশ মনে আছে "I call upon Mahatma Gandhi to address the students"— এই কটা কথা বলতে আমি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তারপর আমার পালা। আমি কী বলেছিলাম, সব কথা আমার স্মরণ নেই, তবে আমি বলেছিলাম যে পথের ভিখারীকে ধরে জরির পোশাক পরিয়ে যদি যুদ্ধের ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে তার যা অবস্থা হয়, আমার অবস্থা বোধ হয় তার চেয়েও আজ সঙ্গিন। তারপর ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা তখনো ইতস্তত করছেন, তাঁদেরকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য আহ্বান করে আমার বক্তৃতা শেষ হয়।

সভাভঙ্গের পর সবান্ধবে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। বক্ষের দ্রুত স্পন্দন তখনো থামে নি। আনন্দে, গর্বে ও তৃপ্তিতে সারা মনটি তখন ভরে উঠেছিল। অন্যমনস্কভাবে মেসে যখন ফিরলাম তখন রাত্রি দশটা বেজে গেছে।

এই ছাত্রসভার পরবর্তী একমাসের মধ্যেই কলিকাতা ও বাহিরের হাজার হাজার ছাত্র স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিলে।

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে এই-সকল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে কলিকাতা বিদ্যাপীঠ (Calcutta National College) এবং স্কুলেপড়া ছাত্রদের জন্য বাঙলাদেশময় তখন যে অসংখ্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলির পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন (Board of National Education) স্থাপিত হয়। বিদ্যাপীঠ ও বিদ্যায়তনের উদ্বোধন করলেন মহাত্মাজী নিজে— চিত্তরঞ্জন অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না। গান্ধীজীর অভিভাষণে প্রকাশ পেল যে তিনি এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের খুব সার্থকতা আছে বলে মনে করেন না। আমি যতদূর জানি বিদ্যালয়ের নামকরণের মূলে ছিলেন চিত্তরঞ্জন নিজে এবং নায়ক সম্পাদক স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'ফরবস ম্যান্‌সন'-এ ১০০০ টাকা ভাড়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (একতলা) কলিকাতা বিদ্যাপীঠ ও গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন এবং আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় (দুতলা তিনতলা) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠামূলে প্রধানত ডা. কুমুদশঙ্কর রায়, ডা. সুন্দরীমোহন দাস, এবং ডা. এস. সি. সেনের চেষ্টা ছিল। সে সময় আমরা দেখেছি বাঙলাদেশের কংগ্রেসী চেষ্টার কেন্দ্রস্থল ছিল এই 'ফরবস ম্যানসন'।

কলিকাতা বিদাপীঠের অধ্যক্ষপদের এবং গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হলেন খ্যাতনামা বক্তা, অধ্যাপক ও দেশসেবক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়— এবং ব্যবস্থাপক বিভাগের কর্মকর্তা হলেন, বিপ্লবীযুগের বিখ্যাত কর্মী শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন। তাঁর সহকারী ছিলেন পরবর্তীকালের 'ভোটরঙ্গ' ও 'বন্দেমাতরম্' -সম্পাদক শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও সাংবাদিক অমূল্যচন্দ্র সেন।

কলেজ ছাড়ার পর প্রায় দুইমাস কাল 'কর্মযোগ' সিরিজ নাম দিয়ে— 'গাঁয়ের মায়া' 'গ্রামের কথা' 'অকাজের কাজ' 'কংগ্রেস ও অসহযোগ' প্রভৃতি পাঁচ-ছয়খানি বই প্রকাশ করে বিদ্যালয়-ছাড়া বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। এক-এক একখানি বই-এর দু-তিনটি সং-সংস্করণও হয়েছিল কিন্তু যাদের জন্য এই চেষ্টা তাদের কিছু সাহায্য করতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না।

এই সময় ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রীটের একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেসের সুপারিন-টেনডেন্ট ছিলাম— এই দুইমাসের মধ্যে আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বাঙলার ভাগ্যাকাশের অনেকগুলি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাঁরা এই মেসে থেকে কলিকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে এসেছিলেন— তাঁদের মধ্যে কেহবা প্রকাশ্য দিবালোকে, কেহবা রজনীর অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারে দু-তিন মাসের 'সিট্ রেন্ট' বাকী রেখে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ; সম্ভবত পাড়াগাঁয়ে দেশের কাজে। যাই হোক, কোনোরকমে বাড়িওলার ভাড়া মিটিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলছি এমন সময় ঢাকা থেকে হেমন্তদার একখানি চিঠি পেলাম। চিত্ত-রঞ্জন তখন কংগ্রেসের প্রচারকার্যে পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়েছেন, সঙ্গে হেমন্তদা এবং আরো কয়েকজন।

হেমন্তদার চিঠিখানির সারমর্ম এই যে চিত্তরঞ্জন আমার কথা অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রলালকে বলে এসেছেন এবং সেই অনুসারে আমি যেন অবিলম্বে জিতেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কলিকাতা বিদ্যাপীঠের বাঙলা অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করি। যেহেতু এটি চিত্তরঞ্জনের ইচ্ছা— আমি যেন কোনোরকম ইতস্তত না করি। ছাত্র থেকে একেবারে অধ্যাপকের পদে— অসহযোগ করার লাভটা তা হলে মন্দ হল না ভেবে মনে মনে খুশিই হলাম।

বাংলা কংগ্রেসের এবং অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা জিতেন্দ্র-লালকে সভায় বক্তৃতা দিতে শুনেছি, তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়েছি, নির্ভীকতায় সপ্রশংস শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাঁর উদ্দেশে— কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না তাঁর সঙ্গে। কিন্তু সেদিন বেলা নয়টা আন্দাজ যখন তাঁর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়ির দোতলায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম তখন তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করে নিলেন— যেন আমি অনেকদিনের পরিচিত বন্ধু। তিনি হেমন্তদার চিঠিখানি পড়ে বললেন, 'তাহলে আজই আসুন। কেমন ?'

আমি বললাম, 'বেশ। কিন্তু আমার উপর নির্ভর— ।' তিনি বললেন— 'বিলক্ষণ।'

একজন অসহযোগী ছাত্র— জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকপদে বৃত হলেন ত্যাগের অতিরিক্ত বহুগুণ মুনাফা সমেত সসম্মানে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের 'ফরবস্ ম্যানসন' (Forbes Mansion) বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। সেই অসহযোগ আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল ছিল এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটি। সেখানে গিয়ে

দেখি উপরের তলায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, নীচের তলায় কংগ্রেস—ফুটপাতে, স্কোয়ারে, উঠানে লোকে লোকারণ্য। চারিদিকে যেন একটা উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সকলের চোখমুখে উৎসাহের ভাব ফুটে উঠেছে, চারিদিকে বিভিন্ন প্রকার কর্মব্যস্ততা। সবার উপর ছাত্রদের আনন্দ-কোলাহলে বাড়িখানি মুখরিত। সে যে কী দৃশ্য, নিজের চোখে যে না দেখেছে তাকে বোঝাতে পারব না। আমার বিশ্বাস এখানকার পরিবেশটির মধ্যে বহুজনের সহযোগ ও কর্মপ্রচেষ্টা বহু ক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সংহত করে এইপ্রকার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল বলেই— বিলাত-প্রত্যাগত সুভাষচন্দ্রের মন এমনভাবে এখানকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

ভিড় ঠেলে বিদ্যাপীঠের অফিসঘরে এসে পৌঁছলাম; সেখানে দশ-বারো জন স্বেচ্ছাসেবক অসহযোগ ছাত্রদের ভর্তি করছেন— আদ্য (Matriculation), মধ্য (Intermediate) ও উপাধি (Bachelor of Arts) শ্রেণীতে। মাঝখানে বসে আছেন জিতেনবাবু— তাঁর চারিপাশে আরো দু-চারজন ভদ্রলোক। জিতেনবাবুকে নমস্কার করে বসতেই তিনি একে একে অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের মধ্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (বর্তমানে দৈনিক 'ভারত'-এর কর্ণধার) প্রমুখের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় হল। বিদ্যাপীঠে আমার অধ্যাপক জীবনের এই দিনটি এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠ ও আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়

মাস ছয়েকের মধ্যেই কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রসংখ্যা একহাজারে দাঁড়িয়েছিল। ডা. কুমুদশংকর রায় পরিচালিত আয়ুর্বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রসংখ্যাও দাঁড়িয়েছিল ঐরকম। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময়। গৌড়ীয় সর্ববিদায়তনের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য যে 'আদ্য' পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল— তাতে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা এত অধিক হয়েছিল যে সকলের স্থান-সংকুলান করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাঙলা ভাষার 'জিজ্ঞাসাপত্র' (Question Paper) তৈরি করার ভার পড়েছিল আমার উপর। অধ্যাপক-সমিতির আমি অন্যতম সদস্য ছিলাম। এ সময় আমাদের সভা বসত খুব ঘন ঘন। এতে প্রায়ই যোগদান করতেন —নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছাত্রদের সভায় মাঝে মাঝে

ভারতীয় সভ্যতা, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। এইপ্রকার ধারাবাহিক বক্তৃতার (Extension Lecture) পরিকল্পনা চিত্তরঞ্জনের নিজস্ব। পরে এতে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও যোগদান করেছিলেন। তখনকার দিনে 'বাঙ্গালী' ও 'সুলভ সমাচার' নামে দুখানা কাগজেই পাঁচকড়িবাবু সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখতেন। সন্ধ্যায় ঐ দুটি কাগজে যা লিখতেন তাতে কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনাই থাকত কিন্তু সকালের 'নায়ক' কাগজে তিনি তার সুদ সমেত শোধ করে দিতেন কংগ্রেসের জয়-জয়কারে। চিত্তরঞ্জন বুঝতেন সাংবাদিকদের পরবশ্যতার কথা ; তাই এতে মনে তো কিছু করতেনই না বরং যার যে গুণটুকু আছে, তার কাছ থেকে দেশের কাজে সেটুকু লাগানোর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। বিদ্যায়তনের পরিচালন সমিতির অধিবেশনে আমি চিত্তরঞ্জনের খুব নিকটে আসার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করেছিলাম।

তখনকার দিনে অনেকে, এমন-কি রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন যে চিত্তরঞ্জন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যেই উৎকৃষ্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার স্তোকবাক্য দিয়েছেন বাঙলাদেশের ভাবপ্রবণ ছেলেদের। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি— অপ্রত্যাশিতভাবে নানা প্রতিকূল ঘটনা এসে বাধার সৃষ্টি না করলে— (যথা Criminal Law Amendment Act) অন্তত বাঙলাদেশে জাতীয় শিক্ষার পাকা বনিয়াদের পত্তন হতই। অন্য দিকে যাই হোক— আজকের দিনে সুন্দরীমোহন, কুমুদশংকর, এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয় তখন প্রতিষ্ঠিত না হলে— আজ আমরা কলিকাতায় গোরাচাঁদ রোডের চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল দেখতে পেতাম না ; সেখান থেকে পাস করে বহু ডাক্তার পল্লীগ্রামে রোগার্তের সেবা করারও সুযোগ পেতেন না। কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মধ্যেও আজ অনেকে কৃতী হয়েহয়েছেন। যথা— বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্তমান সম্পাদক— কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বাঙলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী ও সাংবাদিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী, Hindusthan Standard কাগজের অন্যতম সম্পাদক ভবেশ নাগ, Amrita Bazar-এর ব্যাবসা বাণিজ্য বিভাগের অন্যতম সম্পাদক কুলেন্দু পাল ; ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন— পরেশ চট্টোপাধ্যায় (চা-বাগান), শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইউরেকা পাবলিসিটি, কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস, ইন্ডিয়া মেটাল কর্পোরেশন), বঙ্গীয় আইন সভার অন্যতম সদস্য সুকুমার দত্ত, বিশিষ্ট সাংবাদিক শৈলেন রায়, অধ্যাপক ডা. বটকৃষ্ণ বসু (বিদ্যা-

পীঠের অধ্যাপক অরবিন্দ বসুর পুত্র), অচ্যুত মিত্র (নৃতত্ত্ববিদ্) এবং বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী হিমাংশু সেনগুপ্ত।

জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা

ছাত্রদের স্কুল-কলেজ ছাড়াবার আন্দোলন আরম্ভ করবার পূর্বে চিত্তরঞ্জন অধিকাংশ প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে বিশেষত বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল গিরিশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন, একথা আমরা জানি। এ প্রসঙ্গে তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম— সেটা সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে। অসুস্থ দেহে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বারস্থ হয়ে চিত্তরঞ্জন হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। সে-সব কথার বিশদ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ও কার্যক্ষেত্রে তাকে রূপ দেবার আন্তরিক চেষ্টা তাঁর ছিল। বাঙলা দেশের ছাত্রদের সাময়িক উত্তেজনাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হন নি একথা জোর করে বলা যায়। তবে কেন যে তিনি এ চেষ্টায় বিফল হয়েছিলেন তার কারণ সে সময় যাঁরা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাই জানেন। চিত্তরঞ্জন বলতেন "আমাদের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে যদিবা আমাদের দেশের অন্তরের যোগ থাকে, তার রাষ্ট্র, তার সমাজ ও আচার-ব্যবহার, তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যদি তার সম্পর্ক লুপ্ত হয়ে যায়, তা হলে সে শিক্ষা জাতির স্বাভাবিক উত্থানের পথে বাধার সৃষ্টি করবে এবং তার মনুষ্যত্বকে খর্ব করে রাখবে। যে শিক্ষা মনুষ্যত্ব বাড়ায়, সাহস বাড়ায়, নিজের অধিকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা এনে দেয়, যে শিক্ষায় বাঙালী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারে— আমি শুধু বাঙালী নই,— আমি পরিপূর্ণ মানুষ, জাতি হিসেবে স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার, ন্যায্য দাবি সেই শিক্ষাই আমাদের জাতীয় শিক্ষা।" তিনি পাঁচকড়িবাবুকে একদিন বললেন— "দেখুন, একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ নামকরণ থেকে আমাদের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে যাতে একেবারে নিজস্ব বলে মনে করতে পারি— সে চেষ্টার আরম্ভ হবে আমাদের স্কুল ও কলেজ থেকে।"

এরই ফলে আমাদের শিক্ষা-মণ্ডলের নামকরণ হল। Board of Education for Bengal-এর নাম "গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন", Calcutta National College-এর নাম "কলিকাতা বিদ্যাপীঠ"। Principal-এর নাম হল আচার্য,

Chancellor মহামাণ্ডলিক, Vice-Chancellor উপ-মাণ্ডলিক, Council সংসদ, office কার্যালয়, Matriculation আদ্য, Intermediate মধ্য এবং Bachelor of Arts উপাধি। এ-সকল নামকরণ সবই প্রায় পাঁচকড়িবাবুর।

পাঁচকড়িবাবু ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু ; দুজনে এক সময় 'বসুমতী'তে সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় খুব স্নেহ করতেন বলে চিত্তরঞ্জনের বার্তাবহ হয়ে অনেকদিন তাঁর কাছে আমাকে যেতে হত। একদিন দুজনে বিদ্যাপীঠ থেকে বেরিয়ে বোবাজার স্ট্রীট দিয়ে 'বাঙ্গালী' অফিসের দিকে চলেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনি কি 'বাঙ্গালী' ছাড়তে পারেন না!" আমার এই আকস্মিক প্রশ্নে তিনি বললেন— 'কেন বল্ দিকি ? চিত্ত কিছু তোকে বলেছে ?" সত্যই আমি সেদিন চিত্তরঞ্জনের কথা বলবার জন্যই পাঁচকড়িবাবুর সঙ্গ নিয়েছিলাম। আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন— "তুই তো জানিস— বৃহৎ সংসারের খরচ অনেক— 'বাঙ্গালীর' একশো টাকা ছাড়া আমার পক্ষে চালানো মুশকিল।' পরদিনই সকালে আমি পাঁচকড়িবাবুকে বলে এলাম দুশো টাকা দক্ষিণায় বিদ্যাপীঠে আপনার Extension Lecture-এর ব্যবস্থা করেছেন চিত্তরঞ্জন। পাঁচকড়িবাবু সকালবেলা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের 'নায়ক' অফিসে বসে রোজ একবাটি দুধ ও খানকতক গরম জিলিপি খেতেন— সেদিন আমার ভাগ্যেও মিষ্টির বরাদ্দ যা হয়েছিল, ঠিক তাকে যৎসামান্য মিষ্টিমুখ বলা চলে না।

বিদ্যাপীঠে বিশৃঙ্খলা

কিছুদিন পরে বিদ্যাপীঠের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের সংখ্যা নানারকম বিশৃংখলার জন্য ক্রমশ কমে আসতে লাগল। জিতেন্দ্রলাল বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া আসতেন না। যে 'আদ্য' পরীক্ষার কথা আগে বলেছি সেই ব্যাপারে জিতেন্দ্রবাবুকে নিয়ে খুব মুশকিলে পড়তে হয়েছিল— কারণ তিনি নিজে একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক হয়েও কোনোদিন বিশ্বাস করেন নি যে সত্যই বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। 'আদ্য' পরীক্ষার প্রথম দিন পরীক্ষার্থীরা পোঁছে গেছে কিন্তু অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রলালের কাছে জিজ্ঞাসাপত্র (Question Paper) ; তাঁর দেখা নাই। খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছি— মাখনবাবু বললেন— এ সময় তাঁকে 'ইডেন গার্ডেন'-এ পাবেন। আমি বললাম, 'তার মানে' ? উত্তর পেলাম 'তিনি এখন ঐখানেই বেড়াতে যান।' ট্যাক্সি নিয়ে

সেখানে গিয়ে দেখি— জিতেন্দ্রবাবু নিশ্চিত মনে সেখানে পায়চারণা করছেন। আমাকে দেখেই বললেন "ওঃ। ভারি ভুল হয়ে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সিতে করে তাঁর বাড়ি এসে জিনিসপত্রগুলি নিয়ে বিদ্যাপীঠে ফিরে এলাম। লজ্জা রক্ষা হল বটে কিন্তু ভারি একটা ধাক্কা খেলাম মনে। সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের অন্তরে চিত্তরঞ্জন আজ অধিষ্ঠিত— জনসাধারণ তাঁর ত্যাগে মুগ্ধ, কাজে গর্বান্বিত, কিন্তু যাঁদের নিয়ে তাঁকে কংগ্রেসের কাজ চালাতে হবে তাঁদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকে চিত্তরঞ্জন অনেক বিড়ম্বনা তখন ভোগ করেছেন, নানা-ভাবে বাধা পাচ্ছেন দলাদলির উত্তেজনায়। সেই দলাদলির বিষ বিদ্যাপীঠের আবহাওয়াতেও সঞ্চারিত হতে দেখা গেল। এজন্য মনে মনে খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম।— এমন সময় কয়েকটি ছাত্রের ন্যায়সংগত অনুযোগ আমাকে আরো বিব্রত করে তুলল। আমি তাদের প্রতিশ্রুতি দিলাম— দাশ মহাশয়ের কাছে যাচ্ছি— হয় বিদ্যাপীঠ সত্যকার 'কলেজ' তবে, না-হয় সেখানে To-Let লেখা থাকবে।

দেশবন্ধুর উপর অভিমান হল— ভাবলাম এ-সব তবে কি স্তোকবাক্য? ছাত্রেরা যাঁদের উপর নির্ভর করে এখানে এসেছে তাঁদের অবহেলায় সব নষ্ট হয়ে যাবে? বিদ্যাপীঠে এইরকম অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলাই চলবে? এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতে এসে যখন উপস্থিত হলাম তখন বেলা বারোটা। বসবার ঘরে প্রবেশ করে দেখি দশ-বারোজন লোক বসে আছে— দেশবন্ধুর স্নানাহার হয় নি। হেমন্তদা (তিনি তখন চিত্তরঞ্জনের রসা রোডের বাড়িতেই থাকতেন) বার বার উপরে যাবার জন্য তাঁকে কড়া তাগিদ দিচ্ছেন।

দেশবন্ধু আমাকে দেখে বললেন— "কী হে সাবিত্রী, খবর কি?" আমি বললাম— 'আপনি স্নানাহার সেরে বিশ্রাম করে নীচেয় নামলে বলব'খন।' "আচ্ছা বসো"— বলে তিনি উপরে চলে গেলেন।

ঠিক এই সময়েই বাঙলার নেতৃবৃন্দের মন চট্টগ্রাম ধর্মঘটের ব্যাপারে চঞ্চল হয়েছিল। আমার যতদূর জানা আছে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারের বহু পরিমাণ অর্থ ধর্মঘটীদের জন্য ব্যয় করতে হয়েছিল। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে বাঙলা কংগ্রেসের মধ্যে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে একটা ছোটোখাটো দলের সৃষ্টি হল। তারা নানাপ্রকার মিথ্যা কথা ও অমূলক ঘটনা প্রচার করে দেশবন্ধুর দলের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস উৎপাদন করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দেশ-

বন্ধুর ত্যাগ, কর্মকুশলতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে বিরুদ্ধ দলের হীন চেষ্টা অবিলম্বেই বিফল হয়ে গিয়েছিল।

দেশবন্ধুর মুখেই শুনেছিলাম— সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকেই সিভিলিয়ানের পদে ইস্তফা দিয়েছেন এবং সত্বরই দেশে ফিরে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। সুভাষচন্দ্র ১৯২০ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ হয়ে পাস করেন এবং ১৯২১ সালে কেমব্রিজ থেকে 'দর্শন'এ (Philosophy) সসম্মানে পাস করেন। তিনি প্রথমে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাইলে— তিনিই তাঁকে দেশবন্ধুর কাছে উপস্থিত হতে উপদেশ দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন সাহেবের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রমহলে সুভাষচন্দ্র বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারকে উপলক্ষ করে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় "ছাত্র-শাসন-তন্ত্র" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন —তাও আমাদের মনে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যথেষ্ট বিস্ময় ও অনুরাগের সৃষ্টি করেছিল। সেই কারণেই আমি আশা করেছিলাম যে তিনি দেশে ফিরে যদি দেশের জাতীয় শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তা হলে একটা সত্যকার কাজ হবে। দেশের অন্য দিকের কাজে আমার কোনো যোগ্যতা বা সামর্থ্য ছিল না বলেই আমার কাছে এটা বিশেষ প্রলোভনের বিষয় ছিল যে আমি জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজের জীবন কাটিয়ে দেব। পরে বুঝেছিলাম— স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরাট ক্ষেত্র থেকে শিক্ষা সংসদের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে ধার রাখবার কল্পনাও বাতুলতা।

সংশোধিত ফৌজদারী আইন পাস হয়ে গেলে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন ব্যাপারে তিনি যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন— তাতে মনে হয়েছিল সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের নিয়ে পঠন-পাঠন করতে জন্মান নি। দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে আছে তাঁর কর্মের আহ্বান। নিত্য নূতনভাবে তাঁর ডাক পড়লে তাঁকে গিয়ে দাঁড়াতেও হবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে।

সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকর

সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকর রায় প্রায় একই সঙ্গে বিলাত থেকে দেশে ফেরেন। কিরণবাবু দ্বিতীয়বার বিলাত যাবার আগে সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯২০ সালের শেষাশেষি তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে

ফিরলেন। বহরমপুরের শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম সেন (বর্তমানে আলিপুরের জজ) কিরণবাবুদের জামাই— তাঁরই সঙ্গে গিয়ে 'সবুজপত্র'-এর প্রসিদ্ধ লেখক কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আমার হয়েছিল তাতে বুঝেছিলাম যে তিনি প্রধানত একজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যে তাঁর অধিকার দেখে বুঝেছিলাম তিনি একজন রসজ্ঞ ব্যক্তি— তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির জন্য তিনি অনেকের কাছে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু সুরসিক, সদালাপী ও স্নেহশীল বন্ধু হিসাবেই তিনি আমাকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং কদিনের যাতায়াতে আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। কার্যান্তরে ব্যাপৃত থাকলেও সত্যকার বন্ধুত্ব যে লোপ পায় না কিরণবাবু সম্পর্কে আমার পক্ষে সে কথাটা খুব খাটে। যা-হোক, তিনি ও সুভাষচন্দ্র এই দুই ব্যক্তির আশা নিয়েই আমি সেদিন বিদ্যাপীঠ সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ার জন্য দেশবন্ধুর কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু হেমন্তদার সঙ্গে কথা কয়ে জানলাম যে আমার সে আশা নাকি দুরাশা। কেননা, দাশ-দ্বেষী পূর্বকথিত দলটি এই দুজনেরই কানে এমন বিষ ঢেলে দিয়েছেন যে তাঁরা এদিকে ভিড়বেনই কিনা সে-বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

সবটা নয় তবে আসল ব্যাপারের কিছুটা খুলে বলা যেতে পারে। 'কিছুটা' এইজন্য যে সত্যকার রাজনৈতিক স্মৃতিকথা বেঁচে থেকে লিখতে গেলে গর্দান দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় কিন্তু সম্প্রতি সে মহান ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত নই। অতএব সবকথা আজ বলতে পারব না এবং বলে লাভও নেই।

সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকর বিলাত থেকে ফিরেই কংগ্রেসী মহলে অজ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা ক'রে বাঙলাদেশের আসল অবস্থাটা জানবার চেষ্টা করেন। চট্টগ্রাম ধর্মঘট ব্যাপারে কংগ্রেসকে জড়িয়ে তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারের প্রচুর অর্থ খরচ করে দাশ মহাশয় যে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন এবং এতে করে যে কী পরিমাণ অনর্থ ঘটেছে এবং ঘটতে যাচ্ছে তা যদিও তিনি স্বীকার করেন না— তবু তাঁর স্বেচ্ছাচারিতাই যে এ-সবের জন্য একমাত্র দায়ী এ-সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে বিরুদ্ধ দলের জনৈক ভদ্রলোক এতৎসম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে তাঁকে উপর্যুপরি কয়েকখানি চিঠি দিয়েছেন সেগুলি দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকরের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে উদ্যত হলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কর্মস্থলে আসবার সময় তিনি খদ্দরের ফতুয়াটা বদল করে এসেছেন, তারই পকেটে চিঠিগুলি রয়ে গেছে ; তবে তিনি আগন্তুকদ্বয়কে আশ্বাস দিলেন যে

ফতুয়াটি যদি ধোপার বাড়ি না গিয়ে থাকে তা হলে কাল তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কথার অকাট্য প্রমাণ তাঁদের দেখাতে পারবেন। তবুও তিনি খুব উৎসুকভাবে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে দেখতে লাগলেন; কিন্তু এবম্প্রকার জরুরি চিঠি একবার হারালে যে দ্বিতীয়বার আর পাওয়া যায় না—একথাটা বিলাত-প্রত্যাগত যুবকদ্বয় বুঝতে পেরেছিলেন বলেই দেশবন্ধুর সস্নেহ আহ্বানে সাড়া দিতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। তবে এ-কথাও ঠিক যে প্রত্যয় ও অপ্রত্যয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষের যে অবস্থা হয়—তাঁদেরও কিছু সময়ের জন্য তা হয়েছিল। শুনেছি সুভাষচন্দ্রও প্রথমটা নাকি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন— তবে তাঁর ধাঁধা কাটতে বেশি সময় লাগে নি।

কিরণবাবুর সঙ্গে সুভাষবাবুর পরিচয় ও হৃদ্যতা বিলাতে থাকতে। কিরণ-বাবু থাকতেন লন্ডনে এবং সুভাষবাবু কেম্‌ব্রিজে।

তখনও চিত্তরঞ্জন আহারাদি সেরে বসবার ঘরে ফিরে আসেন নি, আমি ও হেমন্তদা কথাবার্তা বলছি। ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরে— একটি প্রিয়দর্শন, গৌরবর্ণ যুবক প্রবেশ করলেন— গায়ে একটা সিল্ক টুইলের টেনিস শার্ট, পায়ে একজোড়া কালো শ্যু— উজ্জ্বল তেজ-ব্যঞ্জক চোখ দুটির উপর একখানি সোনার ফ্রেমে আঁটা চশমা। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলাম এবং পরিচয় লাভের আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। এ যেন বহুদিনের পর পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। হেমন্তদার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করে বললাম— ইনিই কি সুভাষবাবু?—হেমন্তদা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ'— বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে আমার হাত ধরে সুভাষচন্দ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচিত হবার পর প্রায় আধঘণ্টাখানেক আলাপ হল— হেমন্তদা তখন উপরে চলে গেছেন। আমি বিদ্যাপীঠের কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে তাঁকে বললাম— "আমাদের সকলের আশা আপনি আসুন, আমি কিরণবাবু-কেও রাজী করাব।" সুভাষবাবু অনেকক্ষণ পরে বললেন— 'আমার ইচ্ছা অবশ্য তাই ছিল— কিন্তু এরকম গোলমালের মধ্যে গিয়ে কোনো লাভ হবে কি?" আমি বললাম— "আপনি এলে নিশ্চয়ই লাভ হবে— নিশ্চয়ই হবে।" সুভাষবাবু মৃদু হেসে বললেন— "দেখা যাক দাশমশায় কী বলেন।"

ইতিমধ্যে দাশমশায় ঘরে এসে বসলেন, আমরাও গিয়ে সেখানে বসলাম। মনে হল দেশবন্ধুর সঙ্গে ইতিপূর্বেই সুভাষচন্দ্রের দেখাশুনা হয়েছে। আমি বললাম— "আমি আর বেঁধে মার কতদিন খাব? ছাত্রেরা ভাবগতিক দেখে সরে

পড়ছে— যারা আছে তারা আপনার মুখের দিকে চেয়েই আছে। অধ্যাপকরা বড়ো একটা ওদিক মাড়ান না। আফিসের কর্তাদেরই এখন একাধিপত্য—এ মড়া আগলে থেকে লাভ কি?”— এমনভাবে কখনো দেশবন্ধুর সঙ্গে আমি কথা কই নি, তবুও সেদিন মনের ক্ষোভটা প্রকাশ হয়ে পড়ল কিন্তু তিনি আমাদের প্রতি যেমন স্নেহপ্রবণ তেমনি ক্ষমাশীলও ছিলেন— হেসে বললেন— “আমি জানি সব— কিন্তু উপায় কি? তুমি সব ভার নাও— you become the secretary”— আমি বললাম আমি তার যোগ্য নই— তার প্রয়োজনও নাই কারণ তাতে আরো গোলমাল বাড়বে। “তাহলে কি করব বলো— আমি খুব feel করি কিন্তু নিজেদের মধ্যেকার দলাদলি মিটাতেই আমার অর্ধেক শক্তি চলে যাচ্ছে— আমি এ-সবে মাথা দিই কখন? ছেলেদের কাছে আমি অপরাধী— এ কথা আমি অস্বীকার করি না।”

আমি বললাম— “সুভাষবাবু ও কিরণবাবু যদি আসেন— সব ব্যবস্থা করে নিতে পারব।”

—“ওরা যদি রাজী হয়—ভালোই। কি হে সুভাষ?” সুভাষবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। হেমন্তকুমার সরকার তাঁর ‘দেশবন্ধু স্মৃতি’-তে লিখেছেন— “এই সময় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র আই-সি-এস ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া দেশ-বন্ধুর অধীনে কাজ করিবার সংকল্প— পত্রযোগে জানাইলেন। আমার হাত দিয়া দেশবন্ধু সুভাষের তিনখানি পত্রের জবাব দিলেন এবং তাহাকে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের ভার ও একখানা ইংরাজী কাগজের ভার লইতে হইবে জানাইলেন।” আমি অবশ্য একথা জানতাম না। ‘সুভাষচন্দ্র’ বইখানিতে হেমন্তবাবু যে লিখেছেন “সুভাষচন্দ্রের অনুসরণেই শ্রীযুক্ত কিরণশংকর রায় ব্যারিস্টারী না করে দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দেন— একথা ঠিক নয়। কিরণবাবু দেশবন্ধুর ত্যাগে মুগ্ধ এবং তাঁর নির্দেশ ও নিজের আন্তরিক ইচ্ছাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছিলেম। একথা আমরা সকলেই জানি।

আমি দেশবন্ধুকে বললাম, “কিরণবাবুকে আমি রাজী করাব।”

সুভাষবাবুর সঙ্গে আলোচনার পর তিনি স্বীকৃত হলেন— আমার উপর ভার পড়ল কিরণবাবুকে এনে হাজির করার। দাশমশায় বললেন— “কিরণ আমাকে জানে—তাকে কাল সকালে নিয়ে এসো। আমার গাড়িখানা নিয়ে যেয়ো।” আরো বললেন— “আর-একটা কাজ করো— আমার সঙ্গে সেদিন National Council of Education (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)-এর অধ্যাপক প্রমথনাথ

মুখোপাধ্যায়ের কথা হয়েছে। তুমি কিরণবাবুকে তৈরি হতে ব'লো মানিকতলা মেন রোডে প্রমথবাবুর কাছে যাবে। তিনি কলেজের মধ্যেই থাকেন। ঢুকেই বাঁ দিকে একটু গিয়ে দেখবে কয়েকটা গাছের শাখার আশ্রয়ের উপর ঘরখানি দিব্যি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন— বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে যাবে। আমার কথা বলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে।"

আমি মনে মনে ভাবলাম— গাছের উপর কুঁড়েঘর— সে কী ব্যাপার! যাক, কাল সকালেই চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

পরদিন সকালবেলা দাশমশায়ের 'হচ্‌কিচ্‌' গাড়িখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে কিরণবাবুকে সব কথা বলে তাঁকে প্রস্তুত থাকতে বলে— জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হাতায় প্রমথবাবুকে আনতে গেলাম। দেখি, দেশবন্ধু-বর্ণিত গাছের উপর কুঁড়েঘরের কথা হুবহু ঠিক। প্রমথবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম— বিদ্যাপীঠে যোগদানের জন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁকে ও কিরণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যখন রসা রোডের বাড়িতে পেঁছিলাম তখন প্রায় এগারোটা বাজে।

সুভাষচন্দ্র সেখানেই উপস্থিত ছিলেন— কিরণবাবুকে স্মিত হাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রায় ঘন্টাখানেক কথাবার্তা হওয়ার পর ঠিক হয়ে গেল যে সুভাষচন্দ্র, কিরণশংকর ও আমাকে সেইদিনই কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ও গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের 'দখল' নিতে হবে। এই মর্মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে দেশবন্ধু একখানি ক্ষমতাপত্র নিজের নামে সহি করে সুভাষচন্দ্রের হাতে দিলেন। এই চিঠিখানির মুসাবিদা করলেন ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস— তিনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদক— সম্পাদক বীরেন্দ্র শাশমল তখন মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড 'বয়কট' আন্দোলনে লিপ্ত থাকায় সুরেন্দ্রবাবুই তাঁর স্থানে কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের কাজ করতেন।

সেদিনের মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ হল রসা রোডের বাড়িতে।— মাসের মধ্যে এমন একাধিক দিনই হ'ত। উপরকার দক্ষিণের বারান্দায় চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, কিরণশংকর, সত্যেন্দ্র মিত্র, হেমন্তদা, আমি ও সুরেনদা (সুরেন্দ্র বিশ্বাস) ও প্রিয়রঞ্জন (ভোম্বল) একসঙ্গে খেতে বসলাম। বাসন্তী দেবী পরিবেশনের তদারক করছিলেন।

সুভাষচন্দ্র স্বভাবতই কথা কইতেন কম। হাসি ও রঙ্গরসের ফোয়ারা ছোটালেন নানারকম গল্পের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধু নিজে এবং দোয়ারকিতে মাত করতে লাগলেন কিরণশংকর। এখানে চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি— নীচের তলায় বসবার ঘরে কংগ্রেসকর্মী-পরিবৃত বাঙলা কংগ্রেসের সভাপতি, সর্বভারতীয় নেতা চিত্তরঞ্জনকে দেখেছি কর্মসূচী প্রস্তুত করতে, কর্মীদের প্রতি আদেশ ও নির্দেশ দিতে, ভর্ৎসনা করতে, অনুরাগ করতে, অভিমান করতে,— আবার স্নেহ, প্রীতি ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ অন্তরে তাদের সকলকে একান্ত নিকটে আকর্ষণ করে নিতে, কিন্তু সে এ মূর্তি নয়,— সে মূর্তি কঠোরে কোমলে তেজদৃপ্ত অথচ কাছে যেতে ভয় করে না। ভোজন পঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট, অতিথিসৎকারে প্রফুল্ল, হাস্যমুখর, স্নেহপ্রবণ যে মূর্তি, সেটি সহৃদয় বন্ধুর। মাঝে মাঝে প্রাণখোলা হাসিতে প্রকাশ হ'ত তাঁর খোলা প্রাণের অফুরন্ত সুনির্মল সজীবতা।

সুভাষচন্দ্র ও বিদ্যাপীঠ

আমরা সেদিন যখন ট্রামে চেপে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে নামলাম তখন বেলা তিনটা বেজেছে। 'ফরবস্ ম্যানসন'-এ বিদ্যাপীঠের অফিসে প্রবেশ করে দেখলাম —কেবল মাখনলাল সেন, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী ও অমূল্য সেনকে। সুভাষচন্দ্র মাখনবাবুর হাতে দেশবন্ধুর চিঠিখানি দিয়ে বসে পড়লেন— আমি ও কিরণ-বাবু তখন দাঁড়িয়ে। মাখনবাবু চিঠিখানি পড়ে যেন একটু উষ্ণ হয়ে উঠলেন, বললেন— "এরকম peremptory নির্দেশের অর্থ ঠিক বুঝলাম না। যা হোক —ভালই তো, আপনারা চালান-না, আমিও বেঁচে যাই।" সুভাষবাবু ইঙ্গিত-পূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। মাখনবাবু বললেন— 'চার্জ ফার্জ বোঝানোর কিছু নেই— আমরা উঠলাম— আপনারা বসে পড়ুন।' এই বলেই তিনি শৈলেনবাবু ও অমূল্যবাবুকে ডেকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন— আমরা সত্যসত্যই বসে পড়লাম।

বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রলাল অনেক দিন থেকেই আসছিলেন না। কলেজও চলছিল ঢিমে তেতালায়— কিন্তু তখন আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম বেশ ভালোভাবেই চলছিল।

বিদ্যাপীঠের অফিসঘরেই অধ্যাপকদের বসবার ঘর ছিল সতরঞ্চ বিছানো,

ফরাস পাতা, কয়েকখানি কাঠের ছোটো ছোটো ডেস্ক— দোয়াত কলম ইত্যাদি। সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই খাতাপত্র উল্টাতে শুরু করেছেন— বিশেষ করে দেখছিলেন ছাত্রদের রেজেস্ট্রী বই— সেখানি নিয়ে একবার কিরণবাবুকে দেখালেন। আমি বললাম, "ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো দক্ষিণা নেওয়া হয় না।"

সুভাষচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ এবং কিরণশংকর সর্ববিদ্যায়তনের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। এই সময় থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের প্রচারসচিবের পদেও কাজ করতে লাগলেন। আমি তাঁর সহযোগিতা করতাম। অফিসের নিয়মিত কাজ-কর্মের ভার আমার উপর দিয়ে মাখনবাবুর পরিত্যক্ত তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent)-এর পদে আমায় নিযুক্ত করা হল। বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক পদে —হেমন্তকুমার সরকার ও আমি নিযুক্ত হলাম। ঠিক হল— অধ্যাপক পদে কাজ করবেন— কিরণশংকর (ইতিহাস ও ইংরাজী কবিতা), সুভাষচন্দ্র (ইংরাজী, ভূগোল ও দর্শন), প্রমথনাথ মুখার্জী (ইতিহাস) এবং কিরণবাবুর জনৈক ছাত্র বিজলী সোম, ইনি প্রেসিডেন্সি থেকে অসহযোগ করে কলেজ ছাড়েন (ইংরাজী), অনংগমোহন দাস (সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী), বিজন দত্ত (অংক)। এখানেই বলে রাখি অধ্যাপক-মন্ডলীতে ক্রমশ এসে যোগদান করেছিলেন— ডা. শশাংকজীবন রায় (হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট), তমিজুদ্দিন খান (ইনি ফরিদপুর থেকে ওকালতি ছাড়েন— কিছুদিন পূর্বে 'লীগ' মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী ছিলেন— এখন কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য), মৌলভী মৈনুদ্দিন হোসেন, সন্তোষকুমার বিশ্বাস (নেপাল কলেজের অধ্যাপক)। এছাড়া সংস্কৃত পড়াতেন অনেকগুলি উপাধি আছে এমন একজন পন্ডিত— তাঁর নামটা মনে নাই। মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার, নীরেন্দ্র রায়।

এই সময় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বিদ্যাপীঠে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতে দেখা যেত। তাঁর সংগে কবি হিসাবে এই সময় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় এবং তিনি যে কী পরিমাণ একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক তা জানবার সুযোগ ঘটে। তখনকার দিনে সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সেদিক থেকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষাৎভাবে আমাদের সংগে যোগাযোগ রাখার একটা বিশেষ মূল্য ছিল।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে সেদিন সুভাষচন্দ্রকে যেন একটু গম্ভীর মনে। কিরণবাবু তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন— "এমন কী একটা অনর্থ ঘটল,

যার জন্য আপনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ?" উত্তরে সুভাষবাবু বহুবিলম্বিত স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন— "ঠিক ধরেছেন।" তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর থেকে এই প্রথম তাঁকে প্রাণখুলে হাসতে দেখলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমরা উঠে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে খানিক নেমে এসে দেখলাম— সুভাষচন্দ্র আমাদের সঙ্গে নাই। কিরণবাবু বললেন— "আরে এ ভদ্রলোকের আবার হল কী ? যান তো একবার দেখে আসুন।" উপরে উঠে গিয়ে দেখি— সুভাষবাবু আমাদের সকলের 'ডেস্ক' গুছিয়ে রাখছেন— আমাকে দেখে টুকরো ছেঁড়া কাগজগুলো মুড়িয়ে হাতে ধরে বাহিরে এলেন, এসে সেগুলি এক কোণে জমা করে বললেন— "ঝাড়ুদার আসে তো ?" আমি বললাম— "যদিও দু-তিন মাসের মাহিনা পায় নি তবুও আসবে বলেই মনে হয়— সব একসঙ্গে দেবে।" কোনো কথা না কয়ে সুভাষবাবু আমার সঙ্গে নেমে এলেন। আমরা সরাসরি একেবারে কিরণবাবুর বাড়ি এসে পেঁছিলাম। সেখানে জলযোগ ও চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হল তাতে সুভাষচন্দ্রকে অনেকটা কাছে পাওয়া গেল। তিনি পূর্বেই ভেবেছিলেন এবং দাশমশায়কে জানিয়েছিলেন, কেম্‌ব্রিজ থেকে তিনি সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়েছেন এবং দেশে ফিরে তাঁর অধীনে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। জাতীয় শিক্ষা বিস্তার এবং একখানি ভালো দৈনিক কাগজ প্রকাশ করা কংগ্রেসের তরফ থেকে বাঙলাদেশের পক্ষে যে একান্ত দরকার সেকথা সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছেন দেখে আনন্দ হল। সুভাষবাবুকে ধর্মতলার ট্রামে তুলে দিয়ে মৌলালীর মোড় থেকে পুলিস হসপিটাল রোডে উপাসনা প্রেসে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল— বিদ্যাপীঠের ছেলেদের কাছে আমার মুখরক্ষা হল।

দেশবন্ধুর হৃদয়-মাধুর্য

এর পর থেকে রসা রোডের বাড়িতে আমাদের আসা-যাওয়া বেড়ে গেল। সেদিন রবিবার বিদ্যাপীঠ বন্ধ, আমি ও কিরণবাবু ১৪৮ নং রসা রোডের বাড়িতে এসে দেখি সুভাষবাবু সবেমাত্র এসেছেন। দেশবন্ধু ঠিক তারই আগের দিন রাত্রে মালদহ থেকে ফিরেছেন। তখন বেলা দুটা হবে— নীচের তলায় নামতে তাঁর ঘন্টাখানেক দেরি। কিরণবাবুর চায়ের তেষ্টা পেল— হেসে বললেন— চলুন এই ফাঁকে বাইরে থেকে চা খেয়ে আসি। উপর থেকে রোজই চা এবং চায়ের

সঙ্গে জলখাবার আসত। দেশবন্ধুর তখন আর্থিক অবস্থা শোচনীয় বলতে হবে --বাসন্তী দেবী নিজে রান্নাবান্না করেন— মজাফার বলে চাকরটি তখনো ছিল কিনা ঠিক মনে নেই। কাজেই ওঁদের আর কষ্ট না দিতে আমরা সবাই উৎসুক ছিলাম। চায়ের দোকান থেকে ফিরে এসে দেখি চিত্তরঞ্জন উপর থেকে নেমে এসেছেন— খুব গম্ভীর। গভীর অভিমানের সুরে বললেন— "কিরণ, How dare you! বাইরে গেছ তোমরা চা খেতে? আমার এমন কী অবস্থা হয়েছে যে তোমাদের এক পেয়ালা চা আমি দিতে পারি না— এইভাবে আমার মনে কষ্ট দাও তোমরা কোন্ সাহসে?"

কিরণবাবু অপ্রস্তুত হয়ে সুভাষবাবুর দিকে চাইলেন। সুভাষবাবু মুখ নীচু করলেন— লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে আমি তখন কী একখানা বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলাম।

বিদ্যাপীঠে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র প্রতিদিনই প্রায় বিদ্যাপীঠে আসতেন— অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সংগে থাকতেন এবং তাঁর অননুকরণীয় ভংগিতে নানারকম গল্প বলে যেতেন কিন্তু হঠাৎ রাজনৈতিক প্রসংগে এসে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন— যেন সে মানুষই নয়। সাভাষবাবুর সংগে কথা কইতে কইতে তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন কোন্ গভীরে কিসের অন্বেষণে তন্ময় হয়ে যেত। চোখের উজ্জ্বল চাহনি, কাটা কাটা অল্পকথায় তেজদৃপ্ত ভংগিতে নিজের মত ও বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে আমি তাঁকে বহুবার বহুস্থানে দেখেছি। কিন্তু যে গভীর স্নেহ প্রীতি ও আস্থার সংগে সংগে তিনি সুভাষচন্দ্রের সংগে কথা কইতেন তার মাধুর্যে মন অভিভূত হয়— আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে বক্তার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধায়।

পরাধীন দেশের দুঃখ, বেদনা ও লাঞ্ছনার গভীর উপলব্ধি এবং তার জন্য আন্তরিক বিহ্বলতা— কিছু একটা করার জন্য অসহিষ্ণু ব্যস্ততা এ জায়গাতে শরৎচন্দ্রে সুভাষচন্দ্রে অনেকটা মিল ছিল। সেই থেকেই দুজনের সম্বন্ধ এমন গভীর ও মধুর হয়ে গড়ে উঠেছিল। কিরণশংকরের সংগেও শরৎচন্দ্রের প্রীতির সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর ছিল— কিন্তু আমার মনে হয় সেটার উৎস ছিল সাহিত্যের অনাবিল রসধারা। কিরণবাবু নিজে একজন সাহিত্যিক

কিন্তু তার চাইতেও তিনি সাহিত্যরসিক বলে শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন হয়েছিলেন।

বিদ্যাপীঠে এসে শরৎচন্দ্র প্রতিদিনই একটা-না-একটা সত্যকার অথবা কাল্পনিক ঘটনাকে এমন রসিয়ে বলতেন এবং হয়তো সেটা গল্প— সত্যকার ঘটনা নয়— এ জেনেও আমরা তাঁর বলার ভঙ্গিতে উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম।

শরৎচন্দ্রের দাড়ি ছিল— একথা সকলেই জানেন কিন্তু কেন শরৎচন্দ্র হঠাৎ দাড়িহীন হলেন সেটা হয়তো অনেকে জানেন না।

অপরাহ্ণবেলায় একদিন শরৎচন্দ্র বিদ্যাপীঠে আমাদের ঘরে খুব গম্ভীর মুখে প্রবেশ করলেন— এতদিনকার সর্বজনবিদিত দাড়ি একেবারে পরিষ্কার করে কামানো। "ব্যাপার কী?" কিরণবাবু একথা জিজ্ঞাসা করতেই শরৎবাবু বললেন— "কী? দাড়ি? বলছি, হাঁপ নিই আগে। কাল সন্ধ্যা থেকে এখনো পর্যন্ত যে কী দারুণ উদ্‌বেগে আমার কেটেছে তা তো তোমরা জান না— এদিকে নিষ্ঠুরের মতো মুখ টিপে টিপে হাসছ। কাল সন্ধ্যায় বরোদা পাইন বলে পাঠালে-- আমার নাকি আর নিস্তার নাই— আমি হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, আমাকে গ্রেপ্তার করবেই। পুলিসে দাড়ি আছে খদ্দর পরা দেখে শরৎবাবু বলে যাদের পাকড়াও করে আবার ছেড়ে দিয়েছে তারা কেউ শরৎবাবু নয়। আমাকে দেখলেই নাকি এবার ধরবে। কারণ আমি সত্যকার শরৎবাবু। আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম আচ্ছা তা বাড়িতে এসে ধরছে না কেন? সে বললে—জানি না, তবে যে-কোনো মুহূর্তে আপনার বাড়িতেও পুলিস আসতে পারে। সে লোকটা এই দারুণ দুঃসংবাদ দিয়ে চলে গেল, আমার যে কি বুক ধড়ফড়ানি বুঝতে তা পারছ?"

"সুভাষ, তুমি হাসছ? এ-সব তুমি বুঝতে পারবে না। আমরা ঘর সংসার করি, তোমার মতো নাগ সন্ন্যাসী নই। আমাদের জেলে ভয় আছে। যাক্‌ তারপর বুঝলে কিরণ,— যত বাজে গাড়ি ঐ শিবপুর দিয়ে যায়— সবই মনে হয় আমাকে ধরতেই আসছে। সকালবেলা উঠেই তোমাদের করুণাময় মহাত্মা-জীর নাম স্মরণ করে দাড়ির বংশ নির্বংশ করে দিলাম। গভর্নমেন্টকে কেমন ফ্যাসাদে ফেলছি বলো তো? ধরুক এবার, সনাক্ত করাবে কি করে? অতএব সত্যকার শরৎবাবু এবারকার মতো বেঁচে গেলেন। কি বল?" আমরা সবাই খুব হেসে উঠলাম।

ঠিক পরের দিন শরৎবাবু বৈকালে আবার বিদ্যাপীঠে এসেছেন। দরজার

গোড়ায় জুতোটা রেখে ঘরে ঢুকলেন কিন্তু বসেই জুতো-জোড়া সরিয়ে কাছে রাখলেন— আবার সেটাকে সামনে রাখলেন। খুব যেন অস্থির মনে হল। আমরা ভাবছি ব্যাপার কি ?

কিরণবাবু বললেন— "আপনি জুতো-জোড়াটা নিয়ে দেখছি মহা বিব্রত হয়ে পড়লেন শরৎবাবু— এটা তো নিমন্ত্রণ বাড়ি নয়, শ্রাদ্ধ-বাসরও নয় যে জুতো চুরি যাবে— আমাদেরও এক এক জোড়া আছে।"

শরৎবাবু বল্লেন— "না তার জন্য নয়, অন্য একটা গুরুতর কারণ আছে হে।"

আমরা খুব উৎসুক হয়ে শরৎবাবুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম— কারণ কী এমন গুরুতর যে আমাদের বলতে বাধা আছে ? শরৎবাবু বললেন— "না আপত্তি নেই। আর তাছাড়া সুভাষকে আমার একথা জানিয়ে রাখতে হবে। কারণ, যদি জেলে সত্যই যেতে হয় তাহলে সুভাষও তো যাবে, ও সেখানে গিয়ে আমাকে এ বিষয়ে সাহায্যও করতে পারবে— লীডার মানুষ, ওর অসাধ্য কি আছে ? তাছাড়া আমরা সব কংগ্রেসের সামান্য কর্মীমাত্র, আমাদের সুখ-সুবিধাও তো ওর দেখা উচিত।" বলেই শরৎবাবু জুতোর সুখতলা দুখানি তুলে জুতোর মধ্যেটা দেখাবার ভান করলেন— কিন্তু ঠিক দেখালেন না। আমরা হাত দিয়ে দেখতে গেলে উহুঁ উহুঁ বলে আটকালেন ; বললেন— "আফিম, আফিম, শুনলাম জেলে আফিম সঙ্গে নিয়ে যেতে দেবে না। আফিম ছাড়া আমার গতি নেই, কাজেই আমাকে এই গর্হিত কাজ করতেই হ'ল।"— বলে গম্ভীর ভাবে চুরুট টানতে লাগলেন।

সুভাষচন্দ্র, কিরণশংকর তখন খদ্দর পরতে শুরু করেছেন, আমি খদ্দরের পাঞ্জাবি পরি, ধুতি পরা ধরব ধরব মনে করছি।

শরৎচন্দ্র বিদ্যাপীঠে আমার পরনে মিলের ধুতি দেখে বললেন, "সাবিত্রী খদ্দর পর নি ? পরো, ওর 'Educative value' আছে। আর কোনো কথা হ'ল না। তারপর বিদ্যাপীঠের কাজ সেরে রাস্তা পেরিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঢুকব— সুভাষবাবু বললেন— "খদ্দর কিনতে যাবেন না ?" আমি বললাম "হ্যাঁ কিনতে হবে, পরতেও হবে কিন্তু চরকা কাটতে জীবন থাকতে পারব না হাতে আসবেই না।" সুভাষচন্দ্র কোনো উত্তর দিলেন না। আমি বললাম —"যদি Congressman (কংগ্রেসের লোক) হওয়ার জন্যেই পরীক্ষা হয় ত

হলেই তো গেছি। তবে চরকা কাটার অন্য সার্থকতা আমি স্বীকার করি।" সুভাষবাবু বললেন, "অর্থাৎ এটা যদি symbol হয়, আমাদের পরাধীনতার স্মারক হয়— যেমন শুনেছি একজন নেতাকে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন —খদ্দর পরা থাকলে সকল সময়ে মনে থাকবে আমি পরাধীন এবং তাতে মনের সংকল্প দৃঢ় হবে মুক্তি পাবার জন্য।"

আমি বললাম, "আপনি দেখেছেন খদ্দরকে মিটিংকা কাপড়া বলে কাগজে "ঠাট্টা করেছে ?" সুভাষবাবু চুপ করে গেলেন।

সুভাষবাবু খদ্দর কিনব কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁর মনোগত ভাবটা আমি আন্দাজ করে নিলাম এবং চলতেও লাগলাম তাঁর সংগে কথা কইতে কইতে ওলেলিংটন স্ট্রীট ধরে।

সুভাষবাবুকে আজ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় নির্মল চন্দ্রের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। এই বাড়িতে রাস্তার উপর নীচের ঘরে একটা খদ্দরের দোকান ছিল, মনে মনে সেই লক্ষ্য করেই আমি সুভাষবাবুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি।

ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবির কাপড় কিনে খুচরা কটা টাকা কম পড়ে গেল। সুভাষবাবু তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে দিলেন। পরদিন টাকা কটা সুভাষবাবুকে দিতে গেলে তিনি বললেন— "রাখুন আপনার কাছে, হঠাৎ দরকার হলেই যেন পাই।"

বহুদিন ধরে সেই টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরেছি। কিন্তু সুভাষবাবুর আর "হঠাৎ দরকার" হ'ল না কোনোদিন। তাঁর মনোগত ভাবটা বুঝতে পেরে সেই টাকা কটি ফিরিয়ে দেবার আর ভরসা পাই নি।

সেই দিন থেকে যতীন দাসের প্রায়োপবেশনে মৃত্যু পর্যন্ত সমানভাবেই খদ্দর পরেছি, মিলের সুতার কোনো জিনিস ব্যবহার করি নি। কিন্তু যতীন দাসের মৃত্যুতে সুভাষবাবু গান্ধীজীকে দু-এক লাইন বাণীর জন্য একাধিক টেলিগ্রাম করেও যখন শুনতে পেলেন, গান্ধীজী সেটা ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা (diabolical suicide) মনে করেন তখন থেকে গান্ধী-প্রচারিত খদ্দর ব্যবহারের উপর আর তেমন আকর্ষণ রইল না। এর পরই কিন্তু ভকত সিংহের আত্ম-নাশের উপর গান্ধীজীর প্রশংসাবাণীতে আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম আমরা কি গান্ধীজীর অপ্রীতিভাজন হয়েছি ? কিন্তু কোন্ অপরাধে ?

ফিরবার পথে সুভাষবাবু আবার খদ্দর-প্রসংগ উত্থাপন করলেন। আমি

বললাম— "শুনেছি শরৎবাবু চরকা কাটেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।" সুভাষবাবু সে কথাটা এড়িয়ে গেলেন, বললেন "কিন্তু "সুতাকাটা কংগ্রেস" বলে যারা ব্যঙ্গ করে— তারাও হয় ভুল বোঝে নয় তো "নেতি নেতি" ভাবকে প্রশ্রয় দিয়ে জড়ত্বকে আশ্রয় করে।"

প্রসঙ্গটা আর অগ্রসর হল না, সুভাষবাবুকে ট্রামে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলাম। ভাবলাম, শরৎচন্দ্র আমাকে লক্ষ্য করে যে কথাটা বললেন সে সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র আমার চাইতে অবহিত হয়েছিলেন বেশি। নতুবা, আজই খদ্দর কেনার পর্ব শেষ করা ব্যাপারে তিনি আমার সঙ্গী হতেন না। ঘটনাটি সামান্য কিন্তু এমনি ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা। কোনো জায়গায় কোনো ফাঁক তিনি রাখতে ভালোবাসতেন না।

বিদ্যাপীঠে দেখতাম, পরে ফরওয়ার্ড অফিসেও দেখেছি, দিনের কাজ শেষ করে যখন উঠতেন, তার অব্যবহিত পূর্বে পরের দিনের জরুরী কাজের তালিকা লিখে টেবিলে রেখে যেতেন। টেবিলের কাগজপত্র গোছাল করে রাখা, এমন-কি কলম পেন্সিল উল্টোপাল্টা থাকার জো ছিল না। এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টান্তকে উপেক্ষা করে চলি এমন সাধ্য আমাদেরও ছিল না।

রবীন্দ্র-সন্দর্শনে সুভাষচন্দ্র

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমি ও সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বললেন, "কি সুভাষ, তোমরা কলেজের নাম "বিদ্যাপীঠ" দিয়েছ কেন?" সুভাষচন্দ্র এই বিদ্রুপে লাল হয়ে উঠলেন। আমি বললাম, "অনেকেরই সেই ধারণা কিন্তু জাতীয় শিক্ষার গোড়া পত্তনের জন্যই এর প্রতিষ্ঠা, স্বেচ্ছাসেবকদের একজায়গায় জমা করে রাখার জন্য নয়।" রবীন্দ্রনাথ পরে কথার মোড় বদলালেন এবং তিনি সুভাষবাবুর সঙ্গে শিক্ষা-বিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করলেন। কংগ্রেসের চরকা কাটার বাধ্যতামূলক নিয়মের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেই তিনি বললেন, "গান্ধীজী কি মনে করেন সারা দেশটা তাঁতি বনে যাবে?" এর উত্তর অবশ্য পরে আমরা পেয়েছিলাম গান্ধীজীর "হরিজন" পত্রিকার প্রবন্ধে। আমি 'কথা ও কাহিনী' 'নৈবেদ্য' ও 'বলাকা' পড়াই শুনে— ঐ বইগুলি থেকে দু-তিনটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের আবৃত্তিতে ছবিগুলি,

অন্তর্নিহিত ভাবগুলি যেন স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে, মনের মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল।

কথার উচ্চারণে ও বলার ভঙ্গিতে প্রত্যেক কাহিনীর অপূর্ণতা ও সৌন্দর্য যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। সেদিনকার রবীন্দ্র-সন্দর্শনের ঐ লাভটুকু একেবারেই অপ্রত্যাশিত। শেষের দিকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপে তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর স্নেহের ভাব ও তাঁর কাছ থেকে বৃহৎ কিছু প্রত্যাশার আভাস পাওয়া গেল।

কিরণশংকর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ

কলিকাতা বিদ্যাপীঠকে একটি প্রথমশ্রেণীর কলেজে পরিণত করতে বেশিদিন লাগে নি এবং এর কৃতিত্বের গৌরব সুভাষ ও কিরণশংকরেরই প্রাপ্য। আমরা তাঁদের সহযোগিতা করেছি মাত্র। দেশের সেবা করেছি যেটুকু— তার চতুর্গুণ পেয়েছি পুরস্কার— আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রে। বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকরের একান্ত নিকটে থেকে তাঁদের প্রীতি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য যে আমার হয়েছিল সেটা আমার জীবনের একটা সার্থকতা বলেই মনে করি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিরণবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিদ্যাপীঠ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শেষ হয়ে যায়। তবে তাঁর সাহচর্য লাভের প্রবল আকর্ষণ চিরকালই আছে তাঁর শিষ্ট ব্যবহার, মিষ্ট আলাপ, এবং অক্ষুণ্ণ প্রীতির জন্য। রাজনীতির উগ্র আবহাওয়া এবং সতত পরিবর্তনশীল, ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে কিরণশংকরের সাহিত্যিক মনটি সর্বপ্রকার আচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত। সেখানে তিনি ভিন্নমানুষ। প্রাচীন ও আধুনিক ইংরেজী বাংলা সাহিত্যে তিনি সুপণ্ডিত ও সুরসিক— রসাত্মক আলোচনা এবং বিদ্বেষহীন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে তিনি তাঁর চারদিকে একটি সুমধুর আকর্ষণের সৃষ্টি করতে পারেন সেকথা তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা জানে। এই-সব কারণেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমাদের এখনো পর্যন্ত দূরে থেকেও অব্যাহত আছে। সুভাষবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষভাবে কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগের সৃষ্টি হয় 'ফরওয়ার্ড' (Forward) কাগজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে— সেকথা পরে বলব।

বিদ্যাপীঠ চলবে নীচের তলায়। বিজ্ঞান বিভাগের জন্য ল্যাবরেটরি (Laboratory) বড়ো বড়ো টেবিল ইত্যাদি ফিট করা হচ্ছে। বিদ্যাপীঠের সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব সাধনের জন্য সুভাষচন্দ্র উঠে-পড়ে লেগে গেছেন— আমরাও সেইসঙ্গে উৎসাহিত।

আসবাবপত্রের আমদানী হচ্ছে, এমন সময় যুবরাজ (পরে অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে এসে পৌঁছলেন। যতদূর মনে হয় সেটা ১৯২১ সালের নভেম্বর মাস।

১৯২১ সালের পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে 'কংগ্রেস' ও বাংলা'য় সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন "পরবর্তী ১৫ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসের সহিত অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত। কিন্তু এখনো সে ইতিহাস লিখিত হয় নি। এই পঞ্চদশ বৎসরের ভারতের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। নেতার পর নেতা কারাবরণ করিয়াছেন —এক একদিন দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক কলিকাতাতেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, দণ্ডিত হইয়াছে, আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার কল্পনাও করে নাই। নানাস্থানে পুলিশের গুলিতে লোক প্রাণ হারাইয়াছে— সাহস হারায় নাই।

"১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নূতন শাসন পদ্ধতিতে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির উদ্বোধন করিতে রাজ পিতৃব্য ডিউক অব কনট ভারতে আগমন করেন এবং সম্রাট পঞ্চম জর্জের যে বাণী পঠিত হয় তাহাতে ছিল : 'বহু বৎসর হইতে কয় পুরুষ হইতে দেশের হিতকামী ভারতীয়েরা স্বদেশে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। আজ আমার সাম্রাজ্য মধ্যে আপনাদের স্বরাজের সূচনা হইল।'

"কলিকাতায় ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ বিকাশ হয় এবং পাঞ্জাবে আকালি শিখদের আন্দোলন প্রবল হয়। মাদ্রাজে মোপলা হাঙ্গামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লর্ড চেমসফোর্ডের পর লর্ড রিডিং ভারতে বড়লাট হইয়া-আসিলেন। পণ্ডিত মদমমোহন মালব্যের মধ্যস্থতায় তাঁহার সহিত গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও রাজনৈতিক আলোচনা হয়। কিন্তু তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হয় নাই। নভেম্বর মাসে যুবরাজ ভারতে আগমন করেন। ইহার পূর্বে প্রথম ভারতীয় গভর্নর লর্ড সিংহ ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের সহিত মতের অনৈক্য হেতু পদত্যাগ করেন। যুবরাজ যেদিন বোম্বাইয়ে উপনীত হয়েন— সেদিন তথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়।"

কলিকাতায় কোনো হাংগামা হয় নি কিন্তু শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যুব-রাজের আগমন ও সংবর্ধনা "বয়কট" করার আন্দোলনে অগ্রণী হলেন সুভাষ-চন্দ্র। এ-বিষয়ে কলিকাতা শহরে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করার মূলে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। যারা যুবরাজের এই সংবর্ধনা বর্জনের বিপুল আয়োজন কলিকাতায় কি রকম নিখুঁত ভাবে হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছেন— তাঁরাই বললেন সে কী অদ্ভুতকর্মা—দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ যুবক এই সুভাষচন্দ্র। কলিকাতা শহরে যানবাহন ও লোক চলাচল কিভাবে সেদিন রাজপথ থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সেদিন সারা বাংলার কর্ম ও ভাব-কেন্দ্র এই সদাচঞ্চল কলিকাতা শহরে নিস্তব্ধ অসহযোগের মধ্য দিয়ে যে বিক্ষুব্ধ অথচ দৃঢ় তীব্র প্রতিবাদ সার্বজনীনভাবে ব্যক্ত হয়েছিল— তার তুলনা পাওয়া কঠিন। বিশেষত তখনকার অর্থাৎ ১৯২১ সালের প্রবল পরাক্রান্ত বাংলা গভর্নমেন্ট তার ছায়ানুগ অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ সর্বদা সজাগ পাহারায় নিযুক্ত। দেশের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জেগেছে বটে কিন্তু তখন ইংরাজ শাসনে পরি-তৃপ্ত অনুগ্রহপুষ্ট রাজভক্ত প্রজার সংখ্যাও কম ছিল না। চারিধারের বেড়া-জালের সতর্কতা এবং বিরুদ্ধবাদী আত্মদ্রোহী স্বদেশীয়দের সহায়তা সত্ত্বেও স্বীয় ক্ষমতায় দৃঢ় বিশ্বাসী রাজ্যসরকারকেও সেদিন বোধ হয় আশংকাতে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনশক্তির ফলেই এই যুবরাজের সংবর্ধনা বর্জনের চেষ্টা জনসাধারণের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়েছিল।

রামচন্দ্রের সেতুবন্ধের কাজে কাঠবিড়ালের প্রয়োজন হয়েছিল— সেইভাবে এই ব্যাপারে আমি যে অতি সামান্যভাবেও কাজে লেগেছিলাম সেটা আমার সৌভাগ্য। আমার ছাপাখানা (উপাসনা প্রেস) তখন পুলিস হসপিটাল রোডে —সেখানে বিদ্যাপীঠ এবং সর্ববিদ্যায়তনের ছাপার কাজ হ'ত। তবুও যুব-রাজের সংবর্ধনা বর্জন সম্পর্কে কোনোপ্রকার ইশ্‌তাহার বা ফতোয়া ছাপানোর ব্যাপারে আমার কোনো ঝুঁকি আসবে কিনা একথা আমাকে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করতেই আমি বললাম "তার জন্য আমি প্রস্তুত"। আমার তখন ছাপাখানা ছোটো— কদিন ধরে দুটি মেশিনে চাপিয়ে ইশ্‌তাহার ছাপা হ'ল বাঙলাতে; হিন্দী এবং ইংরাজীতে ছাপা হয়েছিল অন্য প্রেসে। আমার প্রেস থেকে সর্ব-সমেত ১০ লক্ষ ইশ্‌তাহার ছাপা হয়েছিল। রাত্রি তখন বারোটা, এক হাজার

করে এক-এক প্যাকেটে গুছিয়ে তুলছি এমন সময় সুভাষবাবু এলেন। 'সব হয়ে গেছে?' বলেই সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আমি বললাম 'হ্যাঁ'। তিনি হাসিমুখে বললেন— 'এর দাম আপনি পাবেন।' আমি বললাম "সে হবেখন, আমি তো 'বিল'ই করি নি"। তিনি আবার একটু মৃদু হেসে বললেন, "সে দামের কথা বলছি না, আমি বলছি— 'স্বরাজ' পেলেই আপনার ছাপাখানার নাম বদলে হবে 'স্বরাজ প্রেস'— জাতীয় সরকারের বড়ো বড়ো দপ্তরের কাজ হবে আপনার এখানে।" আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। কাজটা শেষ করতে পেরেছি বলে আমার মনটা তখন খুব হাল্কা লাগছিল। রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন ছাপা কাগজের প্যাকিং-গুলি সুভাষচন্দ্রের গাড়িতে তুলে দিলাম। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন— "ফর্মা সব ভেঙে ফেলে দেবেন, যেন কোনো চিহ্ন না থাকে।" আমার ছাপাখানার যে-সব কর্মচারীরা সপ্তাহকাল ধরে এ কাজে আমাকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করে-ছিল তাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। আমার ছাপাখানায় সুভাষ-বাবুর অনেকদিনের যাতায়াতে তারা সুভাষচন্দ্রকে জানত ভালোবাসত। তারা তাই বিশেষ শ্রম স্বীকার করে কাজটা তুলে দিয়েছিল। কাজেই তারা যে সকলে মিলে কাজের গুরুত্ব বুঝে এযাবৎকাল ব্যাপারটি গোপন রেখেছিল, গভীর রাতে বিশ্রাম ত্যাগ করে কাজটা তুলে দিয়েছিল, তার মধ্যে দেশের প্রতি তাদের টান যে ছিল একথা ঠিক কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাদের আকর্ষণও গভীর ছিল বলেই কাজটি এমন সুশৃংখলভাবে করতে পারা গিয়েছিল। এই ইশ্তাহারের মুসাবিদা সুভাষচন্দ্রের নিজের এবং তার প্রেরণা ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের।

এই উপলক্ষে সে সময় অনেকবার রাস্তায় রাস্তায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘুরেছি— এক-এক জায়গায় সুভাষচন্দ্র দাঁড়াতেই চারিদিক থেকে লোকজন তাঁকে ঘিরে দাঁড়াত। একটি ঘটনার কথা বেশ মনে পড়ে— আমরা ঘুরতে ঘুরতে ইন্টালির ঐ দিকে মুসলমান পল্লীর একটা মস্তবড়ো আস্তাবলে হাজির হলাম রাত্রি তখন দশটা আন্দাজ হবে, সব ঘোড়ার গাড়ি তখনো ফেরে নি কিন্তু দেখলাম অনেক লোক সেখানে জটলা করছে। আমরা যেতেই সুভাষবাবুকে দেখে সবাই এগিয়ে এলো— আশ্চর্য হলাম, এদের সর্দার এবং সেই মহল্লার অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বেশ পরিচয় আছে দেখে। কথাবার্তার ধরনে বুঝলাম সুভাষচন্দ্র ইতিপূর্বে একাধিকবার এখানে এসেছেন। তারা সবাই একজোট হয়ে বলল— "ঠিক আছে।" সুভাষবাবু দু-একটি প্রয়োজনীয় কথা

বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বুঝলাম কী অমানুষিক পরিশ্রমে তিনি সারা কলকাতায় এই অসাধ্য সাধনের সংকল্পকে সার্থক করে তুলেছেন। আর দেখেছিলাম বাঙলার যুবক-সম্প্রদায়কে নিয়ে তিনি যে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রতি কি গভীর তাদের অনুরাগ ও শ্রদ্ধা।

দমন-নীতির প্রকোপ

যুবরাজের কলিকাতায় আগমনে কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ একদিক থেকে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেল এবং এর আর-একটি পূর্ণ সার্থকতা আমরা দেখতে পেলাম— সংশোধিত ফৌজদারি আইন জারি হবার সংগে সংগে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই আইন জারি হবার সংগে সংগে গভর্নমেন্টের দমন-নীতি কয়েকদিনের মধ্যেই ভয়াবহ আকার ধারণ করল। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বা অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের সেই স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী বে-আইনী বলে ঘোষিত হ'ল। দেশবন্ধু তার তীব্র প্রতিবাদ জানাতে দৃঢ়সংকল্প হলেন— দ্বিগুণ চতুর্গুণভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের দ্বারা গভর্নমেন্টের এই আইন অমান্য করে। দেশবন্ধু এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নূতন করে সংগঠন করার ভার দিলেন তার অধিনায়ক— সুভাষচন্দ্রের উপর। সুভাষচন্দ্র বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষের আসন থেকে নেমে নীচের তলায় মালকোঁচা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন স্বেচ্ছাসেবকদের নাম তালিকাভুক্ত করতে। বিদ্যাপীঠের বিজ্ঞান বিভাগ খোলার জন্য যেখানে উঁচু টেবিল বসানো হয়েছিল সেখানে সকাল থেকে অধিক রাত্র পর্যন্ত এই সংগ্রহের কাজ চলতে লাগল। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ দলের প্রভাব তখন বাঙলাদেশের মধ্যে অল্পাধিক প্রবল থাকলেও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকে কলিকাতা ও বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানের জেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল। স্থান সংকুলানে অসমর্থ হয়ে অবশেষে খিদিরপুর ও দমদমে "স্পেশাল" জেলখানা তৈরি হ'ল আইন অমান্যকারীদের বন্দী করে রাখার জন্য। সেদিন আমরা দেখলাম যৌবন জলতরংগের গতিবেগে গভর্নমেন্ট চঞ্চল, বিব্রত ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল। গভর্নমেন্টের যে যুদ্ধ-আহবান (challenge) দেশবন্ধু দৃঢ়তার সংগে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাতে পরাজয় হ'ল গভর্নমেন্টের, সার্থক হ'ল সুভাষচন্দ্রের অমানুষিক পরিশ্রম ও সুশৃংখল

শান্তিপূর্ণ সংগঠন ব্যবস্থা। কিন্তু এই মুক্তি সংগ্রামের যিনি ছিলেন প্রাণ-স্বরূপ— সেই চিত্তরঞ্জনের দেশ-সেবাব্রতের আদর্শ কিভাবে তাঁকে সকলের আগে নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা দিত সে বিষয় সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

"অনেকে মনে করেন যে তাঁর স্বদেশ সেবা-ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ধরপাকড়ের সময় তিনি সংকল্প করেছিলেন যে একে একে তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে কারাগৃহে পাঠাবেন এবং সংগে সংগে নিজেও আসবেন। নিজের ছেলেকে জেলে না পাঠালে পরের ছেলেকে তিনি পাঠাতে পারবেন না— এরকম বিবেচনা তাঁর আদর্শের দিক থেকে খুব নিম্নস্তরের বলে আমার মনে হয়। আমরা জানতুম যে, তিনি শীঘ্রই ধরা পড়বেন, তাই আমরা বলেছিলুম যে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁর পুত্রের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এবং একজন পুরুষ বর্তমান থাকতে আমরা কোনো মহিলাকে যেতে দেব না। অনেকক্ষণ ধরে তর্কবিতর্ক চলে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত হয় না। আমরা কোনো মতে তাঁর কথা স্বীকার করতে পারি নি। শেষে তিনি বললেন 'এটা আমার আদেশ, পালন করতে হবে।' তারপর প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা সে আদেশ শিরোধার্য করলুম।

"তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহিতা, তার উপর তাঁর অধিকার বা দাবি নাই, সেইজন্য তাঁকে তিনি পাঠাতে পারলেন না। কনিষ্ঠা কন্যা তখন বাগ্‌দত্তা; তাঁকে পাঠানো উচিত কিনা সে বিষয়ে তর্ক হ'ল। তিনি পাঠাতে চান, কন্যারও যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, কিন্তু অন্যান্য সকলের মত তাকে পাঠানো উচিত নয়। কারণ একেই তিনি অসুস্থ তারপর আবার বাগ্‌দত্তা— শীঘ্রই বিবাহ হবার কথা। এক্ষেত্রে দেশবন্ধু সাধারণের মত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল সর্বপ্রথমে ভোম্বল যাবে তার পর বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দেবী যাবেন এবং তাঁর ডাক যে মুহূর্তে আসবে তখনই যাবার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।

"বাহিরের ঘটনা সকলেই জানে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে ভাব, যে আদর্শ, যে প্রেরণা নিহিত রয়েছে তার সন্ধান কয়জন রাখে: তাঁর সাধনা শুধু নিজেকে নিয়ে নয়। তাঁর সাধনা সমস্ত পরিবারকে নিয়ে।"

প্রথম দলেই বড়োবাজারে খদ্দর ফেরি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন বাসন্তী দেবী, চিত্তরঞ্জন ও সুনীতি দেবী (রয়টারের রিপোর্টার নৃপতি চ্যাটার্জীর স্ত্রী— ইনি পরে লখনৌ কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন) তার পর একে একে অনেক নেতাই জেলে গেলেন।

১০ ডিসেম্বর তারিখে সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, মৌলানা আজাদ এবং অন্যান্য নেতাদের সংগে গ্রেপ্তার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে গেলেন। দু'মাস পরে তাঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হ'ল। বীরেন্দ্র শাসমল, সুভাষ-চন্দ্রও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে সেন্ট্রাল জেলে এলেন। ইতিমধ্যে কিরণশংকর রায়, হেমন্তকুমার সরকার ও 'বাংলার কথা'র মুদ্রাকর অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় সেন্ট্রাল জেলে পেঁছে গেছেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেব তাঁর ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিলেন, সারা দুপুর ধরে আমরা সেখানে বসে এঁদের সংগ লাভ করতাম। একজন বিচারাধীন বন্দীর (undertrial prisoner) নাম করে আমরা যেতাম।

এই সময় একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা উল্লেখ করব। একদিন সুপারের ঘরে বসে কিরণবাবুর সংগে গল্প করছি এমন সময় দেশবন্ধু বাসন্তী দেবীকে ডেকে বললেন— "দেখ, সাবিত্রীর ছাপাখানাটা তো, মাস্টারি করতে গিয়ে যাবার দাখিল। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক হিসাবে মাসে ওর ষাট টাকা করে পাওয়ার কথা। কালই সাতকড়িপতিকে বলে ওর টাকাটা সব হিসেব করে পাঠাবে। ওর টাকার খুব দরকার।" শুনে আমি বিস্মিত ও লজ্জিত হলাম। সে ব্যাপার কবে তো চুকে গেছে— তা ছাড়া আমি কোনোদিন এ-বিষয়ে কোনো কথা কাউকে বলি নি— তা হলে এ কথাটা উঠল কী করে ?

পরদিন সকালে "উপাসনা প্রেস"-এ এসে সাতকড়িপতিবাবু ষাট টাকা হিসাবে আমার দক্ষিণা বাবদ অনেকগুলি টাকা দিয়ে গেলেন। সেদিন আর লজ্জায় জেলখানার মজলিসে যেতে পারলাম না।

পরে শুনলাম যে আমি যে বিদ্যাপীঠ থেকে কোনো মাসে দক্ষিণা বাবদ টাকা নিই নি, দেশবন্ধু সে কথা সুভাষচন্দ্রের কাছেই শুনেছিলেন।

সুভাষবাবু ও কিরণবাবুর অনুপস্থিতিতে এবং ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় বিদ্যাপীঠ বন্ধ হয়ে গেল। পরে আবার সুভাষবাবু অনেক কষ্টে রায়বাগান স্ট্রীটে একটি বাড়ি জোগাড় করে সেখানে ধ্বংসোন্মুখ বিদ্যাপীঠে জীবন-সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গ বন্যায় আর্তের সেবা

১৯২২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গ বন্যা-সহায়ক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। সুভাষবাবুর শরীর তখন সুস্থ নয় তবুও সে সময়ে তিনি সেখানকার সেবার কার্য এমনভাবে পরিচালনা করেন যে সারা বাঙলাদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের সংগঠন কাজে কোনোখানে ফাঁক থাকত না। খাদ্য সরবরাহ বিভাগ, সেবা-শুশ্রূষা বিভাগ, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে চিঠি-পত্র বিলির জন্য ডাকবিভাগ, সংবাদ সংগ্রহ ও সাহায্য বিতরণ বিভাগ ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গ সাহায্য সমিতির কাজে দেশবাসী সুভাষবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল।

কর্মকেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবকগণের সামরিক রীতিতে প্রত্যহ প্রাতে কুচকাওয়াজ করতে হত। তাদের 'কাপ্টেন' ছিলেন রাজসাহীর বিখ্যাত দেশকর্মী ধীরেন্দ্রনাথ ঘটক। ডা. নলিনাক্ষ সান্যাল সহকারী রূপে সুভাষচন্দ্রের সংগে কাজ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র সকল কাজে যে সামরিক শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন তার প্রমাণ এখানকার একটি ছোটো ঘটনায় পাওয়া যায়। খুব প্রাতঃকালে সেবাকেন্দ্রের সকল কর্মীকে কুচ-কাওয়াজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে হত। বহুদূরের একটি কেন্দ্রে সেবাকার্যের ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে সুভাষচন্দ্রের ও নলিনাক্ষের অধিক রাত্রি হয়ে যায়। সমস্ত রাত্রির শ্রমজনিত ক্লান্তিতে তাঁরা পরদিন প্রাতঃ-কালে ঠিক নির্দিষ্ট সময় কুচকাওয়াজের জন্য উপস্থিত হতে পারলেন না। এই ত্রুটির জন্য যে শাস্তির বিধান ছিল সেটা ক্যাপ্টেন ঘটক তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে সুভাষচন্দ্র ও নলিনাক্ষকে একদিকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। সুভাষচন্দ্র সেখানকার সর্বময় কর্তা হয়েও সে শাস্তি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

বন্যা রিলিফ থেকে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র 'বাঙলার কথা' প্রকাশ করেন এবং সেইসংগে রায়বাগান স্ট্রীটে কলিকাতা বিদ্যাপীঠের নূতন করে প্রতিষ্ঠা হ'ল কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের জন্য বেশিদিন বিদ্যাপীঠ চালাতে পারা গেল না।

বিদ্যাপীঠের জন্য নূতন বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল বটে। কিন্তু ছাত্র-সংখ্যা তখন অনেক কমে এসেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল কলেজ আবার অসহযোগী ছাত্রদের কোলাহলে মুখরিত। তাদেরও দোষ দেওয়া যায়

না, দোষ সম্পূর্ণ আমাদেরই অর্থাৎ আমরাই তাদের উপযুক্ত শিক্ষার কায়েমী কোনো ব্যবস্থা তখনো করতে পারি নি। টাকা ছিল না, দেশবন্ধু তখন নিঃস্ব। লোকে চাঁদার কথা বলতে গেলে রুষ্ট হয়। খুব মুষ্টিমেয় ধনী বা কংগ্রেস-হিতৈষী ব্যবসায়ী বা জমিদার অথবা চিত্তরঞ্জনের অনুরাগী বন্ধুদের উপর টাকার জন্য নির্ভর করতে হ'ত। গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক বা কংগ্রেস কর্মীরাও তখন ঘোর আর্থিক সংকটের মধ্যে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন।

কংগ্রেসের সংগঠন কাজ চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বারবার কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে ঢিমে তেতালায় চলছে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা যে বিদ্যাপীঠ রক্ষা করতে পারলাম না সেটা সুভাষচন্দ্রকে ব্যথিত করেছিল। সেই কারণে তিনি সহযোগী বন্ধু ও কর্মীদের নিষেধ না শুনে পুনরায় বিদ্যাপীঠের কাজ আরম্ভ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করতে লাগলেন। যারা বিদ্যাপীঠ ছেড়ে গিয়েছিল তারা একান্ত বাধ্য হয়েই গিয়েছিল। তবে এমন অনেক ছাত্রও ছিলেন যাঁরা আর পূর্বের শিক্ষায়তনে ফেরেন নি, নানা কাজে নিযুক্ত হয়ে গেছেন। আর যাঁরা তখনো বিদ্যাপীঠের আশায় ছিলেন তাঁরা সুভাষবাবুর সংগে দেখাও করেছিলেন। বিদ্যাপীঠ আবার খুলবে কিন্তু বাড়ি পাওয়া দুষ্কর। "ফরবুস ম্যানসনের" অনেক ভাড়া বাকী ছিল সেগুলি শোধ করে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু সেখানকার ভাড়া অনেক সেখানে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি ও সুভাষবাবাবু সেজন্য অনেকদিন ধরে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বাড়ি খুঁজেছি। খালি থাকলেও কেউ আমাদের ভাড়া দিতে চাইতেন না। এমনি একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছি, দেখলাম বিখ্যাত বিপ্লবী দেশকর্মী ভূপতি মজুমদার আসছেন। বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা কায়মনোবাক্যে দেশবন্ধুর সহায়তা করেছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (মধুবাবু) ও ভূপতি মজুমদার তাঁদের মধ্যে প্রধান। এঁরা "যুগান্তর" দলের লোক।

আমি বললাম, "ভূপতি মজুমদার আসছেন।" আমরা তখন ঠিক মন্দির-টার পশ্চিম-উত্তর কোণে মেডিক্যাল কলেজের কম্পাউন্ড যেখানে শেষ হয়েছে—সেই পর্যন্ত এসে পৌঁচেছি।

সুভাষবাবু বললেন—"আমার সংগে পরিচয় নেই, পরিচয় করিয়ে দিন।"

ভূপতিবাবু ততক্ষণে আমাদের সামনে এসে "কি ভাই" ব'লে দাঁড়াতেই বললাম, "এঁকে চেনেন ভূপতিদা?" তিনি বললেন, "চিনি, তবে আলাপ

নেই।" আমি জানি ভূপতিবাবু সম্বন্ধে সুভাষবাবুর উচ্চধারণা ছিল। তিনি তাঁর সংগে আলাপের জন্য ব্যগ্র ছিলেন।

দুজনের খানিকক্ষণ ধরে আলাপ হ'ল। ভালো করে কথাবার্তা বলার দিন এবং স্থানও ঠিক হয়ে গেল।

দলাদলির বিড়ম্বনার মধ্যে "যুগান্তর" দল দেশবন্ধুর কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে যখন কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিতে হয়েছিল, তখনো "যুগান্তর" দল তাঁর পিছনে তাঁদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

গান্ধীজির বীরভূম সফর

এই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর বীরভূম সফরে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিরণবাবুই আমাকে তাঁর সংগী হবার জন্য আমার কাছে খবর পাঠান। যা হোক, কিরণশংকর রায়, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বিজলী সোম (বিদ্যাপীঠের ইংরেজীর অধ্যাপক) প্রভৃতি গান্ধীজির সংগে গিয়েছিলেন। একখানি সেকেন্ড ক্লাস গাড়ির অর্ধেকটায় গান্ধীজি এবং খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশবাবু এবং আরেকটি বাঙালী যুবক, যিনি গান্ধীজির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা যাচ্ছিলেন— আর অর্ধেকটায় আমরা সকলে।

আমরা সিউড়িতে অবনী রায় মশায়ের অতিথি হলাম। অপরাহ্নে সভা হ'ল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সেখানে গেলেন না, ঘরে বসে চরকা কাটতে লাগলেন আর হরিজন ফান্ডের জন্য টাকা তুলতে লাগলেন। সতীশবাবুও গেলেন না, শ্লেট পেন্সিল নিয়ে গান্ধীজির কাছে বসে হিন্দী লেখা অভ্যাস করতে লাগলেন। আমরা সেখানে সভা করে ফিরে এসে দেখি মহাত্মাজীর ঘরে অনেক লোকের ভিড়। মহাত্মাজী অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত, চরকা কাটতেও ততোধিক ব্যস্ত। সেখানকার জেলা জজের (মি. দে) স্ত্রী একটি রৌপ্যাধারে অনেকগুলি টাকা দিয়ে মহাত্মাজীকে প্রণাম করলেন। সুরেন বিশ্বাস মশায় সেটিকে নীলামে চড়ালেন। তার দাম বড় জোর ১০ টাকা কিন্তু বিক্রি হ'ল পঁচিশ টাকায়— এই পর্যন্তই আমি ডাকলাম। গান্ধীজি সুরেন্দ্রবাবুকে নিরস্ত হতে বলায় আমার ভাগ্যে সেটি লাভ হ'ল। সেটি এখনো আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান সামগ্রী বলে আদৃত হয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠে অভিনন্দন

পূর্বে বলেছি জেল থেকে বেরিয়েই সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গ বন্যার 'রিলিফে' চলে গিয়েছিলেন ; ফিরে আসার পর রায়বাগান স্ট্রীটে কলিকাতা বিদ্যাপীঠ পুনরায় বসবার পরই ছাত্রেরা সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা করার আয়োজন করলেন। আমি সে সভায় "রাজবন্দী" শীর্ষক একটি কবিতা সুভাষচন্দ্রের অভিনন্দনে পাঠ করি— পরে সেখানি বাঁধিয়ে সুভাষবাবুকে উপহার দিই। এই সভায় কিরণ-বাবুও তাঁর বক্তৃতার প্রসঙ্গে বলেন— "ঘরের শঙ্খ তোমার জন্য নয়, আত্মীয়ের আকর্ষণও তোমার জন্য নয়— সংসারের ভোগবিলাস ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও তোমার জন্য নয়— তুমি যে রুদ্র দেবতার আহ্বানে আজ বৈরাগী, তাঁরই দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ পড়ুক তোমার উপর।— ইত্যাদি।"

সুভাষচন্দ্র প্রতিভাষণে বললেন—

"বন্ধুগণ ও ছাত্র ভাইয়েরা — আমি এমন কিছু করি নি যার জন্য আপনারা আমাকে অভিনন্দিত করতে পারেন। আমি যে আজ দেশমাতৃকার আহ্বানে আমার সামান্য শক্তি নিয়ে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি— তার উৎসাহ প্রেরণা ও সহায়তা জুগিয়েছেন আপনারা। দেশের জন্য কারাবাস আমি সৌভাগ্যই বলে মনে করি। দেশবন্ধু বলেন— আমরা দেশের বিরাট কারাগারে সকলেই বন্দী হয়ে আছি— কাজেই ইংরেজের কারাগার অতি সামান্য সীমাবদ্ধ স্থান—। আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি আপনারাও করেন যে— আমাদের সম্মুখে যে ভীষণ পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এবং আমাদের নেতার আদেশ পেলেই আমরা কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ছাত্র-বৃন্দের কাছে আমার কৈফিয়ৎ দিবার আছে। যদিও আমরা জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে বিদ্যাপীঠ ও সর্ববিদ্যায়তন স্থাপন করেছিলাম— তবু এ-কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা যে সংকটকালের মধ্য দিয়ে চলেছি— সে কালের আহ্বান আসে আচম্বিতে— এবং নূতন ঘটনার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে আমাদের পরিকল্পিত গঠনকার্যেরও ব্যাঘাত ঘটে। তার জন্য আপনারা আমাদের ভুল বুঝবেন না। আপনারা এই স্বল্পকালের মধ্যেও যদি জাতীয় শিক্ষার আদর্শের কিছুটা আভাসও পেয়ে থাকেন— তা হলে বুঝব আমাদের যৎসামান্য চেষ্টাও বিফলে যায় নি— ইত্যাদি ইত্যাদি।"

তারপর কিছুদিন পরে আর বিদ্যাপীঠ চলে নি। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের

আহ্বানে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর আরব্ধ জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা বন্ধ করে দিতে হয়— এবং সে আদর্শকে আমরা কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হতে দেখলাম আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা ও পরিচালনায়।

'দেশবন্ধু' নামে অভিনন্দিত

পূর্বে একটি বিষয় বলতে ভুল হয়েছে। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্ত-রঞ্জন নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন এবং বহু টাকা আয়ের ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে যখন বাংলাদেশে ফিরে এলেন তখন দেশের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত হ'তে বিলম্ব ঘটে নি। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়ালেন দেশসেবার মহান ব্রত গ্রহণ ক'রে। বাংলাদেশ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে "দেশবন্ধু" নামে অভিনন্দিত করলে। মির্জাপুর পার্কের এক বিরাট জনসভায় নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের পক্ষ থেকে "দেশবন্ধু" বলে তাঁকে প্রথম অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন—

"আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চিত্ত— বাংলাদেশের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার চিত্ত-রঞ্জন— দেশের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক, দেশ-নেতা, সর্বস্ব ত্যাগ করে আজ সন্ন্যাসী হয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন— এত বড়ো ত্যাগ, এতখানি দেশপ্রীতি, এমন নিঃস্ব হয়ে দেশমাতৃকার পূজায় আহুতি দানের তুলনা বাংলাদেশের রাজ-নৈতিক ইতিহাসে তো নাই-ই অন্য দেশের ইতিহাসেও নাই বলেই আমার বিশ্বাস। সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন আজ দেশের চিত্ত জয় করেছেন— আমরা তাঁকে আজ 'দেশবন্ধু' বলে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন— দেশবন্ধুর আর একটি অর্থ চন্ডাল। যে চন্ডাল ধনী দরিদ্র বিচার করে না— ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার করে না— মূর্খ পন্ডিত বিচার করে না, বয়স মানে না, সম্প্রদায় মানে না, শ্রেণী মানে না— শাক্ত শৈব কিংবা বৈষ্ণবের মধ্যে ভেদাভেদ দেখে না; অপক্ষপাতে সকলের সেবা করে যায়, আমাদের চিত্তরঞ্জন সেই চন্ডাল; মানুষের বন্ধু— দেশবন্ধু চন্ডালের উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে আজ চন্ডালের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। পরাধীন দাস জাতির মুক্তি-সাধনায় দেশবন্ধুর এই বিরাট ত্যাগ দেশকে অনুপ্রাণিত করুক। আমি ব্রাহ্মণ, বয়োজ্যেষ্ঠ— আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি— দেশবন্ধুর সাধনা জয়যুক্ত হোক।"

'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা

১৯২১ সালের মাঝামাঝি দেশবন্ধু পূর্ববঙ্গ সফরে বেরিয়েছেন স্টিমারে; আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ও স্টিমারের ধর্মঘট সম্পর্কে সঙ্গে ছিলেন সত্যেন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন ভট্টাচার্য। মাদারীপুরে পৌঁছে সেদিন রাত্রে তিনি দেওয়ানী আদালতের (নদীর ভাঙনে এখন নিশ্চিহ্ন) সামনের উঠানে বিশ্রাম গ্রহণ করছেন। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। দেশবন্ধু বললেন *Servant* কাগজের গালাগালি তো অসহ্য হয়ে উঠেছে। নিজেদের একখানি মুখপাত্র হিসাবে দৈনিক কাগজ বের করতে না পারলে কংগ্রেসের কাজ চালাতে পারা যাবে না: নিজেদের কথা দেশের সামনে উপস্থিত করতে না পারলে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যকে বাধা দিতে পারা যাবে না।" *Servant*-এর তখন গোঁড়া কংগ্রেসীর কাগজ হিসাবে বাংলাদেশে বেশ প্রতিপত্তি হয়েছে। অসহ-যোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে *Servant* কাগজের জন্ম— এবং স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় তখনকার দিনে বাংলাদেশে তার বিশেষ প্রভাব বিস্তার হয়েছে।

দেশবন্ধুর ত্যাগের প্রেরণায় উকিল ওকালতি ছাড়ল, সরকারি কর্মচারী চাকুরি ছাড়ল, অধ্যাপক অধ্যাপনা এবং ছাত্র স্কুল-কলেজ ছাড়ল, সারা বাংলা-দেশে তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার হতে বিলম্ব ঘটল না— কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধবাদী একটি দল তাঁর কাজে পদে পদে বাধা দিতে লাগল। *Servant* (সারভেন্ট) কাগজ তাঁর কাজকর্মকে ভালো চোখে দেখত না— তীব্র সমালোচনায় তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করত। আসাম-বেঙ্গল ধর্মঘটের ব্যাপারে দেশবন্ধু যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পূর্ণ সহায়তা করতে লাগলেন এটা *Servant*-এর পছন্দ হল না। মনোমোহন ভট্টাচার্য তখন এই দৈনিক পত্রিকার সেক্রেটারি— সেইজন্যই সেদিন রাত্রে মাদারিপুরে আদালত প্রাঙ্গণে দেশবন্ধু ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করলেন— *Servant*-এর গালাগালি আর সহ্য হয় না— নিজস্ব কাগজ চাই। মনোমোহনবাবু বললেন —"কাগজ যে আপনার চাই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।" দেশবন্ধু বললেন— "তুমি কাগজের সঙ্গে সংশিলষ্ট আছ, বলো তো, একখানি দৈনিক কাগজ বের করতে হলে কী কী চাই?"

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, জেল সুপারের ঘরে দ্বিপ্রহরে একটা ছোটোখাটো

কংগ্রেসী সভা বসত এ কথা আগেও বলেছি। তখনকার দিনে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে কিরণশংকরও ছিলেন। 'বাঙ্গলার কথা'য় (বাংলা সাপ্তাহিক) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের জন্য— তাঁকে গ্রেপ্তার করে সেন্ট্রাল জেলে বিচারাধীন আসামী হিসাবে রাখা হয়েছিল। মুদ্রাকর অরবিন্দবাবুও সে সময় জেলে ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, বীরেন্দ্র শাসমল, করোটিয়ার চাঁদ মিঞা অনেককেই তখন জেলে দেখতাম। সে সময় প্রায়ই কাগজ বের করা নিয়ে দেশবন্ধু সুভাষবাবু প্রভৃতির সংগে আলোচনা করতেন। তার বিশেষ একটা কারণও ছিল। দেশবন্ধু তখন থেকেই আইন পরিষদে প্রবেশ (Council Entry) করে সেখান থেকে এবং বাইরে থেকে কি করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে পারা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং কার্যক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাকে রূপ দিবার জন্য মনকেও প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। তাঁর এই নূতন কার্যক্রম সম্বন্ধে প্রস্তাব তিনি জেলে থেকেই সর্বপ্রথম দেশের সামনে উপস্থিত করলেন শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর মারফতে অর্থাৎ চট্টগ্রাম রাজনৈতিক সম্মেলনের সভানেত্রীর অভিভাষণের মধ্য দিয়ে। এই ব্যাপারে সারাদেশে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হ'ল। কেননা— তাঁর এই মতকে No changer বা গোঁড়া কংগ্রেসী এবং বিরুদ্ধবাদীর দল আমল দিতে চাইলে না— তাঁদের মধ্যে কাউন্সিলে গিয়ে তর্ক বিতর্ক করা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংগে সহযোগিতা করারই নামান্তর এবং চিত্তরঞ্জন দাশের এটা যে সম্পূর্ণ একগুঁয়েমি এ কথাও কেউ কেউ বলতে লাগলেন। তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও কঠোর সমালোচনায় দেশবন্ধুর এই নূতন কার্যক্রমকে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু দেশবন্ধুর পক্ষ থেকে তাঁর এই নূতন কার্যক্রমকে বিশদভাবে দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেবার মতো কোনো মুখপাত্র তাঁর স্বপক্ষে ছিল না। ছিল একমাত্র সাপ্তাহিক 'বাঙ্গলার কথা'— সেখানির সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু, মুদ্রাকর অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়— প্রধান লেখক সম্পাদক নিজে, কিরণশংকর রায়, হেমন্তকুমার সরকার ও আমি। কাগজখানি বেশিদিন চলল না— কারণ এঁরা সবাই প্রায় জেলে গেলেন— বিভিন্ন কারণে।

কাজেই মুদ্রাযন্ত্রের মারফতে দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে একতরফা প্রচারকার্যই চলতে লাগল। কিন্তু দেশবন্ধুর মতো পুরুষ সিংহকে দমিয়ে রাখবার মতো না ছিল তাদের সংগত যুক্তি, না ছিল তাদের উপযুক্ত শক্তি। বিশেষ চিন্তার পর দেশবন্ধু একখানি দৈনিক কাগজ অবিলম্বে বের করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বের হয়েই 'বাংলার কথা' পুনঃপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। হরিঘোষ স্ট্রীটের একটি বাড়ির নীচের তলায় একটি 'ট্রেডল মেসিন' নিয়ে 'বাংলার কথা' প্রকাশ আরম্ভ হ'ল— দৈনিক পত্রিকা হিসাবে। সে সময় কিছুদিনের মধ্যে এই কাগজের চাহিদা এমন বেড়ে গেল যে হকারদের ভিড়ে ত্রস্ত হয়ে থাকতে হ'ত। সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাগজ বিলি করে দিতেন।

দৈনিক 'বাংলার কথা'য় প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না মনে করে এই সময়ে এক-দিন সকালে মনোমোহনবাবুকে (বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী বর্তমানে, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সুপারিনটেনডেন্ট) দেশবন্ধু ডেকে পাঠালেন, অবিলম্বে একখানি ইংরাজী দৈনিক প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি ইতিমধ্যে *Servant* পত্রিকার সংগে তাঁর সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে মনোমোহনবাবু এ কাজে হাত দিলেন। The Forward Publishing Co. Ltd. রেজেষ্ট্রি হয়ে গেল। পরিচালকমন্ডলীর (Directorate) সভাপতি হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং— বীরেন্দ্র শাসমল, শরৎচন্দ্র বসু আর দুজন ডিরেক্টর। বীরেন্দ্র শাসমল তিনমাস ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকার পর মেদিনী-পুরের কংগ্রেসের কাজের চাপে এ কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই স্থানে শরৎচন্দ্র বসু ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে *Forward* পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেন দেশবন্ধুর আহ্বানে।

এই সময় সাম্প্রদায়িক মিটমাটের জন্য দেশবন্ধুকে পাঞ্জাবে চলে যেতে হ'ল, এতে Forward Publishing-এর কাজ একটু মন্দা পড়লেও দেশবন্ধু ফিরে এলেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

দেশবন্ধুর নামের মাহাত্ম্য

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু, "অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি— ব্রজকিশোর প্রসাদ··· প্রতিনিধি সংখ্যা তিন হাজার দুই শত আটচল্লিশ ; চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। এই অধিবেশনের পূর্বে চট্টগ্রামে বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী হইয়া তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দাশ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে কংগ্রেস-গৃহীত ব্যবস্থাপক সভা বর্জন নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হইয়াছিল। এবার সভা-

পতির অভিভাষণে তিনি সেই মত ব্যক্ত করিলেন"। তিনি Council Entry Programme অর্থাৎ আইন পরিষদে প্রবেশ করার প্রয়োজনের প্রস্তাব পেশ করেন বটে কিন্তু তাঁর মূল প্রস্তাব এবং শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের সংশোধক প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন পরাজিত হয়ে ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। সেখানেই তিনি "স্বরাজ্য দল" (Swaraj Party) গঠন করলেন।

রসা রোডের বাড়িতে উপরতলায় উত্তরদিকের একটি ঘরে বসে চিত্তরঞ্জন তাঁর গয়া-কংগ্রেসের (১৯২২) অভিভাষণ লিখছেন— মাঝে মাঝে সুভাষচন্দ্র, হেমন্তদা বা সত্যেন মিত্রের ডাক পড়ছে। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ডেকে পাঠালেম সন্ধ্যার দিকে। সুভাষচন্দ্র সেখানে বসে আছেন— চিত্তরঞ্জন আমাকে বললেন "তোমাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই। তুমি পারবে বলেই তোমাকে ডেকেছি। আমার বক্তৃতা কাল শেষ করে দেব। তুমি এটা ছাপানোর ভার নাও।" আমি বললাম— "আমার প্রেস ছোটো, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ছাপা সম্ভব হবে না তবে আমি অন্য প্রেসে ব্যবস্থা করে যাতে যা হয় করব।" দেশবন্ধু বললেন, "বেশ কথা, টাকা যা লাগে সুধীর (দেশবন্ধুর জামাতা, অপর্ণা দেবীর স্বামী, ব্যারিস্টার সুধীর রায়) তোমাকে দেবে। কিন্তু কংগ্রেসের আগের দিন "Advance Copy" চাই— না হ'লে I will break your head— আমি পরশু চলে যাব।"

চন্ডীচরণ দাসের বড়ো ছাপাখানা Calcutta Fine Art Cottage-এর সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা ছিল তাই ভাবলাম, দেশবন্ধুর নামে এ কাজের ভার নিতে তাঁরা সম্মত হবেন।

অর্থপ্রাপ্তির লোভে নয়— দেশবন্ধুর কাজ, দেশের কাজ এই ভেবেই তাঁরা ছাপাখানার অধিকাংশ কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছিলেন এই কাজে। বিবিধগ্রন্থের রচয়িতা মৌলভী মঈনুদ্দিন হোসেন কলিকাতা বিদ্যাপীঠে আমাদের সহকর্মী ছিলেন। তিনি ও আমি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রেসে বসে প্রুফ দেখেছি, সারাদিন কাজের তদারক করেছি কিন্তু এতটুকু শ্রান্তি, এতটুকু বিরক্তি বোধ করি নি কোনোদিন। দেশবন্ধুর কোনো কাজ করা আমাদের পক্ষে দেশের কাজ ক'রে আনন্দ পাওয়া বা শ্লাঘা বোধ করার চাইতেও যেন বেশি প্রলোভনের ছিল। কারণ তাঁর প্রীতিকর কার্যের প্রতি আমাদের আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত প্রবল। আজ কলিকাতা শহরে একাধিক বৃহৎ ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কং-

গ্রেসের ছাপার কাজ নিতেও তারা ভয় পায় না কিন্তু তখনকার দিনে "জুজুর ভয়" সাধারণ লোক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিল। তাই বলছি, Calcutta Fine Art Cottage সেদিন এই একটি কাজ হাতে নিয়ে এবং সুষ্ঠুভাবে সে-কাজটি করে দিয়ে দেশের বৃহত্তর কাজে যে সহায়তা করেছিলেন সেটা আজ প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত ! এমনি তখনকার দিনে আর-একটি বড়ো ছাপাখানার সাহায্য আমরা পেয়েছিলাম— দেশবন্ধুর নামের মাহাত্ম্যে। লোয়ার সারকুলার রোডের লালচাঁদ অ্যান্ড সন্স-এর মালিকের সংগে ছাপাখানা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৯২৩ সালে কোকনদ (মাদ্রাজ)-কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিভাষণ তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছেপে দিয়েছিলেন। সে কার্যে ব্রতী ছিলাম আমি ও সুভাষচন্দ্র। সেখানে দুদিন এবং দুরাত্রি আমরা দুজনে একসংগে কাজ করেছি। সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য আমার এমনিভাবে বহুবার ঘটেছে এবং সে-সব কথা স্মরণ করতে আমি আজ বিশেষ আনন্দ পাই।

ছাপাখানায় বসে আমাদের কাজ চলছে।

চা আসছে, ডিমের ওমলেট আসছে নিকটবর্তী মুসলমানের হোটেল থেকে। কী তৃপ্তির সহিত সুভাষচন্দ্র সেগুলি গলাধঃকরণ করেছেন। মুসলমান বলে আমার কোনোদিন খাওয়াদাওয়ায় আপত্তি ছিল না, এখনো নেই। আমার অনেক মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে আমি খেয়েছি, বন্ধু নজরুলের সংগে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে আমার বাড়িতে কতদিন খেয়েছি— আমার বিধবা মা পরিবেশন করেছেন। কিন্তু আমি থাকতাম ইন্টালিতে। সেখানকার হোটেলগুলির অপরিচ্ছন্নতাই আমাকে বিমুখ করত, তাদের কোনো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণে কিন্তু উপায় ছিল না আমার সুভাষচন্দ্রের কাছে। তিনি বললেন "খান-না চাটা, ভারি চমৎকার করেছে, হিন্দুর দোকানে এতখানি দুধ দেয় না। ওমলেট করে এরা— টেস্টই (Taste) তার অন্যরকম।" খেলাম চা, খেলাম ওমলেট— অবশেষে শেষের দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে মোগলাই পরোটা এবং শিক কাবাব এসে হাজির।

লালচাঁদ প্রেসে পাঁচটা 'লাইনো'তে কম্পোজ হচ্ছে— সংগে সংগে প্রুফ উঠছে —মেক-আপ হচ্ছে, ফর্মা তৈরি হয়ে মেশিনে চড়ে যাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র যেন প্রেসের সুপারিনটেনডেন্ট— সব দিকে তাঁর লক্ষ্য— গলতি না থেকে যায় কাজে।

সুভাষচন্দ্র বললেন— "এই রকম একটা বড়ো প্রেসের দরকার হবে আমাদের

দৈনিক কাগজের সংগে ; গ্রন্থপ্রচার বিভাগ থাকবে, কংগ্রেসের কাজে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হ'লে নানা ভাষায় ছোটো বড়ো বই তৈরি করে যাতে দেশের ঘরে ঘরে পেঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে সেখান থেকে ।"

স্বাপ্নিক সুভাষচন্দ্র

সব সময়ই সুভাষচন্দ্রের কল্পনা ছিল বিরাট ; বৃহত্তম মহত্তর সংগঠনের কল্পনা চিরদিন তাঁকে নূতন পথে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছে। তাই বলে তিনি স্বল্প সূচনা বা সাময়িক প্রচেষ্টাকে কোনোদিনই উপেক্ষা করেন নি। এটা যারা দেখেছে তাঁকে ১৯২১-এর স্বেচ্ছাসেবক গঠন করতে, যারা দেখেছে তাঁকে বিদ্যা-পীঠের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ফরাসের উপর কাঠের ছোটো ডেস্কের সামনে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে থাকতে, যারা দেখেছে তাঁকে দৈনিক 'বাংলার কথা'র ছোটো তিনখানি ঘরে ঘনসন্নিবিষ্ট প্রেসের মধ্যে বসে সত্যকার জাতীয় দৈনিক প্রতিষ্ঠার দূরপ্রসারী কল্পনার মধ্যে ডুবে থাকতে— তারাই তা জানে। কংগ্রেস অফিসের ছোটো ঘরখানিতে বসে তিনি স্বপ্ন দেখতেন— বহুবিস্তৃত ধনজন-পূর্ণ বিশাল স্বাধীন ভারতের তিনি কল্পনা করতেন "ফরবস ম্যানসন"-এর স্বেচ্ছাসেবক শিবিরে দাঁড়িয়ে, ভারতের লক্ষ লক্ষ যুবক সংঘবদ্ধ হয়ে সামরিক শৃংখলায় রাজপথ দিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে অগ্রসর হয়ে চলেছে— সেই দুনিরীক্ষ গন্তব্যের দিকে। তাঁর এই কল্পনা, তাঁর এই স্বপ্ন উত্তরকালে পূর্ব এশিয়ার সমরাংগনে সত্য হয়ে উঠেছিল এক অপূর্ব মূর্তিতে। একক জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতায় তাঁর সেই মুক্তিসাধনার কথা ইতিহাসে স্বর্ণা-ক্ষরে লেখা হয়ে থাকল।

"স্বরাজ্য পার্টি" গঠন ও 'ফরওয়ার্ড'-এর সূচনা

১৯২২ সালের ডিসেম্বরে ঠিক গয়া-কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই যে স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয়েছিল তার সম্প্রসারণ চলতে লাগল ১৯২৩ সালের প্রারম্ভে। কলিকাতায় স্বরাজ্য পার্টির তালিকায় পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে সর্বপ্রথম সভ্য-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বসু, কিরণশংকর রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, হেমন্তকুমার সরকার, প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সুকুমাররঞ্জন দাশ, সাবিত্রীপ্রসন্ন

চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তারপর এই দলটি সংখ্যায় পরিপুষ্ট হয়ে বাংলা কংগ্রেসের একটি বৃহত্তর অংশ অধিকার করে বসল। চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায় বাংলার বাহিরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল গড়ে উঠেছিল। স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল গয়াতেই— কিন্তু গভীর দুঃখ, ক্ষোভ ও আশাভঙ্গের মধ্যে। শুনেছি সুভাষচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে চিত্তরঞ্জন একখানি ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়িতে করে স্টেশনে আসেন এবং গভীর রাত্রে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি যে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে পড়লেন— সে-বিষয় মান্দালয় জেল থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত সুভাষচন্দ্রের পত্রখানি থেকেই বুঝতে পারা যাবে—

"আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলকাতায় ফিরি— তখন নানাপ্রকার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাংলার সব খবরের কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে তো কথা বলেই নাই— এমন-কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চায় নি। তখন স্বরাজ্য ভান্ডার প্রায় নিঃশেষ। যখন অর্থের খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাড়িতে একসময়ে লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু, কি শত্রু— কারো চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ির পূর্বের গৌরব ফিরে এল— বাইরের লোক এবং পদপ্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল— তখন আমরা কাজের কথাও বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে, কি রকম হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ভান্ডারে অর্থ সঞ্চয় হল, নিজেদের খবরের কাগজ হল, —তা বাইরের লোক জানে না— বোধহয় জানবেও না।"

এই সময় দেশবন্ধুর একটি বিবৃতি একখানি নাম-করা ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশ করবার অনুরোধ নিয়ে সুভাষচন্দ্র সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ব্যর্থমনোরথ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। এরূপ অবস্থার কথা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বর্ণনা করেছেন— "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই; অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা।"

যা হোক, স্বরাজ্য দল গঠন ও 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম সফল হল।

১৯২৩ সালের গ্রীষ্মকালে দেশবন্ধুর মাদ্রাজ সফরের সময় বহু অর্থ

সংগৃহীত হল। মাদ্রাজ থেকে দেশবন্ধু ফিরে এলে 'ফরওয়ার্ড' কাগজ বের করার উপযোগী অর্থের অভাব হল না।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে ১২৮নং ধর্মতলা স্ট্রীটে চিত্তরঞ্জনকে প্রধান সম্পাদক করে কাগজ বের হবে স্থির হয়ে গেল। সমস্ত আয়োজন হতে লাগল। মেশিন কেনা হল, টাইপ কেনা হল, কম্পোজিটার নিযুক্ত হল। সম্পাদকীয় বিভাগে এলেন শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও স্বর্গীয় কিশোরীমোহন ঘোষ। অনেক বিজ্ঞাপনও পাওয়া গেল। মনোমোহনবাবু ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখের চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য হলেন "ম্যানেজার"। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর রেগুলেশন থ্রি (Regulation III of 1818) আইনে মনোমোহনবাবু গ্রেপ্তার হওয়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল।

সেইসঙ্গে ভূপতিমোহন মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গভর্নমেন্টের ধারণা হয়েছিল— শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে "ফরওয়ার্ড" যে আন্দোলন চালাবে তাতে তাদের সমূহ ক্ষতি হবে— তাই প্রধান উদ্যোগী ও কর্মী মনোমোহনবাবুকে তারা সরিয়ে দিলে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুভাষচন্দ্র এসে কাগজের সমস্ত ভার নিয়ে কর্মসচিব হয়ে বসলেন।

ঠিক এই সময় একদিন সকালবেলা শরৎবাবুর গাড়িতে শৈলেন্দ্রবাবু (সম্পর্কে সুভাষবাবুর কাকা, ফরওয়ার্ডের বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার ছিলেন) ও সুভাষবাবু আবার ছাপাখানায় এসে হাজির— সুভাষবাবু বললেন, "কর্তা আপনাকে ডাকছেন।" দেশবন্ধু আমাদের মধ্যে অনেকের কাছে তখন কর্তা বলে অভিহিত হতেন।

দেশবন্ধুর কাছে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন— "মনোমোহনকে ধরে নিয়ে গেছে— ছাপাখানার কাজকর্ম দেখার লোক নেই— তা ছাড়া প্রেসটা এখনো ভালোভাবে Organise করা হয় নি। ছাপাখানার কাজে তোমার অভিজ্ঞতা আছে— তুমি এসে সব ভার নাও।"

দেশবন্ধুর এ আহ্বানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলাম। আমি সেইদিন থেকেই ফরওয়ার্ড প্রেসের ম্যানেজার হয়ে গেলাম।

নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনী

এই সময় সুভাষচন্দ্রের সংগঠন শক্তির পরিচায়ক একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে ; বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে তার উল্লেখ থাকা দরকার। আজিকার দিনে আমরা বাংলাদেশে যে বিভিন্ন ছাত্র-আন্দোলন ও কংগ্রেসের কাজকর্মের সহায়ক বহু-প্রকার প্রচার ও গঠনমূলক কাজের বাস্তব রূপ দেখছি ; বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে আমাদের দেশে তরুণদের উদ্দেশে সস্নেহ অভিনন্দন জানাচ্ছি— তার সূচনা হয় সুভাষচন্দ্রের হাতে। সেটি হচ্ছে "নিখিল বঙ্গ যুব-সম্মিলনী।" কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের "আর্য-সমাজ" হলে এই সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডা. মেঘনাদ সাহা— সভাপতি। এই অভিভাষণটি* একমাত্র দৈনিক বসুমতী কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এবং তদানীন্তন বসুমতীর সহ-সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর সহকারী বন্ধুবর ফণীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায় সভাস্থলেই বক্তৃতাটি আগ্রহ সহকারে নিয়ে যান এবং পরদিনই পত্রস্থ করেন। আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উপাসনা' মাসিকেও (অগ্রহায়ণ ১৩২৯) অভিভাষণটি ছাপা হয়েছিল। আমি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের বহুস্থান থেকে যুবকেরা ও ছাত্রেরা এসেছিলেন। দৈনিক 'ভারত'-এর বর্তমান সহকারী সম্পাদক কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত প্রভাত গাঙ্গুলি সেদিন অতি চমৎকার একটি বক্তৃতার দ্বারা তরুণদের আহ্বান করেন। আমিও কিছু বলেছিলাম। সভাপতির অভিভাষণটিতে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচয় ছিল। সুভাষচন্দ্রের সাধারণ্যে দায়িত্বপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ সেই প্রথম। সেদিন তরুণের দল সুভাষচন্দ্রকে ঘিরে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছিল এখনো আমার সে কথা মনে আছে। ইহাও বৃহত্তর তরুণ বাংলা গঠনের পূর্ব-সূচনা।

* অভিভাষণটি "তরুণের আহ্বান" নামে সুভাষ-রচনাবলী ১ম খণ্ডে (পৃ. ৭-১২) সংকলিত। —প্রকাশক

'ফরওয়ার্ড' প্রকাশ

১৯২৩ সালে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই ১৯২৩ সালের ২৩ অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন— এইদিন 'ফরওয়ার্ড' কাগজ কর্মসচিব সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় প্রকাশিত হল। ফরওয়ার্ডের প্রধান-সম্পাদক চিত্তরঞ্জন স্বয়ং, তাঁর সহকারী হলেন শ্রীমৃণালকান্তি বসু ও স্বর্গীয় কিশোরীলাল ঘোষ (এঁরা দুজনেই অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে এখানে এসে যোগদান করেন)। বাংলাদেশে সেদিন দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত, সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত এই দৈনিকখানি যে অভিনন্দন পেয়েছিল ইতিপূর্বে কোনো কাগজের ভাগ্যে তা যে ঘটে নি এ কথা জোর করে বলা যায়। খ্যাতনামা সাংবাদিক, বহু সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু শ্রীযুক্ত শচীন দাসগুপ্ত সংবাদদাতা (Reporter) হিসাবে ফরওয়ার্ডে যোগদান করেন। এই বিভাগে আরেকজন সহকর্মী ছিলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—ইনি এখন 'স্টেটস্‌ম্যান-এ। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে শচীনবাবু *Hindustan Standard* (23 January 1946) পত্রিকায় "Subhas Boses interest in Journalism" প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন তা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা এখানে অনাবশ্যক হবে না—

"Journalism is also indebted to Subhas Chandra Bose for the manifold changes he was instrumental in introducing in his paper (Forward), The departure from the hackneyed and stereotyped way of reporting was made at his suggestion in connection with the reporting of election speeches of C. R. Das. The way and manner of presentation of things, both in the local reports as well as in other news was revolutionised, so to say, in "Forward". The beaten track of putting things as they happened in chronological order was deserted at this time and the choicest portion of speeches or the important event of the day was given prominence in "Forward" first. Care was always taken to see that the whole tenor of the paper was conducive to the healthy growth of nationalism in our people. The idea of news display, of putting things in "Boxes" as also thickening of types to emphasise a thing

emanated from him. This is how Subhas Chandra reoriented journalism and fashioned it to make it live and attractive.

Subhas was also a quick writer and possessed a racy style. In all the 'specials' that were brought out in 1924 or thereabout, it was his leaders that enriched the issues."

অর্থাৎ : সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের কাগজ 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় যে নানাবিধ নূতনত্ব প্রবর্তন করেছিলেন তার জন্য আমাদের দেশের সংবাদপত্র বিশেষভাবে ঋণী। চিত্তরঞ্জন দাশের নির্বাচনী বক্তৃতাগুলি চিরাচরিত প্রথা পরিহার করে যে নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে লাগল, সেটা সুভাষচন্দ্রের পরামর্শমতোই হয়েছিল। বলতে গেলে তখন স্থানীয় ঘটনার বিবরণ ও অন্যান্য সংবাদগুলির পরিবেশন করার রীতিপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনই করা হয়েছিল।

ফরওয়ার্ডেই সর্বপ্রথম যেমন ভাবে ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে সাজানোর প্রথাও বর্জিত হয় এবং বক্তৃতার অথবা দৈনন্দিন ঘটনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র কাগজখানির সংবাদ পরিবেশন ও মূল সুরটি যাতে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে সে-বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকা হত। সংবাদকে সুন্দর করে সাজানো— বন্ধনীর (Box) মধ্যে কোনো প্রধান ঘটনা মুদ্রণ, কোনো বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মোটা হরফে ছাপানো, সবই সুভাষচন্দ্রের নির্দেশমতো 'ফরওয়ার্ডে' প্রবর্তিত হয়। এইভাবে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে নূতনত্বের প্রবর্তন করেন এবং তাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলেন।

সুভাষ নিজে খুব দ্রুত লিখে যেতেন এবং তাঁর ভাষাও খুব তরতরে ছিল। ১৯২৪ সাল নাগাদ 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার কতকগুলি "বিশেষ" সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল সবগুলিই তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে সমৃদ্ধ ছিল।

সে সময় বংগীয় আইন সভার নির্বাচন আসন্ন। 'ফরওয়ার্ড' কাগজের প্রচারকার্যের উপর স্বরাজ্য পার্টির সাফল্য নির্ভর করেছিল অনেকখানি। বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হচ্ছে এই যে, দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম ও প্রধানতম নেতা স্যার সুরেন্দ্রনাথের পরাজয় ও প্রতিপক্ষ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের নির্বাচনে জয়লাভ। বিধানচন্দ্র তখনো পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগত। এস. আর. দাশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকর্মী সাতকড়িপতি রায়ের জয়লাভও সেই সময়কার নির্বাচনের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এর মূলে ছিল সুভাষচন্দ্রের সংগঠন শক্তি ও কর্মকুশলতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরামর্শ, প্রেরণা ও নেতৃত্ব।

সুরেন্দ্রনাথের পরাজয়ের পর *Forward*-এ সুভাষচন্দ্র যে সম্পাদকীয় টিপ্পনী করেছিলেন ('Bureaucracy is burried four fathom deep') তাতে সাংবাদিক মহলে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল— সুভাষচন্দ্র শুধু যে ফরওয়ার্ডের কার্য-পরিচালনা করতেন তাই নয়— তিনি প্রায়ই সম্পাদকীয় বা টিপ্পনী লিখতেন। শচীনবাবুর প্রবন্ধের আর-এক অংশের উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যাবে কী ধাতুতে সুভাষচন্দ্রের চরিত্র গঠিত ছিল এবং তিনি কিভাবেই বা ফরওয়ার্ডের সেবা করতেন—

"The history of Forward in its early days in the history of Subhas Chandra Bose. It was Subhas in the making. Day and night he worked feverishly for the paper. The general elections were drawing near and the time was short. In those days it was so very difficult to get good printing machines. Rotaries and lynotypes were the precious possessions of the privileged few. Others had to be content with flatbeds and handmade compositions. The superhuman effort made by Subhas Chandra succeeded in bringing out the 'dummy' but in the context of present day mechanic age one cannot help observing that it was so much energy wasted. For nights together Subhas, his intimate friend, Sabitri Prasanna Chatterjee and myself had to stay in "Forward" office at Dharamtalla Street, taking stock of the difficulties experienced in course of the day, and planning to meet them the next day. Sharing the same food from nearby restaurant, lying on the office tables, the conversation drifted to wide range of subjects. Poet Sabitri Prasanna with his charming manners and never failing smiles occasionally introduced lighter topics in the discussion to ease the tension. Subhas was never slow to take it up and there we had a glimpse of Subhas, humerous. capable of relaxation and essentially a man of flesh and blood and not the austere grave Subhas who seldom smiled in public.

অর্থাৎ: ফরওয়ার্ডের প্রথম অবস্থার ইতিহাসই সুভাষচন্দ্র বসুর ইতিহাস। সুভাষ তখন নিজেকে তৈরি করছেন। কাগজের জন্য তিনি দিবারাত্রি অসম্ভব পরিশ্রম করছেন। কাউন্সিলের সাধারণ নির্বাচন এসে পড়েছে, আর বেশি বিলম্ব নাই। সে সময় ছাপার ভালো মেশিন পাওয়া দুষ্কর ছিল। মুষ্টিমের

কয়জনের মাত্র "লাইনো" বা "রোটারি" ছিল। আর সকলকে ফ্ল্যাট মেশিন ও হাতে কম্পোজ করার উপর নির্ভর করতে হত। অমানুষিক পরিশ্রমে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড পত্রিকার "ডামি" বা নমুনা বের করলেন। কিন্তু আজকার যন্ত্রযুগের সঙ্গে তুলনায় ভাবতেই হয় যে সেটা পণ্ডশ্রম মাত্র। রাত্রির পর রাত্রি সুভাষ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং আমাকে "ধর্মতলা স্ট্রীটের "ফরওয়ার্ড" অফিসে থাকতে হত। কাগজ সম্বন্ধে সারাদিনের যে অসুবিধাগুলি আমরা ভোগ করতাম, পরের দিনে যাতে সেগুলি আর না ঘটে তার জন্য আমরা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখতাম। কাছের দোকান থেকে আনা একই খাদ্য আমরা সকলে একসঙ্গে গ্রহণ করতাম— অফিসের টেবিলে শুয়ে রাত কাটাতাম, তখন আমাদের আলোচনা চলত নানা বিষয় নিয়ে। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন তাঁর সদাপ্রসন্ন হাসি ও মধুর ব্যবহারে গম্ভীর আলোচনা সহজ করে দিতেন হাল্কা বিষয়ের অবতারণায়। তাতে যোগদান করতে সুভাষেরও বিলম্ব হত না। এখানেই আমরা সুভাষের রসমধুর চিত্তের আভাস পেতাম, অদ্ভুতকর্মা সুভাষও যে সাময়িকভাবে নিজেকে বিরাম উপভোগে ছেড়ে দিতে পারেন সেটা বুঝতে পারতাম এবং এই সময়টিতে মূলত রক্তমাংসে গড়া মানুষ সুভাষের সন্ধান পেতাম : এ সুভাষ সে সুভাষ নন যিনি কঠোর ও গম্ভীর— যিনি কদাচিৎ কখনো সাধারণ লোকজনের মধ্যে হেসে থাকেন।"

ক্রমে ফরওয়ার্ড-এর প্রচার বাড়তে লাগল দেখে দেশবন্ধু ১২নং ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটের *Indian Daily News* পত্রিকা ও তৎসংশ্লিষ্ট ছাপাখানা কিনে নেওয়ার কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। অবশেষে ধর্মতলা স্ট্রীট থেকে *Indian Daily News*-এর বাড়িতে Forward অফিস ও প্রেস নিয়ে যাওয়া হল। সেখানকার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম এল— Forward Publishing এর হাতে। এর মূলে ছিল শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ [চন্দ্র] গোস্বামীর আনুকূল্য।

প্রথম থেকেই একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের প্রয়োজনও বোধ হচ্ছিল কিন্তু 'ফরওয়ার্ড' প্রেসে আর বাড়তি কোনো কাজ করার সম্ভাবনা তখন ছিল না। কিন্তু Indian Daily News প্রেস হাতে আসায় 'বাংলার কথা' এবার দৈনিক কাগজ হয়ে প্রকাশিত হল। তার পরই উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মশক্তি' (সাপ্তাহিক) কাগজখানিও এখান থেকে প্রকাশিত হতে লাগল। এই কাগজ দুখানির সম্পাদনায় ছিলেন গোপাল সান্যাল, শিবরাম চক্রবর্তী, সুবোধ

রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় দাশগুপ্ত।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীটে এসে 'ফরওয়ার্ডে'র সম্পাদক হন— বিখ্যাত দেশকর্মী ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সি— কিছুকাল পরে কোনো-একটি মামলার জন্য 'ফরওয়ার্ড' 'লিবার্টি' (*Liberty*) নামে এবং 'বাংলার কথা' 'বংগবাণী' নামে প্রকাশ হতে থাকে।

কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র

১৯২৪ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ড-এর কর্মসচিব ছিলেন। এই সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চিত্তরঞ্জন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন— এবং ডেপুটি মেয়র হলেন মি. এইচ. এস. সুরাবর্দী (পরে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী) কে প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে এ নিয়ে চারি দিকে কথাবার্তা চলতে লাগল। কর্পোরেশনের বহু জঞ্জাল পরিষ্কার করতে হবে। পৌরব্যবস্থায় নূতন পরিবর্তন আনতে হবে।— সুভাষচন্দ্র বসুর চাইতে কে আর এ কাজ ভালো-ভাবে করতে পারবে ?

"C.R. Das was elected the first Mayor of Calcutta and Mr. H. S. Suhrawardy, the Deputy Mayor... The question of appointment of the Chief Executive Officer was in the air. The Augean Stable was to be cleared, a new tone to the civic administration had to be given, and who could do it better than Subhas Chandra Bose ?"

স্বরাজ্য পার্টির হাতে কলিকাতা কর্পোরেশন আসার পর মেয়র দেশবন্ধুর নির্দেশক্রমে ২৪ এপ্রিল সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্য নির্বাচিত হলেন। এবং তিনি প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) হয়ে ফরওয়ার্ড ছেড়ে চলে গেলেন। আমিও তখন "ফরওয়ার্ড" ছেড়ে চলে এলাম।

ঐ পদের বেতন ছিল তিন হাজার টাকা কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেড় হাজার টাকার বেশি গ্রহণ করতেন না এবং সে-টাকাও খরচ হত দুঃস্থ ছাত্র কর্মী ও কল্যাণকর্মে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। মাত্র অল্পদিনের জন্য কর্মকর্তার

পদে কাজ করবার সুযোগ পেলেও তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আমরা সকলেই জানি। এবং কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েই বোধ হয় তাঁকে ১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর "lawless law" বা বেংগল অর্ডিন্যান্সের বলে অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সংগে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিনা বিচারে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। সেখান থেকেও কিছুদিন তিনি সেক্রেটারি মি. রামিয়ার সাহায্যে কর্পোরেশনের কাজকর্ম দেখছিলেন— কিন্তু সেখান থেকে তিনি ১৯২৪-২৭ সাল পর্যন্ত বহরমপুর জেলে এবং তার পর একেবারে বর্মায় মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হন— ইনসিন জেলেও কিছুদিন তিনি ছিলেন।

১৯২৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য রাজবন্দীদের সংগে মান্দালয় জেলে দুর্গাপুজো প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহে গভর্নমেন্ট অসম্মতি জানালে সুভাষচন্দ্র প্রয়োপবেশন আরম্ভ করেন এবং তাঁদের দাবি মেটানোর পর তাঁরাও ১৯২৬ সালের ৪ মার্চ অনশন ভংগ করেন।

এই বন্দীদশার মধ্যেই সুভাষচন্দ্র উত্তর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, উচ্চ-শিক্ষিত, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা— সুভাষচন্দ্রকে সাধারণ কয়েদীর মতো লালবাজার ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্রের সংগে বাংলা সরকারের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারি মি. প্লাডিং এর যে পত্র-বিনিময় হয়েছিল— তা থেকে বুঝতে পারা যায় বাংলা সরকার রাজবন্দী সুভাষচন্দ্রের উপর অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন। সন্দেহের উপর বা গোয়েন্দা পুলিসের প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভর করে সুভাষচন্দ্রকে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করা হল। কী অপরাধে যে তিনি বন্দী সে কথা জানবার সুযোগ তিনি পেলেন না। কোনো বিচারালয়েও তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উপস্থিত করা হল না। অথচ সাধারণ চোর ডাকাত ও গাঁটকাটারা যে ঘরে আবদ্ধ থাকে সেখানেই সুভাষবাবুকে হাজতে বাস করিয়ে সরকার আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। অথচ তাঁকে যে আইনে বন্দী করা হল— সেই আইনের বলেই তিনি রাজনৈতিক আসামীর প্রতি যোগ্য ব্যবহারের দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি— নির্যাতন ভোগই তাঁর দেশসেবার দক্ষিণা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কর্পোরেশন থেকে সুভাষচন্দ্রকে সরিয়ে নেওয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয়। মেয়র চিত্তরঞ্জনের সেদিনকার তীব্র প্রতিবাদ আমলাতন্ত্রের জিদকে টলাতে

পারল না। সুভাষচন্দ্রকে ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত কারাগারে রাজবন্দী অবস্থায় কর্মজীবনের উৎকৃষ্ট সময় কাটাতে হ'ল। বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের সময় বন্দী অবস্থায় ১৯২৭ সালের ১৬ মে যখন তাঁকে কলিকাতায় এনে মুক্তি দেওয়া হ'ল তখন তিনি বিশেষ অসুস্থ। অনতিবিলম্বে সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত ক'রে দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা জানালে।

'ফরওয়ার্ড' অফিসে

এবার আমি 'ফরওয়াড' অফিসের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব। 'ফরওয়ার্ড' অফিসে আমাদের অনেক রাত্রি পর্যন্ত থাকতে হ'ত। তখন আরো দুটি মেশিন চালু হয়েছে— অনেক টাইপ ও সাজ-সরঞ্জামে ছাপাখানাটিকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছি— নূতন কাজে নূতন উৎসাহবোধ আমার প্রকৃতিগত। সুভাষবাবুর উৎসাহ ও তাঁর মধুর ব্যবহারের আকর্ষণে আমি ফরওয়ার্ডের কাজে তন্ময় হয়ে গিয়েছি। পরের দিনের কাগজের শেষ কপিটির ছাপা শেষ দেখে সুভাষচন্দ্র বাড়ি ফিরতেন। তা না হলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। যেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরতে পারা যেত না সেদিন অফিস ঘরেই আমাদের রাত্রি কাটত। নৈশ ভোজনের পর্ব সমাধা হ'ত, ভাগ্যক্রমে যে দোকানটি তত রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকত— সেখান থেকে যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে। টেলিফোন এল এলগিন রোডের বাড়ি থেকে— "রাত্রি হয়ে গেছে গাড়ি পাঠাব?" "না দরকার নেই।" "তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিই"— "না দরকার হবে না, এখানেই ব্যবস্থা হবে।" আমি ও শচীনবাবু সুভাষবাবুর সংগে থাকতামই। মাঝে মাঝে তারানাথ চৌধুরী (সম্প্রতি দৈনিক বসুমতীর ম্যানেজার) এবং পৃথ্বীশ রায় চৌধুরীও (এখন কর্পোরেশনের অফিসার) কিছুটা রাত পর্যন্ত থাকতেন।

কে কাকে ভয় দেখায়?

অফিসের কাজ শেষ করে আমি ও সুভাষবাবু লোয়ার সারকুলার রোড ধরে চলতাম— গোরস্থান পর্যন্ত সুভাষবাবুকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসতাম ইণ্টালিতে আমার উপাসনা প্রেসে। এমন নিত্যই হত।

একদিন 'ফরওয়ার্ড'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভের জন্য সুভাষবাবুর লেখা 'কপি' কম্পোজিং ডিপার্টমেন্টে গেল আমার হাত দিয়ে— কারণ আমি ছিলাম প্রেস ম্যানেজার। তার শিরোনাম "Who intimidates whom ?" অর্থাৎ কে কাকে ভয় দেখায় ? সমস্তটা পড়ে বুঝলাম এই যে, তোমরা অর্থাৎ ইংরেজরা (বা গভর্নমেন্ট) যে বল— আমরা তোমাদের ভয় দেখাই— সেটা সত্য নয়, তোমরাই আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা কর। ব্যাপারটা এই— তার আগের দিন Intimidator বা সন্ত্রাসকারী শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় বের হয়েছিল স্টেটসম্যান পত্রিকায় (*The Statesman*)— তাতে কংগ্রেসকর্মী ও নেতাদের অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলা হয়েছিল যে তারা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের কাজকর্মের ধারাও তেমনি। তারই উত্তরে সুভাষবাবু যে সম্পাদকীয় জবাব 'ফরওয়ার্ডে' দিয়েছেন তা থেকে জানতে পারলাম যে অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরবার সময় একদিন সারকুলার রোড ছাড়িয়ে এক জায়গায় গুন্ডার দ্বারা সুভাষবাবু এক-জায়গায় আক্রান্ত হয়েছিলেন কিন্তু রুখে দাঁড়াতেই সে কাপুরুষের দল তাঁর কোনো অনিষ্ট করতে পারে নি। এইপ্রকার গুন্ডামির দ্বারা সুভাষচন্দ্রকে ভয় দেখানোর চেষ্টার পিছনে যে পশুশক্তি আত্মগোপন করে ছিল— তাকেই প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যেই সুভাষচন্দ্রের এই সম্পাদকীয়।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম ! এই ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রতিদিন যাই, অতদূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরি, কিন্তু আমি কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও আকারে ইঙ্গিতে বা প্রসঙ্গক্রমে তাঁর মুখে শুনতে পাই নি যে এমন একটা কান্ড ঘটেছে। অনুযোগ করে জিজ্ঞাসা করলাম— "বলেন নি কেন ?" সুভাষবাবু একটু হেসে বললেন — "এ আর এমন কী একটা ব্যাপার ?" আমি বললাম, "যার উপর Editorial চলে— সেটা কি এমনি একটা তুচ্ছ ব্যাপার যে বলার মতো নয় ?" সুভাষবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিন্তু তার পরেও বহুদিন পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন— ইহার পরিবর্তন হ'তে দেখি নি— এই হচ্ছে সুভাষচন্দ্র।

শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র

ফরওয়ার্ড অফিসে রাত্রিবাসের প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক, কেননা নূতন কাগজ বেরিয়েছে, অনেক দায়িত্ব, অনেক ঝঞ্ঝাট। কিন্তু রাত্রিতে দোকান থেকে ভোজ্য-দ্রব্য আনিয়ে— সে খাদ্যই হোক আর অখাদ্যই হোক ভ্রূক্ষেপ না করে তৃপ্তির

সঙ্গে খাওয়া এবং বাড়ি থেকে খাবার পাঠাতে চাইলে 'দরকার নেই' বলে নিষেধ করা ও বাড়ির গাড়িতে বাড়ি না ফিরে পদব্রজে অধিক রাত্রে বাড়ি ফেরা— এর কারণ কি ? অভিমান ? নিজেকে দুঃখ সহ্য করার মতো করে তৈরি করা ? মনে হতে পারে এর কারণ কি ? এরকম জিদ হওয়ারই বা অর্থ কি ? আমরা মাঝে মাঝে বলতাম— "আসুক-না খাবারদাবার, বিনা আয়াসে বসে বসে মুখ বদলানো যাবে— বারণ করেন কেন ?" আমাকে নিজেই অনেক-দিন টেলিফোন ধরতে হয়েছে। কিন্তু সুভাষবাবুর যে কথা সেই কাজ। এর একটা কারণ ছিল— অন্তত আমাদের যা মনে হত। সুভাষবাবু যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের কাজে বিলিয়ে দিয়ে চলেছেন এটার পূর্ণ সমর্থন হয়তো তাঁর অভিভাবক স্থানীয়দের দিক থেকে তখনো পর্যন্ত ছিল না, যদিও এ কথা শুনেছি যে পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ বসু পুত্র সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বিশেষ গর্বই অনুভব করতেন। মেজদা শরৎচন্দ্র তখনো পুরোদমে ব্যারিস্টারি করেন —স্যার নৃপেনের জুনিয়র, প্রসার প্রতিপত্তি বিপুলভাবে গড়ে উঠেছে এবং আইন ব্যবসায়ে অতি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তখন তাঁর সম্মুখে। একান্তভাবে কংগ্রেসের কাজে নামা তখন তাঁর পক্ষে সমস্যার কথা। দেশবন্ধুর আহ্বানে যদিও তিনি ফরওয়ার্ড-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে সম্মত হলেন তবু তখনো পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণভাবে দেশের কাজে নামতে পারেন নি। সুভাষচন্দ্র তখন যে পথে দিনের পর দিন অগ্রসর হয়ে চলেছেন— সে পথের আহ্বান শরৎচন্দ্রকেও চঞ্চল করেছিল এবং পরোক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলির সমর্থন ও সহায়তাও তিনি করতেন কিন্তু পথিক সুভাষচন্দ্র ও গৃহী শরৎচন্দ্রে তখন অনেকখানি প্রভেদ ছিল। সুভাষচন্দ্র ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন দেশ-সেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। নিজেকে সৃষ্টি করছেন তিনি আগামী দিনের বিপদসংকুল সংগ্রামের জন্য। ঘরের শৃঙ্খ তাঁকে ফিরিয়ে আনতে পারে না— আত্মীয়ের সজল নয়নের কাতরতা তাঁকে নিরস্ত করতে পারে না, সংসারের ভোগসুখ, ঐশ্বর্য ও আরামের প্রতি ছিল না তাঁর লোভ অথচ সম্মুখের সুদীর্ঘ কণ্টক-সমাকীর্ণ পথের দুরূহতা অতিক্রম করে চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সংকল্প ও আগ্রহ ছিল তাঁর দুর্দমনীয়।

যাত্রা শুরু হয়েছে— দেশবন্ধুর মতো গুরুর কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্র— নিজেকে তিনি তখন ভেঙেচুরে নূতন করে গড়ে তুলছেন। অন্য দিকে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের অন্তরে আছে দেশসেবার

প্রবল আগ্রহ ; একদিকে দেশমাতৃকার আহ্বান, অন্য দিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আকর্ষণ— এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যেই তিনি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ আপনাকে সহজে বিলিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনায় সিদ্ধান্ত হয়ে যায় বিলম্বিত— অথচ নিজের অন্তরের সত্যকার প্রেরণা মাঝে মাঝে মনকে চঞ্চল করে তোলে, বিহ্বল করে দেয়, সাংসারিক বুদ্ধির আচ্ছন্নতায় মানুষের পায়ে-চলার পথ হয়ে আসে সংকীর্ণ, হয়তো বা অবাঞ্ছিত আশঙ্কায় দুর্গম, ঠিক তেমনি অবস্থার মধ্যে— মনের সংগে যুদ্ধ চলছিল শরৎচন্দ্রের। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর নিজের এবং তাঁর যোগ্যতমা পত্নী বিভাবতীর স্নেহ, প্রীতি ও মমতার কথা আমাদের যেটুকু জানাব সুযোগ তখন হয়েছিল তাতে গৃহসম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এইরূপ ঔদাসীন্য আমাদের কাছে রহস্যময় বলেই মনে হত।

গোপীনাথ সাহার ফাঁসি

বেলা ১০টা-১১টা নাগাদ আমি ফরওয়ার্ড অফিসে যেতাম— সুভাষবাবুও ঐ সময় আসতেন। বেলা ৮টার সময় ফরওয়ার্ড-এর সাইকেল পিওন এসে খবর দিলে— সুভাষবাবু অফিসে এসেছেন— আমাকে ডাকছেন। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার অফিসে পেঁছে দেখি— তাঁর অফিসঘরে দেওয়ালে টাঙানো একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুন গুন করে গান গাইছেন— "তোমার পতাকা যারে দাও— তারে বহিবারে দাও শকতি।" ব্যাপার কি? সুভাষবাবুকে গান গাইতে আমি ইতিপূর্বে কখনো তো শুনি নি, ভারি মজা লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম— এসেছি তা জানতে দিলাম না। তিনিও এত তন্ময় হয়ে ছিলেন যে আমার আসাটা সত্যই জানতে পারেন নি। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে যখন চাইলেন তখন সে মূর্তি দেখে আমি চমকে উঠলাম। সারা মুখে যেন কে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে গুমরে গুমরে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয়— ঠিক তেমনি। দুচোখের কোণে জল। বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম। সুভাষ-বাবুর চোখে জল? এ যে ভাবতেও পারি না। সুভাষবাবু নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। তখনো প্রেসে লোকজন আসে নি— চারি দিক নিস্তব্ধ— সেই

ঘরের মধ্যে আমি ও সুভাষবাবু। আমি যেন হাঁপিয়ে উঠছিলাম— সুভাষবাবু আবেগ-কম্পিত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—

"গোপীনাথ সা'র ফাঁসি হয়ে গেল— জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি।"

আর কোনো কথা তিনি বললেন না ; আমার মনে হতে লাগল আরো কিছু তিনি বলুন— আরো— আরো কিছু। সুভাষবাবুকে এমন বিচলিত, এমন ব্যথাতুর, এমন ক্লান্ত যেন আমি এর আগে কখনো দেখি নি। দেখলাম তিনি স্নান সমাধা করেছেন— পরিধানে শুভ্র খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবি ও চাদর —যেন তিনি বিশেষ কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান থেকে ফিরছেন।

সুভাষবাবু ইতিমধ্যে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন, আমিও মুগ্ধের মতো সামনের চেয়ারে বসেছি। সুভাষবাবু ভারী গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন —"একটা ওয়ার্ডার বাইরে এলো— লোকটির সঙ্গে জেলে থাকতে পরিচয় হয়েছিল— জাতে সে আইরিশ ; সে কী বললে জানেন ?—

He played like a fawn
And at the dawn
Was slain on the lawn."

গোপীনাথ সাহা পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে পুলিস কমিশনার টেগার্টকে মারতে গিয়ে আর্নেস্ট ডে নামক একজন ইউরোপীয়ানকে গুলির আঘাতে নিহত করে। গোপীনাথ সাহার বিচার হয়েছে— ফাঁসি হবে এটা জানতাম— আজই উষার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারও যে তিরোভাব হবে এ কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও আমার খেয়াল ছিল না। শুনলাম, গোপীনাথ ফাঁসির হুকুমের পর ওজনে অনেক বেড়ে গিয়েছিল, যেমন ওজন বেড়েছিল ক্ষুদিরাম ও কানাইলালের। প্রাতঃস্নান করে পট্টবস্ত্র পরিধান করে গোপীনাথ গীতা পাঠ করতে করতে উঠে এসে ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়াল। তার পর সব শেষ। গোপীনাথের এক বৌদিদি ছাড়া আর কেউ ছিল না— মাতৃসদৃশা স্নেহময়ী বৌদিদির কাছ থেকেই সে গীতাখানি আনিয়ে নিয়েছিল। গীতাখানি বুকে রেখেই সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেছে। কতই বা বয়স তার, ষোলো কি সতেরো। এমনি কত বাঙালীর ছেলে বীরের মতো হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে ;— তাদের রক্তের মূল্যে ভারতের মুক্তি কেনা হবে এই ছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আজ গোপীনাথের কথা ভাবতে গিয়ে বার বার আমার মনে হচ্ছে-

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মারিতে ছুটিবে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য, সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?

সহকর্মী ও বন্ধুর প্রতি দরদ

শিলং (Kelshall Lodge, Shillong), থেকে সুভাষবাবুর ৮ আগস্ট (১৯২৭) তারিখের লেখা চিঠিতে নিম্নবর্ণিত ঘটনার তারিখটা অনুমান করে নিলাম।

১৯২৩ সালের ৩ জুলাই, "ফরওয়ার্ড" অফিসে বসে কী একটা প্রুফ দেখে দিচ্ছি— এমন সময় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক খামে ভরা আমার নামের একখানি চিঠি দিয়ে গেলেন। হাতের কাজটা সেরে চিঠিখানি পড়লাম। মাসিক 'উপাসনা'র ব্যয়-সংকুলানের ভার যখন আমি নিই তখন, এ চিঠিখানি যিনি আমাকে লিখেছেন সেই ভদ্রলোক পরোক্ষভাবে এই ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। উপাসনার পরিচালন ব্যয়ের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক থেকে ৫০০ টাকার যে overdraft লওয়া হয় তিনি তার জামিন থাকেন। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবেই এটা ঘটে এবং ৫০০ টাকার ধারের উপর প্রায় ৫০০ টাকা সুদ দিতে হয়েছিল উচ্চ হারে— তবুও দেনার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ৮০০ টাকা। আমি তখন ফরওয়ার্ডে বিনা বেতনে কাজ করছি— নিজের ছাপাখানা দেখতে শুনতে পারি না। দেনাটা পড়েই ছিল। সেই দেনাটা শোধ করে দেবার জন্য একখানা অত্যন্ত কড়া চিঠি— অনুযোগ, ভর্ৎসনা এবং

আপসোসের মাত্রাটা ধারের টাকার চক্রবৃদ্ধি সুদের মতোই একটু উচ্চ হারে চড়ানো। অবিলম্বে সুদ সমেত টাকাটা শোধ করে দেওয়ার কড়া তাগিদ পেয়ে নিরুপায় অবস্থার মধ্যে খুব বিশ্রী লাগল। চিঠিখানি পড়া শেষ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছি, এমন সময় সুভাষবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে তদবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "শরীরটা খারাপ নাকি?" হাত থেকে মাথা তুলে বললাম— "না তো?" 'কিন্তু চেহারা দেখে তো সেটা মনে হচ্ছে না. ব্যাপার কি বলতে আপত্তি আছে?" আমি বললাম "না"— বলেই সেই তাগিদ-পত্রখানি তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে চিঠিখানি পড়ে, আবার আমার হাতে সেখানি ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিছু বললেন না দেখে ভাবলাম— নিজেই এই অপ্রস্তুত অবস্থার কথাটা তাঁকে না জানালেই বা ক্ষতি কী ছিল?

দুদিন কেটে গেল— চেষ্টা করলাম— কোনো ফল হল না। স্থির করলাম জামিনদারকে নিষ্কৃতি দিতে যদি ছাপাখানা জামিন রাখতে হয়, তাই করব।

৫ জুলাই সন্ধ্যাবেলায় সুভাষবাবু বললেন— "কাল আমাকে এলাহাবাদ যেতে হবে। যাবার সময় প্রেস ও কাগজ সম্বন্ধে কথা বলবার আছে— আমি কাল অফিসে বোধ হয় আসতে পারব না। রসা রোডের বাড়িতে আমার ১০।১১টা পর্যন্ত কাটবে। আপনি একবার সকালে আমাদের এলগিন রোডের বাড়িতে আসবেন।"

পরদিন স্নান সেরে ফরওয়ার্ড অফিসটা ঘুরে যেতে আমার প্রায় সাড়ে ১০টা হয়ে গেল— সুভাষবাবু তখনো বাইরে। ফিরলেন ১২টায়, আমাকে দেখেই বললেন— "ওখানেই কথাবার্তা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। অনেক বেলা হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই খেয়ে আসেন নি। চলুন, একসঙ্গে খেয়ে নিই।" ৩৮।২ নং এলগিন রোডের নীচের তলায় শরৎবাবুর বসার ঘর পেরিয়ে এক জায়গায় টেবিলে গিয়ে খেতে বসলাম— সুভাষবাবুর স্নান সাড়া ছিল। দু-জনে খাওয়া শেষ করে বাইরে এলাম। খাওয়ার সময় দু-একবার প্রেস সংক্রান্ত কথা পাড়বার চেষ্টা করলাম— কিন্তু তার সংক্ষিপ্ত জবাবে আমার মনে হল সুভাষ-বাবু এখন এলাহাবাদের ব্যাপারে বোধ হয় অন্যমনস্ক। সুভাষবাবু একবার উপরে গেলেন। নীচেয় দু-চারজন যারা তখনো অপেক্ষা করছিল— তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে— বের হতে প্রায় আড়াইটা তিনটা বাজল। আমরা দুজনে মোটরে উঠলাম। হঠাৎ এলগিন রোড ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থল ছাড়িয়ে

আসতেই সুভাষবাবু গাড়ি থামাতে বললেন।— "আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি লক্ষ্মী ব্যাংকে ফণীবাবুর (Mr. P. Banerjee) সংগে একটা কথা বলে আসি।"— এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। সে সময়, সময়ে অসময়ে মি. পি. ব্যানার্জী ফরওয়ার্ডের টাকার সাময়িক ব্যবস্থা করে দিতেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে সুভাষবাবু আমার হাতে এক তাড়া নোট দিয়ে বললেন, "গুণে দেখুন।" দেখলাম ৮ খানা ১০০ টাকার নোট। তখনো কিছু বুঝতে পারি নি। সুভাষবাবু ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বলে আমাকে বললেন— "হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কটা ক্লাইভ স্ট্রীটে না?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" "চলুন আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। আপনার সেই over-draft-এর টাকাটা শোধ দিয়ে "ফরওয়ার্ড" প্রেসে ফিরে যাবেন" বলেই প্রেসের কথা কাগজের কথা এবং কোথায় কোথায় কার সংগে তাঁর এই কয়েকদিনের অনুপস্থিতির সময় যেতে হবে ইত্যাদি কাজের কথা বলে যেতে লাগলেন যেন আমার জন্য যা করলেন সেটা কিছুই নয়। সুভাষবাবু যে আমার মতো এক-জন নগণ্য বন্ধুর জন্য এতখানি অনুভব করেন এ কথাটা ভেবে তখন আমার চোখে জল এল। এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে সুভাষবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে কাব্য করার কিছু নেই— যাঁর অন্তর আছে, অনু-ভূতি আছে, তিনি আমার তখনকার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন এবং সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই মহত্বর দিকটির বিষয় চিন্তা করে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করবেন।

সুভাষবাবু হাওড়া স্টেশনের দিকে চলে গেলেন— আমি ব্যাঙ্কে ঢুকে দেখি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মনোমোহন ভট্টাচার্য ও আমার জামিনদার ভদ্রলোকটি ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। টাকাটা ম্যানেজারবাবুর হাতে দিতেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে আমার জামিনদার বললেন— "ব্যাপার কি হে— কেমন করে জোগাড় করলে?" আমি কোনো উত্তর না দিয়ে, টাকার রসিদখানি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। তখন কোনো কথা কইবার মতো আমার মনের অবস্থাও ছিল না। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য আমার যে লক্ষ্মী ব্যাংকের সে ৮০০ টাকা শোধ করতেও আমার বিলম্ব ঘটেছিল। যা হোক, কিছুকাল পরে লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে গিয়ে সমস্ত টাকাটা পরিশোধ করে রসিদখানি আমি শরৎবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ সে সময় সুভাষবাবু শিলং-এ ছিলেন

নদীয়ায় কাউন্সিল-নির্বাচন

স্বরাজ্য পার্টির তরফ থেকে প্রথম নির্বাচনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ও এস. আর. দাশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্যের কথা আগেই বলেছি। এই সময় হেমন্ত-কুমার সরকার নদীয়া থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হন। এই ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কৃষ্ণনগর সফরে বের হন। আমি তাঁর আদেশমত পরের দিন সেখানে উপস্থিত হই। দেশবন্ধু আগের দিন কৃষ্ণনগরে চলে গেলেন— নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যেদিন তিনি বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন ঠিক তেমনি দিনে আমি ও সুভাষচন্দ্র চাকদহ স্টেশনে গিয়ে নামলাম বেলা ৪টার সময়। স্টেশনে ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে স্টেশনের কাছে মিউনিসিপ্যাল অফিসে বসালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা পিছনের মাঠে উপস্থিত হলাম। সভায় ইতিপূর্বেই বহু লোক জমায়েত হয়েছে। সুভাষবাবু সভাপতি, আমি বক্তা। তখনো সভা সমিতিতে সুভাষবাবু হামেশা বক্তৃতা করেন না কিন্তু তিনি স্বরাজ্য পার্টির কার্যক্রম যেরূপ দৃঢ় এবং ধীর গম্ভীরভাবে বর্ণনা করলেন তাতে মনে বেশ উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হল। আমরা রাত্রি ২টার গাড়িতে কলিকাতা ফিরে এলাম।

চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আমাদের ভূরিভোজন করালেন। যেটুকু সময় তাঁদের ওখানে আমরা ছিলাম— সেটুকু কাটল সুভাষচন্দ্রের গ্রাম সম্বন্ধে আলোচনায়।

সুভাষবাবু বললেন, "চলুন স্টেশনে গিয়ে বিশ্রাম করা যাক— এঁদের আর কষ্ট দিয়ে লাভ কি?" আমি বললাম— "সে কি? স্টেশনে মশার কামড়ে অস্থির হবেন— কলিকাতায় ফিরেই ম্যালেরিয়ায় কাঁপতে হবে।" সুভাষবাবু একটু মৃদুহাস্য করলেন। আমি বললাম— "তার অর্থ ম্যালেরিয়া হয় হোক?" আমরা স্টেশনে এলাম, ইন্টার ক্লাসের যাত্রী—, ফার্স্ট ও সেকেন্ড ক্লাসের জন্য একটা ওয়েটিং রুম আছে সেখানে সুভাষবাবু যেতে নারাজ। বললেন— "ঐ হলটায় দুটো বেঞ্চ আছে, ক'ঘণ্টা ওতেই বেশ কাটানো যাবে। কাজেই সাধারণের বিশ্রামাগারে রাত্রি যাপন হল। একখানা বেঞ্চ আমাকে দেখিয়ে দিয়ে একখানিতে খদ্দরের চাদর মুড়ি দিয়ে সুভাষচন্দ্র কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ জেগে

জেগে মশা তাড়িয়ে যখন আমার তন্দ্রা আসছে ঠিক তেমনি সময় সুভাষবাবু গায়ে হাত দিয়ে ডাকলেন, 'উঠুন— টিকিটের ঘণ্টা পড়েছে।'— তখন শেষ রাত্রি।

সাহেব কোম্পানির বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ

সুভাষবাবু একদিন ফরওয়ার্ড অফিসে এসে বললেন— "দেশবন্ধু বললেন— আপনাকে সাহেব কোম্পানির কাছ থেকে ফরওয়ার্ড-এর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে আনতে হবে। তাঁর বিশ্বাস আপনিই এ কাজ পারবেন।" বললাম— "চেষ্টা অবশ্যই করব, ফলাফল ভগবানের হাতে।" সুভাষচন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন— "সাহেবরাই তো ভগবান— তা হলে লেগে যান ভগবানের নাম নিয়ে।"

দেশবন্ধু ও সুভাষবাবুর কাছ থেকে হাসিমুখেই কাজের ভার নিতে হত এবং তাতে একটা আনন্দও ছিল। এমনভাবে আস্থা রেখে এঁরা কথা কইতেন— এতখানি নির্ভরতা রেখে এঁরা কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতেন যে অক্ষমও কাজে হাত দিয়ে বিফল হত না— আপনা থেকেই মনে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হত, আত্মনির্ভরতা জাগত— দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা আপনা থেকেই এসে যেত। দেশবন্ধু খুশি হবেন বা সুভাষচন্দ্র সন্তুষ্ট হবেন— এইটেই ছিল কৃতকার্যের দক্ষিণা।

স্টেটসম্যান (*Statesman*)-এর পাতা উল্টেপাল্টে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের একটা তালিকা প্রস্তুত করলাম। একদিন সুভাষবাবুকে না জানিয়ে প্রথম উপস্থিত হলাম লিন্ডসে স্ট্রীটের ডেভিডসন অ্যান্ড কোম্পানির কাছে— তারা বিজ্ঞাপন দিত Medicated Wines-এর—অর্থাৎ সুরাঘটিত ঔষধের। ২০০০ ইঞ্চির চুক্তি পত্র (Contract) সই করিয়ে নিয়ে বিজয়গর্বে সেখানি সুভাষবাবুর হাতে দিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়ালাম এই আশা করে যে সুভাষবাবু নিশ্চয়ই সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাবেন। ও হরি! কাগজখানা চাপা দিয়ে রেখে খুব গম্ভীরভাবে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন— কিন্তু এ যে বিলিতি মদের বিজ্ঞাপন। এ ছাপলে ফরওয়ার্ডের বদনাম হবে।" আমি বললাম, "কিন্তু এটা তো Medicated wine"— উত্তর পেলাম— "কিন্তু wine তো?" আমি চুপ করে গেলাম।

ফরওয়ার্ডের বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজার ছিলেন শৈলেনবাবু, তিনি সুভাষবাবুর সম্পর্কে কাকা। তাঁকে সুভাষবাবু "খুড়ো" বলেই ডাকতেন— সমবয়সী। তিনিও খুব বোঝাতে চেষ্টা করলেন। ব্যাপারটি হাইকোর্টে অর্থাৎ দেশবন্ধুর কাছ পর্যন্ত গড়াল। সুভাষবাবু মকদ্দমায় হেরে গেলেন, আমাদের জিত হল, তবে এই মকদ্দমায় ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র আমাদের তরফে— আমাদের অজ্ঞাতে কৌঁসিলির কাজ করেছিলেন কিনা তা আমি জানি না।

আমি দ্বিতীয় দিন বের হলাম ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির সিগারেটের বিজ্ঞাপন সংগ্রহে। তখন এঁরা খুব বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপন ছাপাতেন। ক্যালকাটা ফাইন আর্ট কটেজের মালিক চন্ডীবাবুর সুপারিশে উপস্থিত হলাম কোম্পানির ম্যানেজার মি. বেকারের কাছে ক্লাইভ স্ট্রীটে। বসতে বলেই বেকার সাহেব সিগারেটের কৌটাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— 'Have a smoke please' (সিগারেট খান) আমি বললাম— "Thanks very much— I do not smoke" (অশেষ ধন্যবাদ, আমি ধূম-পান করি না।) "I see, but how can you advocate smoking through your paper if you yourself do not smoke?" (আপনি যদি নিজে ধূমপান না করেন তা হলে ধূমপানে ওকালতি করবেন কি করে ?) "Advertising is after all advocacy of commodity goods." (বিজ্ঞাপন তো পণ্যদ্রব্যের ওকালতি) বলেই বেকার সাহেব হাসতে লাগলেন।

সেখান থেকে ৫000 ইঞ্চির বিজ্ঞাপন নিয়ে ফরওয়ার্ড অফিসে ফিরলাম। সৌভাগ্যের বিষয় সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে সুরাপানের বিরোধিতার পর ধূম-পানের কোনো প্রতিবাদ পেতে হয় নি। এমনি করে সাহেব কোম্পানির একাধিক বিজ্ঞাপন এনেছিলাম। সে কি নিজের কৃতিত্বে ?— হয়তো কিছুটা কিন্তু সে অতি সামান্য। যে সাহেব কোম্পানিতেই গিয়েছি— "Mr. C. R. Das" সম্পর্কে তাঁদের সুগভীর শ্রদ্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। 'ফরওয়ার্ড' কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুকূলে ছিল তাঁদের মনোভাব— নিজেদেরই স্বার্থের জন্য। ফরওয়ার্ডের প্রচার তখন দিন দিন অসম্ভব রকম বেড়ে চলেছে— ইংরাজ-পরিচালিত 'স্টেটসম্যান' এবং কোনো কোনো জাতীয়তাবাদী কাগজের প্রচারও তখন কমে আসছিল। কাজেই সাহেব কোম্পানির বিজ্ঞাপন তাদের নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থেই ফরওয়ার্ডে প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল এবং চিত্ত-রঞ্জনের ত্যাগ ও দেশপ্রীতির উপর তাঁদের অনেকের শ্রদ্ধার ভাবও ছিল। এই-

সব কারণেই বোধ হয় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা দেশবন্ধুকে "Evil Genius" বলে গালাগালি করেছিল। তিনি হেসে বলেছিলেন, "এখন তা হলে দিনকতকের জন্য আমি নিশ্চিন্ত— আমায় আপাতত গ্রেপ্তার করবে না। প্রশংসা করলেই আমার আশঙ্কা হয়।"

তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জনের খাতিরেই বিজ্ঞাপনের এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন-দাতারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'ফরওয়াডে'' বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এতে করে যে তথা-কথিত জাতীয়তাবাদী ইংরাজী ও বাংলা দৈনিকের অনেকটা ঈর্ষার কারণ ঘটে-ছিল— সে কথা বলাই বাহুল্য।

'ফরওয়ার্ড' পরিচালনা

হাইকোর্ট থেকে বাড়ি ফিরবার পথে প্রতিদিনই শরৎচন্দ্র ফরওয়ার্ড অফিসে আসতেন। তিনি ছিলেন ফরওয়ার্ড পাবলিশিং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাই-রেক্টর। শ্রীযুক্ত শাশমল প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্বাচিত হলেও তিনি মেদিনীপুরের চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের কাজে ব্যাপৃত থাকায় এ কাজ তিনি কোনোদিনই করতে পারেন নি। শরৎবাবুই সেই পদে দেশবন্ধুর আহ্বানে যোগদান করেন ; তিনি খানিকক্ষণ দেখাশুনা করে চলে যেতেন। ম্যানেজার হিসাবে সুভাষচন্দ্রের উপর তখন সমস্ত ভার। তিনি দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্রের পরামর্শমতো কাজ করতেন বটে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কর্মসূচী অনু-সারে সে কাজ তিনি নির্ভুল ভাবে করে যেতেন, তাতে অন্য কারো বলবার কিছু থাকত না। শরৎচন্দ্র টাকার ভাবনা ভাবতেন— দরকার হলে এবং নিজের পকেটে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ টাকা জোগানোর ব্যাপারে তিনি মুক্তহস্ত থাকতেন কিন্তু সুভাষবাবু ছিলেন সর্বময় কর্তা— পরিচালন-ব্যাপারে সুভাষবাবুর কথা সব সময়েই বলবৎ থাকতে দেখেছি। শরৎবাবু তখন ধীরে ধীরে কংগ্রেসের কাজের দিকে বেশ ঝুঁকে পড়েছেন।

স্বরাজ্য পার্টি ও নলিনীরঞ্জন

১৯২১ সালের দমননীতি সম্পর্কে দেশের লোকের মনে বিশেষ বিক্ষোভের উদয় হয় এবং কংগ্রেস এ-বিষয়ে তদন্ত করার জন্য "আইন অমান্য তদন্ত সমিতি" গঠন করে তাঁদের কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

১৯২২ সালে এই "আইন অমান্য অনুসন্ধান সমিতি"র (Civil Disobedience Enquiry Committee) সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারিয়া, এবং শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেল প্রমুখ দেশের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ এই অনুসন্ধান সমিতির কাজে কলিকাতায় আসেন কিন্তু চারি দিকের রাজনৈতিক অবস্থা এমনি গুরুতর দাঁড়ায় যে এই সমিতির অধিবেশনের স্থান পাওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারই এ-বিষয়ের ভার গ্রহণ করে সব ব্যবস্থা ঠিক করে দেন।

১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচিত সভ্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টির চিফ হুইপ (Chief Whip) নিযুক্ত করেছিলেন। স্বরাজ্য দল তখন আইস সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হয়েও যে কিভাবে মন্ত্রীমন্ডল ভেঙে দিয়ে দ্বৈতশাসন অচল করে তুলেছিল তা আমরা জানি। আমরা এও জানি যে এর পশ্চাতে ছিল প্রধানত দেশবন্ধুর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও অপক্ষপাত নেতৃত্ব এবং নলিনীবাবুর রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা। তখনকার স্বরাজ্য দলের মধ্যে ঐক্য, বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার মূলে ছিল দেশবন্ধুর সকলের প্রতি সমান স্নেহদৃষ্টি ও মমত্ববোধ এবং তাঁরা সকলেই সমভাবে অনুপ্রাণিত হতেন দেশবন্ধুর নেতৃত্বের আদর্শে। প্রতিকূল ঘটনাচক্রের মধ্যে, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে স্বরাজ্যদল তখন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল— এঁদের সম্পর্কে তাই মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন 'A happy family'— একটি সুখী পরিবার। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বেও স্বরাজ্যদলের এইপ্রকার মনোভাব কতকাংশে দেখতে পাওয়া যেত।

নলিনীবাবুর উপর দেশবন্ধুর বিশ্বাস, স্নেহ ও নির্ভরতা ছিল অপরিসীম। তার পরিচয় আমরা পাই— দেশবন্ধুর তিনটি কাজের মধ্যে। চিত্তরঞ্জন নলিনীরঞ্জনকে (১) পল্লী সংগঠন ভান্ডার, (২) চিত্তরঞ্জন সেবাসদন—(তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেশের কাজে দান করার ফলে প্রতিষ্ঠিত), (৩) কংগ্রেসের মুখপত্র

দৈনিক কাগজ 'ফরওয়ার্ড' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি নিযুক্ত করেছিলেন। এই সময় থেকে নলিনীবাবুর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের বিশেষভাবে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। নলিনীবাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী-রূপে ময়মনসিংহ থেকে বিপুল ভোটাধিক্যে কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি দেশবন্ধুর স্নেহাধীনে আপন যোগ্যতা ও সাধ্যমতো কংগ্রেসের কাজকর্মে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই— পরবর্তীকালে 'Big Five' বা পঞ্চ মুরুব্বির একজন বলে বাংলাদেশে পরিচিত হয়েছিলেন।

কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের কর্মব্যস্ততা

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে আমার 'রক্তরেখা' বইখানি রাজ্যসরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। যে-সকল কবিতা এই বইখানিতে ছিল, সেগুলি ইতিপূর্বেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

বই বের হল বৃহস্পতিবারে ; শনিবারের অতিরিক্ত গেজেটে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবারেই দুখানি বই নিয়ে ১৪৮ নং রসা রোডের বাড়িতে এবং ৩৮ নং এলগিন রোডের বাড়িতে উপস্থিত হলাম : কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive officer) হয়ে সুভাষচন্দ্র এই বাড়িতেই থাকতেন।

চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রকে বই দিয়ে এলাম। এই বইখানির মধ্যে "রাজা সন্ন্যাসী" ও "রাজবন্দী" শীর্ষক কবিতা দুটি যথাক্রমে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ-চন্দ্রের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন। প্রথমটিতে দেশবন্ধু কৃষ্ণনগরে গেলে তাঁকে অভি-নন্দিত করা হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমবার সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হলে— তাঁকে রায় বাগান স্ট্রীটের নবপর্যায়ে উদ্‌বোধিত কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও ছাত্র-দের সভায় সংবর্ধিত করা হয়— এ কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করেছি। বইখানি হাতে করে দেশবন্ধু বললেন— "তোমার এ বই টিকবে না, বিশেষত গভর্ন-মেন্ট এখন চেষ্টা করছে নানা দিক থেকে আমাদের জব্দ করতে। চারি দিকে গোয়েন্দা ও পুলিসের কড়া নজর। যাক— বেশ করেছ— লিখতেও হবে, বলতেও হবে।"

সুভাষবাবুকে যখন ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়িতে বই দিতে গেলাম তখন ১১টা বাজে— ঐ বাড়িতেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে থাকতেন ঢাকার দুর্ধর্ষ অহিংস

নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন— "আমি ঘুম থেকে না উঠতেই সুভাষবাবু শহর পরিদর্শনে (Inspection) বেরিয়েছেন। ফিরে আসার সময় হল। তবে কাজ জুটে গেলে তিনি না ফিরতেও পারেন।" আমি অপেক্ষা করে থাকার আধ ঘণ্টার মধ্যে সুভাষবাবু ফিরলেন— হাতে কলিকাতার ম্যাপ এবং অনেকগুলি ফাইল।

তাঁর হাতে বইখানি দিতেই তিনি শ্রীশবাবুর ঘরে বসেই পাতা উল্টে দেখতে লাগলেন।— স্মিত হাস্যে বললেন, "কবিতাগুলি প্রায় সবই আমার পড়া— তবে একসঙ্গে সব পাওয়া গেল।"

শ্রীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "অফিস যাবেন না? খাওয়াদাওয়া বুঝি আজ আর হবে না?" সুভাষচন্দ্রকে তিনি খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। সুভাষবাবু বললেন— "অফিসে ঘণ্টাখানেক কাজ করে এসেছি। অফিসের কাজেই আর-একবার বের হতে হবে, তার পর দেখা যাবেখন।"

আমি শুনেছিলাম— সুভোষবাবু অতি প্রত্যুষে শহর পরিদর্শনে বের হতেন— সারাদিন এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্পোরেশনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন— তার খানিকটা নিদর্শন দেখে এলাম নিজের চোখে।

সুভাষচন্দ্রের প্রেরণাতেই *Calcutta Municipal Gazette*-এর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অমল হোম।

সুভাষচন্দ্র ও সন্ত্রাসবাদ

কর্পোরেশনের সকল বিভাগের উন্নতির জন্য সর্বদা চিন্তা ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষার জন্য সুভাষচন্দ্রকে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হত। তার ফলে সে সময়কার কর্পোরেশনের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল। দেশের কর্তৃত্বে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কর্পোরেশন থেকে নাগরিক ও জনকল্যাণ সাধনের জন্য মেয়র চিত্তরঞ্জন যে-সকল পরিকল্পনা করেছিলেন, সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্বই তাঁর কর্পোরেশনের সেবায় অধিকদিন থাকার পথে বাধার সৃষ্টি করল। তাতে আমাদের শান্তি-শৃঙ্খলার মালিক ও

সাব্যস্ত করায় অভিভাবকদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। গোপন অস্ত্রাগারে শাসন-অস্ত্রে শাণ দিয়ে নিতে তাঁদের বিলম্ব ঘটল না। ১৯৪২ সালের ২৫ অক্টোবর বাঙলা সরকার "অর্ডিন্যান্স" বা "জরুরি আইন"-এ সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশের প্রধান প্রধান কর্মীদের গ্রেপ্তার করলেন।

আচম্বিতে এই দমননীতি প্রবর্তিত হওয়াতে দেশের মধ্যে খুব অসন্তোষের সৃষ্টি হল। রাজ্য সরকার হঠাৎ অসাধারণ তৎপরতার সংগে এবং অত্যধিক অসাধারণ কৌশলে জরুরি আইনের আশ্রয় নিয়ে দেশের কর্মীদের গ্রেপ্তার করে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করলেন। এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

নিরুপদ্রব ভাবে, কোনোপ্রকার অশান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি না করে, ন্যায় ও নিয়মের সামঞ্জস্য বিধানের সংগে, কায়মনোবাক্যে অহিংসভাবে, ধীরে ধীরে জাতির জন্মগত ন্যায্য দাবি "স্বরাজ" লাভের জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যখন বিভিন্ন রাজনীতিকদের ঐক্য সাধনে একান্ত উদ্‌গ্রীব, দেশের পরম দুর্ভাগ্য— ঠিক সেই সময় চারি দিকে সম্প্রদায়গত বিরোধ ও কলহ ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল। একদিকে দেশের ন্যায্য অধিকারের প্রতি গভর্নমেন্টের উপেক্ষাই শুধু প্রকাশ পেতে লাগল অতি তীব্রভাবে। দেশের বিক্ষুধ গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল তাই নয়, তাতে গভর্নমেন্ট-কর্তৃক বহু-প্রচারিত বিদ্রোহী মনোভাবের উচ্ছেদ হওয়া তো দূরের কথা— সেটা যে গোপনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল— এ ধারণাও অমূলক নয়। যে কয়জন দেশসেবক সেদিন কারাগৃহে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী হলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির মধ্যে কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল না— এবং পুরাতন বিপ্লবী যুগের মতো গোপনে কাজ হাসিল করার কোনো চেষ্টাও তখন ছিল না; থাকলে গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই তার সরাসরি বিচার করতেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁদের কাজকর্মে এ কথা কোনোদিনই প্রকাশ পায় নি যে তাঁরা গুপ্ত সমিতি গঠন করছিলেন, গভর্নমেন্টকে বিধ্বস্ত করবার জন্য গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করছিলেন বা গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবু গভর্নমেন্টের এই অতি উগ্র তৎপরতার কারণ রহস্যময়ই থেকে গেল। তিন আইন বা অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি জরুরি আইনের প্রয়োগে সন্ত্রাসবাদের গুরুত্ব আরোপিত হলেও— আসলে তখন ঘোর বিপ্লবীরাও গান্ধীজির আদর্শ ও নীতির উপর শ্রদ্ধা রেখে চলছিলেন।

সুভাষচন্দের সংগে যাঁরা মেলামেশা করেছেন, কাজকর্ম করেছেন, একসংগে দিবারাত্রি যাপন করেছেন তাঁরাই জানেন— তাঁর চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্যই ছিল ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা— "ভাবের ঘরে চুরি" তাঁর মধ্যে ছিল না। সুভাষচন্দ্র যখন যে কাজের দায়িত্ব নিতেন তখন তিনি অনন্যমনে সে কাজ করতেন— প্রাণপাতে সে কাজ সম্পন্ন করার জন্য অসাধ্য সাধন করতেন। এই কারণেই তিনি 'ফরওয়াড' কাগজের পরিচালনভার হাতে নিয়ে সময়ের অভাবে কাজের ত্রুটি হতে পারে এই আশংকাতে কংগ্রেস-সম্পাদকের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হয়ে পর্যন্ত তাঁর স্নানাহারের অবসর ছিল না— সকালে শহরের অলিগলি দেখা, বেলা ১১টা থেকে রাত্রি ১০।১১টা পর্যন্ত কর্পোরেশন অফিসে স্তূপীকৃত ফাইলের মধ্যে নিমজ্জিত থেকে সুভাষচন্দ্র কখন যে বিপ্লবী ও ষড়যন্ত্রকারীদের সংগে মেলামেশার সময় পেতেন— বা গুপ্ত সমিতি গঠন ও অস্ত্র সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত থাকতেন— তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

তবে কলিকাতার জবরদস্ত পুলিস কমিশনার যখন বললেন, "connection with the terrorist party has been definitely established" তখন আর কোনো প্রমাণের দরকার হল না, প্রকাশ্য আদালতে বিচার করারও কোনো প্রয়োজন বা দায়িত্ব গভর্নমেন্ট অনুভব করলেন না। সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অনিলবরণ রায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি স্বরাজ্যদলের সভ্যগণ কাউন্সিলের কাজ ও তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন বলে আমরা জানতাম— কিন্তু যদি এঁদের গ্রেপ্তারের কারণ Established complicity in the Revolutionary movement"ই হয়, তা হলে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সাধারণ্যে প্রকাশ করার বাধা কী ছিল অথবা প্রকাশ্য আদালতে তাদের বিচারই বা গভর্নমেন্ট কেন করলেন না— এ প্রশ্নের জবাব আমরা এখনো পাই নি— কোনোদিন পাব না।

যে-সব অভিযোগে তিন আইন প্রয়োগ হতে পারে বা নিউ অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ হতে পারে সে অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্তেরা কোনোদিনই শুনতে পান নি কী তাঁদের অপরাধ। এইপ্রকার নীতির দ্বারা সাময়িকভাবে জাতির অগ্রগতিকে দমন করা গেলেও এ নীতির অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য শাসনযন্ত্রে যে বিফলতা আসে তা আমরা ক্রমশ দেখতে পেলাম।

গভর্নমেন্টের স্বেচ্ছাচারের ফলে কারাগারে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যহানি ঘটল— তার জন্য দেশ তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল বহুকাল। এর জন্য শাসক-শাসিতের মধ্যে ক্রমশ যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে— তার ফলেই আজ সুভাষচন্দ্রের "ভারত ছাড়" দাবিই আমরা শুনতে পেলাম বিশ্বের শান্তিকামী, ইংরেজের পরমবন্ধু গান্ধীজীর একই রকম দাবিতে। গভর্নমেন্ট আজ দীর্ঘদিনের স্বেচ্ছাচারিতার জবাবদিহি করতে বসেছেন। সমগ্র পৃথিবীর স্থায়ী কল্যাণের দিক থেকে এটা বাস্তবিকই শুভলক্ষণ।

সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী কিন্তু তিনি সন্ত্রাসবাদী নন। কেননা 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় দীর্ঘ ২৩ বৎসর পূর্বে "Who intimidates whom" এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার পরস্পরবিরোধী মনোভাব ও পরাধীন জাতির প্রতি সুসভ্য স্বাধীন জাতির যে পীড়নের বর্ণনা তিনি করেছিলেন তারই বিরুদ্ধে সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ ২৬ বৎসরকাল কার্যত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছেন। তাঁর পূর্বাপর কার্যাবলী পর্যালোচনা করলে এই কথাই আমাদের মনে হয় যে তিনি সন্ত্রাসবাদী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস চেয়েছিলেন— তিনি চেয়েছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তি। তাই তিনি সুদূর পূর্ব এশিয়ায় গিয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে বলেছেন—

They will not falter in the fight. They will not rest till India is free.

যুদ্ধে তারা পশ্চাৎপদ হবে না— ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নাই।

সুভাষচন্দ্র স্বাধীনভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন গান্ধীজিরই মতো— সমগ্র বিশ্বজাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির।

"Not dreams of exploitation and aggrandisement and perpetuating injustice— but dreams of progress, happiness for the widest masses, Liberty and Independence for all nations."

অর্থাৎ, শোষণ ও আত্মপ্রসারের স্বপ্ন, অবিচারকে কায়েমী করার স্বপ্ন, আমি দেখি না— আমি দেখি অগণিত জনগণের উন্নতি ও সুখের স্বপ্ন, বিশ্বের সমগ্র জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বপ্ন।

ফরিদপুর-সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাতে চিত্তরঞ্জনের শেষ রাজনৈতিক মতামত অভিব্যক্ত। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে। অনেকে মনে করেন সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘকারাবাসের দুঃখে চিত্তরঞ্জন খুব ব্যথিত ছিলেন এবং ফরিদপুরের অভিভাষণে যে আপস-মীমাংসার অল্পাধিক নরম সুর ছিল সেটার মূলে ছিল তাঁর ঐ ব্যথা, কিন্তু তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুরের বক্তৃতার ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করলেন। এমন-কি চিত্তরঞ্জনের সংগত প্রস্তাবের উত্তরে তিনি উদ্ধত মন্তব্যের সঙ্গে চোখ রাঙাতেও কসুর করলেন না।

এর ফলে নৈরাশ্যে ও বেদনায় দেশবন্ধু ভেঙে পড়লেন। কর্মীরা কারারুদ্ধ, গভর্নমেন্টের দমননীতি সমভাবে চলছে, দেশের মধ্যে অন্তর্দাহ আছে কিন্তু তাতে অগ্নিদাহের লক্ষণ নাই। দেশবন্ধুর জীবনের স্বপ্ন, অন্তরের কামনা, হৃদয়ের আশাভরা উৎসাহ সফল হতে চলেছিল। কিন্তু তখনো বুঝি পরাধীন জাতির কলঙ্ক মোচনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় নি। তাই দেশবন্ধুর গৌরবময় জীবন সাফল্যমণ্ডিত না হতেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি স্যার এন. এন. সরকারের দার্জিলিং-এর বাড়ি 'step aside'-এ স্বাস্থ্যলাভের জন্য গেলেন কিন্তু বেশিদিন তাঁকে সেখানে থাকতে হল না। ১৯২৫ সালের ১৬ জুন, ২ আষাঢ় ১৩৩২ মঙ্গলবার অপরাহ্ণে তিনি দেহত্যাগ করলেন। পরদিনই দার্জিলিং মেলে চিত্তরঞ্জনের শবদেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল। এ বিষয়ে নলিনীরঞ্জনের চেষ্টায় কৃষ্ণনগরের মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

সেদিনকার শবযাত্রায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনতা দেখে ইংরেজ-পরিচালিত কোনো একখানি কাগজ বলেছিল— ভিক্টর হিউগোর শবযাত্রার পর মহৎ ব্যক্তির (great man) তিরোধানে এত বড়ো বিরাট শবযাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

আমরা সে শবযাত্রা নিজের চোখে দেখেছি : শিয়ালদহ থেকে সেই মিছিল বের হয়ে হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী দিয়ে কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে উপস্থিত হল। আমি ও বন্ধুবর অরুণচন্দ্র দত্ত (আমাদের অন্যতম কংগ্রেস নেতা) কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডে মোড়ে দাঁড়িয়ে যে শান্ত মৃদু প্রবাহিত নরনারীর জনসমুদ্র দেখেছিলাম জীবনে সে ছবি ভুলতে পারব না ; যাঁরা আমাদের মতো সে দৃশ্য দেখেছেন তাঁরাও ভুলবেন না। অনেক ইংরেজকে

"লেজলে"র দোকানের সামনে "আর্মি নেভি স্টোরস্"-এর সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে এবং চিত্তরঞ্জনের শবাধার নিকটে এলেই তাঁরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন— এও অনেকে দেখেছে।

গান্ধীজি তখন কলকাতায়। বাসন্তী দেবীকে নিয়ে তিনি স্বয়ং শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন। শবদেহের সঙ্গে আসতে আসতে পা পিছলে (বোধকরি মহাত্মার পায়ে তখন খড়ম ছিল) গেল, একজন সার্জেন্ট গান্ধীজিকে ধরে ফেললে। তার পর আর কিছু দেখতে পেলাম না। হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছি, পাশ দিয়ে রোরুদ্যমানা বাসন্তী দেবীকে নিয়ে সেই বিপুল জনতা এড়িয়ে বৈঠকখানার গলির ভিতর দিয়ে মোটরে গান্ধীজি চলে গেলেন।

গুরুর প্রতি শিষ্যের শেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবার সুযোগ পান নি সুভাষ-চন্দ্র, তিনি তখন মান্দালয় জেলে। সেখান থেকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত, বসুমতীতে প্রকাশিত দেশবন্ধু সম্বন্ধে "স্মৃতিকথা" পড়ে তিনি লিখছেন—

"…যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার— এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

"আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল— 'একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে— এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁহার আশেপাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই; পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।'… অনেকে মনে করে যে, আমরা অন্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করতুম। তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশি ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হত। কিন্তু আমি জানতুম যে, যত ঝগড়া করি-না কেন— আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে— আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনো বঞ্চিত হব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় ঝঞ্ঝা আসুক-না কেন— তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে কিন্তু হায়— 'রাগ করিবার অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেছে।'

আর এক দিকে দেখতে পাই সুভাষচন্দ্রের প্রতি চিত্তরঞ্জনের অপরিসীম স্নেহ ও মমত্ববোধ— সুভাষচন্দ্র তাঁর কাছে ছিলেন প্রিয় হতেও প্রিয়তর। তাই

১৯২৪ সালের ২৫ অক্টোবর কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন বিনা বিচারে যখন সুভাষচন্দ্র বন্দী হলেন তখন সর্বাপেক্ষা বিচলিত ও বিহ্বল দেখা গিয়েছিল দেশবন্ধুকে। তিনি মেয়রের আসন থেকে বললেন— If love of country is a crime, I am a criminal. If the Chief Executive Officer is criminal then I declare that the Mayor is also criminal."

"দেশকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয় তা হলে আমিও অপরাধী। যদি প্রধান কর্মকর্তা অপরাধী হন তা হলে আমি বলছি যে মেয়রও অপরাধী।"

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য এরপর থেকেই মন্দের দিকে যেতে থাকে। সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি ফরিদপুর-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁর অভিভাষণে তিনি গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা আপস নিষ্পত্তির ইঙ্গিতও দেন। তিনি ভেবেছিলেন একটা আপস হয়ে গেলে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে, সেইসঙ্গে সুভাষও মুক্তি পাবেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন না কিন্তু দিবারাত্রি তাঁর প্রাণে রাজবন্দী সুভাষের চিন্তা যে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল এ কথা যাঁরা তাঁর সঙ্গে তখন মেলামেশা করেছেন তাঁরাই জানেন। চিত্তরঞ্জনের স্নেহ প্রীতি পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাই জানেন যে তাঁর অনুগত সহকর্মী ও শিষ্যস্থানীয় সকলকেই তিনি এমন স্নেহের চক্ষে দেখতেন, তাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার এমনি সহৃদয় ও মধুর ছিল যে তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন যে আমাকে তিনি অমুকের সমান অথবা হয়তো বেশিই ভালোবাসেন। এর মূল কারণ ছিল এই যে রাজনীতির শুষ্ক পরিবেশের মধ্যেও দেশবন্ধু তাঁদের নিয়ে এমন একটি স্নেহের নীড় রচনা করেছিলেন যে বাস্তব ক্ষেত্রের ধূসর ঊষরতার মধ্যেও পরিপূর্ণ হৃদয়ের সরল প্রস্রবণের সন্ধান তারা পেয়েছিল, শুধু যে সন্ধান পেয়েছিল তাই নয়, তার অপূর্ব আস্বাদও তারা পেয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের তিরোধানে তার সম্পূর্ণ অভাব ঘটল এবং এ এমন একটি অভাব যা অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায় কিন্তু এই বাস্তব পৃথিবীতে তার পরিপূরক কোনো বস্তুর সন্ধান করতে গেলে হতাশই হতে হয়।

তখন বাঙলাদেশের একমাত্র আশার প্রদীপ— অন্ধকার পথের একমাত্র দিশারী— চিত্তরঞ্জন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন— যে স্বপ্নের বিহ্বল আত্মচেতনা সুভাষচন্দ্রকেও স্বাপ্নিক করে তুলেছিল, দেশের মুক্তির স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কিরণশঙ্কর রায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেশবন্ধুর আকস্মিক তিরোধান যখন গভীর শোকের প্রাবল্যে আপনাদের আত্ম-হারা করে দিয়েছে, ঠিক সেই সময় শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বর্তমান লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বিজলী'র দেশবন্ধু-সংখ্যায় লিখে-ছিলেন :—

"১৯২১ সালে যখন বাংলাদেশে Criminal Law Amendment Act অমান্য করেছিল – সেই volunteer movement-এর আরম্ভের কথা আমার মনে আছে। মাত্র গুটি পনেরো লোক নিয়ে তিনি এই movement আরম্ভ করেন। আমরা অনেক তর্ক করেছিলাম— volunteer হাতে নেই— নূতন volunteer ভর্তি হবার কথা নয়, সে সম্বন্ধে যুক্তি ও facts আমাদের দিকে ছিল— কিন্তু অন্য দিকে ছিল দেশবন্ধুর অটল বিশ্বাস— এবং তার উপর নির্ভর করেই কাজ আরম্ভ হল— তার পর দেখা গেল বাংলার বিশ হাজার ছেলে সে বিশ্বাস রেখেছিল। গতবার যখন মন্ত্রীদের বেতন দেবার প্রস্তাব কাউন্সিলে অগ্রাহ্য হয়— তখনো ভোটের লিস্ট দ্বারা আমরা বেশ বুঝেছিলাম যে আমরা হারব কিন্তু দেশবন্ধুর কাছে সে কথা বলে কোনো লাভ ছিল না কারণ সব কথা যখন ভালো করে বুঝিয়ে লিস্ট করে গুণে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হল, তিনি বললেন, "সব ঠিক কিন্তু আমরা জিতব।" আরো বহুবার দেখা গেছে যে এই আশ্চর্য বিশ্বাসের দ্বারা তিনি নিশ্চিত পরাজয়ের মধ্য থেকে জয়কে ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই বিশ্বাসের জোর তিনি তাঁর কর্মীদের মধ্যেও সঞ্চার করতে পেরে-ছিলেন— পরাজয়ের কথা মনে আনবারও সাহস তাদের ছিল না ; সে কথার উল্লেখ করলেই বলতেন— "If I could only influence some spirit in those old young men"—

"আজ শ্মশানের আগুন নিবে গেছে বটে কিন্তু বাংলার এই অপরিমিত ক্ষতির আলোচনা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়— সে আলোচনা আমি করব না। আর একটি মাত্র কথার উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করল। প্রবল ইচ্ছা-শক্তি বলো, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব বলো, হরিশ্চন্দ্রের মতো দান বলো, দধীচির মতো ত্যাগ বলো সে তো ছিলই— কিন্তু আর একটা গুণ ছিল যা তাঁর চরিত্রকে অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছিল— সেটা হচ্ছে তাঁর মাধুর্য। যে বজ্রগর্ভ কালবৈশাখীর মেঘ নিদ্রিত ত্রিশ কোটি নরনারীর তন্দ্রা গভীর গর্জনে ভেঙে

দিয়েছিল— আকাশভেদী রাজপ্রাসাদের চূড়া হতে ভিত্তি পর্যন্ত যার প্রচণ্ড আঘাতে কেঁপে উঠেছিল— সে মেঘের মধ্যে কী করুণার স্নিগ্ধতার বারি ছিল তা দেশ জানত। তাই আজ বাংলার ঘরে ঘরে কেবল নেতার অভাবে শোক নয়, বন্ধুর বিহনে শোক অনুভব করছে। জীবনের শেষ দিকে এই মাধুর্য যেন আরো বেড়েছিল— ক্ষত্রিয়সুলভ তেজ, দম্ভ, রোষ, যেন মৃদু হয়ে আসছিল— যেন অন্তরে তিনি বুঝেছিলেন যে আর বেশি দিন নাই। যে ছিল রাখাল, বাংলার হাটে মাঠে বাঁশি বাজিয়ে খেলা করে যার দিন কাটাবার কথা ছিল, অকস্মাৎ মথুরায় সিংহাসনে তাকে রাজা হতে হয়েছিল— কিন্তু সিংহাসনে বসে ধেনুচরা মাঠের জন্য, নির্জন নদীতীর ছায়া— নিবিড় গ্রামের জন্য তাঁর মন কাঁদত— তারপর অকস্মাৎ মৃত্যু বাঁশি বাজিয়ে সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে গেল —বাংলা চমকে দেখলে তাঁর সিংহাসন শূন্য। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে চিরকাল তা শূন্য থাকবে না। নেতা আমরা আবার পাবই— যিনি গগনপথে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকাকে চালনা করেন, আবার ঝড়ের রাতে ক্ষীণ পাখিটিকে যিনি আপন নীড়ে ফিরিয়ে আনেন— পাহাড় সমুদ্রকে সন্ধ্যা সকালে যিনি অপূর্ব রঙিন মায়ায় সাজিয়ে তোলেন— আবার বনফুলের বুকের মধ্যে একটুখানি রঙের পরশ দিতে যিনি ভুলেন না— বিজয়ীর বিজয়দম্ভ— বিজিতের চোখের জল কিছুই যাঁর অতন্দ্র চক্ষুকে এড়ায় না— তিনি বাংলার কথা ভুলবেন না। সিংহাসন শূন্য থাকবে না; কিন্তু আমার মনে হয় সে তো বাহিরের সিংহাসনের কথা— আজ বাংলার অন্তস্তলে হৃদয়ের যে শূন্য সিংহাসন ঘিরে হাহারব উঠছে— সে সিংহাসন— ?”

কেহ কেহ মনে করতে পারেন— সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে দেশবন্ধু সম্পর্কে এ-সব কথার অবতারণার তাৎপর্য কী। তাঁদের অবগতির জন্য বলা যেতে পারে(সুভাষচন্দ্র— চিত্তরঞ্জনের পটভূমিকায় যেমন উজ্জ্বল তেমনি মহনীয়— গুরুশিষ্যের স্বদেশসাধনার আদর্শ, নীতি ও পদ্ধতির আমরা ক্রমবিকাশ দেখতে পাই, তাতে একের ব্যতিরেকে অপরের জীবনী যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, এ কথা আজ দেশবাসীর পক্ষে জানা দরকার।)সেইজন্যই এই পুস্তকে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছি সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

বিপিনচন্দ্র পালের শ্রদ্ধাতর্পণ

বিপিনবাবুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ হলেও নিজের মতবাদ ও আদর্শের প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই উত্তরকালে তিনি চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন কিন্তু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্ব— বিরাট চরিত্রবত্তার প্রতি তিনি এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে তাঁর কাছে আমি উপস্থিত হতেই তিনি সাগ্রহে নিম্নে উদ্ধৃত লেখাটি 'বিজলী'তে প্রকাশের জন্য আমাকে দিয়েছিলেন। দল ও মত নিরপেক্ষ ভাবে চিত্তরঞ্জনের প্রতি যে অজস্র শ্রদ্ধাঞ্জলি বর্ষিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে বিপিনচন্দ্রের এই শ্রদ্ধাতর্পণটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে :—

"কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদ ও শোকের ছায়া সমগ্র জাতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর ইহজগতে নাই। তাঁহার সহিত আমাদের যতই মতভেদ থাকুক, গত ২৫ বৎসর দেশের কাজের হিসাবনিকাশ করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে দেশ যে গভীর ঋণপাশে আবদ্ধ আছে তাহা স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িবে। মত পরিবর্তন হয় অবস্থার পরিবর্তনে, কার্যপদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়, কিন্তু এ-সকলের ঊর্ধ্বে মত ও নীতির গন্ডি ছাড়াইয়া চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সতত উজ্জ্বল। দেশের মঙ্গলের জন্য জাতির উন্নতির জন্য যাহা তিনি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য কোনোপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই চিত্তরঞ্জন কুণ্ঠিত হন নাই। জাতির মুক্তিলাভের জন্য যে উপায়কে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা দ্রুত কার্যকর বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহার সাধনায় তিনি নিজেকে টুকরা টুকরা করিয়া বলি দিয়াছেন; ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইজন্যই তাঁহার দেশপ্রেম দেশের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। আমার নিকট তাঁহার মৃত্যু দেশমাতৃকার নিকট আত্মবলি বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বয়স বেশি হয় নাই বটে কিন্তু তাঁহার জীবনের দীপ-সলিতা দেশসেবার কঠোর কর্মের অনলে পুড়াইয়া তিনি নিজেই জ্বালাইয়া নিঃশেষ করিলেন। দেশের নেতা বলিয়া নানা ঝঞ্ঝাট তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত। তিনি যে রাজনীতিক দল গঠন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান হইলেও তাহার উপাদান ভঙ্গুর এবং কাঁচা ছিল— এইজন্যই তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাতই চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার দৃঢ়তর সবল

স্বাস্থ্য এই অত্যধিক কর্মের বোঝা বহিতে পারে নাই। ভারতের তিনি রাজনৈতিক নেতা কিন্তু আমার নিকট গত ২০ বৎসর ধরিয়া তিনি সহোদর ভাই এবং পুত্রের মতোই ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আমার বন্ধু এবং সাধারণের নিকট বিশ্বাসভাজন সহকর্মী ছিলেন। ৫ বৎসর আগে আমরা দলছাড়া হই। ইহার পর বাহ্যিক অবস্থায় আমাদের আন্তরিকতা অনেকটা বাধা পাইয়াছে বটে— অবশ্য সে অবস্থার উপর তাঁহার বা কাহারোই কোনো হাত ছিল না— কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ পবিত্র হইতে পবিত্রতরই ছিল। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া লোকে জানে যে, আমি তাঁহার বক্তৃতা বা কার্যপদ্ধতির একজন কঠোর সমালোচক ও বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু তাহারা তো জানে না যে যখনই আমাকে তাঁহার বিরুদ্ধে কড়া কথা লিখিতে হইত তখনই আমাকে কলমটিকে আমারই হৃদয়ের তপ্ত রক্তে রঞ্জিত করিয়া লইতে হইত। আজ সন্ধ্যায় এই বিশ বৎসরের আত্মীয়তা ও সহযোগিতায় কাজ করিবার কথা আমার মনকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতেছে যে এখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা অসম্ভব। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক। যিনি একহাতে আঘাত করিয়া অপর হস্ত দ্বারা আহতকে রক্ষা করেন, তিনিই এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার শোকার্ত পরিবারবর্গকে প্রদান করুন।"

মৃত্যুহীন প্রাণ

জীবনে যাঁর মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম লাভ ঘটে নি মৃত্যুতে তিনি চিরশান্তি লাভ করলেন। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যুতে তো তার বিনাশ হতে পারে না— এই হতভাগ্য অসহায় জাতির জন্য স্বর্গে গিয়েও তিনি কি শান্তি পাবেন না? কীর্তিমান মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। আমরা আজ তাঁকে যেমন হারিয়েছি তেমনি লাভও করেছি। আজ যে তাঁর অখণ্ড অধিকার আমাদের সমস্ত শোক, দুঃখ বেদনা, সুখ শান্তি আনন্দকে অভিভূত করে দিল, ইহা কি তাঁর নূতন করে আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ নহে? আজ যে অবিশ্রান্ত হাহাকার ও অবিরাম অশ্রু বর্ষণের মধ্যে তাঁর পরিচয় নূতন করে পেলাম; বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস, গগনভেদী আর্তস্বরের মধ্যে আজ যে তাঁর অক্ষয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হল তার মধ্যে কি মৃত্যুর অভাব কোনো অনর্থের সৃষ্টি করতে পারবে?— এই কথাই সেদিন আমার বার বার মনে হয়েছিল।

অবশ্য বাঙালীর এমন দুর্যোগের দিন পূর্বে আর আসে নাই। বাহিরে আকাশ বাতাস, আলো অন্ধকারের মধ্যেও সেই দুর্দিনের মর্মছেঁড়া রোদনধ্বনি শোনা গিয়েছিল। সেই মহামানবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঘনায়মান মেঘভারে মলিন হয়ে উঠেছিল, চারি দিকে হাহাকার উঠল— চিত্তরঞ্জন নাই; বাঙলা মায়ের অঞ্চলের নিধি, বাংলার আত্মভোলা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, বাঙালী জাতির গৌরব, ভারতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আর নাই। সমস্ত আকাশের রঙ যেন সেদিন মুছে গেল— মনের ঔদাসীন্যে তবু সেদিন মনে হল—

এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো
এই তো আলো।"

যিনি জীবনের সকল সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন— মৃত্যুতেও তিনি জয়ের অম্লান গৌরব থেকে বঞ্চিত হন নি। জীবনে পুষ্পসম্ভারে তিনি যেমন ছিলেন সুন্দর— মরণেও ফলসম্ভারে তেমনি তিনি মহীয়ান হয়ে রইলেন।

"সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
শুরু হবে বৃষ্টি-ঢালা,
বরফ-জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।"

জাতীয়তাবোধ বললে আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির কথাটাই বেশি করে মনে পড়ে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রীতি ছিল অভিনব। দেশকে ভালোবাসতেন তিনি মনেপ্রাণে কর্মে ও সাধনায়। প্রভূত অর্থের অধিকারী ও ভোগী হয়েও সে-সবের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না, প্রাণের প্রতিও তাঁর কোনো মমত।

ছিল না, আত্মজ বা প্রিয়জনের উপরও অন্ধ মমতাবোধ ছিল না— তাই প্রাণাধিক পুত্র ও প্রিয়তমা পত্নীকেও অম্লান বদনে দেশের কাজে বিপদের মুখে এগিয়ে দিতে তাঁর বাধে নি। তাঁর সমগ্র হৃদয়ের আকর্ষণ, অন্তরের কামনা, জীবনের প্রলোভন ছিল দেশসেবার কাজে একেবারে নিঃশেষ করে নিজেকে ঢেলে দেওয়া। তাই তিনি তাঁর ধন সম্পদ ঐশ্বর্য ধূলিমুষ্টির মতো অনায়াসে দূরে নিক্ষেপ করলেন— সাংসারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস-ব্যসন শুষ্ক পাতার মতো একদিন আপনা থেকেই ঝরে গেল, তিনি সেজন্য এতটুকু বেদনাবোধও করলেন না। দেশের ডাকে পথের ভিখারী হয়ে তিনি বাহিরে সকলের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন— নিজের বসতবাটী পর্যন্ত নারীকল্যাণ সাধনে উৎসর্গ করে সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মুক্ত পুরুষ তিনি, যে ত্যাগ তিনি করলেন "সে তো খেয়ালের বশে নয়, প্রবৃত্তির জোরে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের প্রলোভনেও নয়"— এ যেন একটি সুন্দর পরিপূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগের দুর্জয় ভাবাবেগ।

পরাধীন জাতির মুক্তির জন্য তিনি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন, তাঁর কর্মের সফলতা জাতির কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে রইল। এত বড়ো প্রাণের বিনাশ নাই —চিত্তরঞ্জন তাই তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি নিজের প্রাণকে অফুরন্ত করে আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন—

"সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান
মৃত্যু আপন পাত্র ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।"

চিত্তরঞ্জন জীবনের প্রদীপ্ত আহূতিতে মাতৃপূজা শেষ করেছিলেন। আজ তিনি নিজের দেহ দিয়ে, নিজের শক্তি সামর্থ্য ও কর্মকুশলতার বিচিত্র সম্ভারে দেশ-দেবতার অর্ঘ্য রচনা করতে পারছেন না বটে কিন্তু তাঁর অমর আত্মার অনাহত মন্ত্রধ্বনি— সে তো এখনো পর্যন্ত অপূর্ব ঝঙ্কারে আমাদের আকাশ বাতাস আলো অন্ধকারকে মুখরিত করে আছে— সেই সদাজাগ্রত শাশ্বত মন্ত্রধ্বনির মধ্যে— তাঁকে আমরা বারবার নূতন করে লাভ করছি। তাই মনে হয় মহামানব চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয় নি— হতে পারে না। জীবনের অফুরন্ত আতিশয্যে যিনি লীলাচ্ছলে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলতেন, যাঁর প্রতি পাদবিক্ষেপে জীবনের

লাস্য-ভঙ্গিমা আমাদের চক্ষে বিস্ময়ের সৃষ্টি করত, মৃত্যু যাঁর আহ্বানে প্রবদ্ধ চেতনায় নবজীবনের গানে চকিত হয়ে উঠত, তিনি তাঁর মৃত্যুতে নিত্যকালের জন্য অমৃত হয়ে আছেন। চিত্তরঞ্জনের জীবনকে, তাঁর মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ নূতন আলোকে উপলব্ধি করে সেদিন বলেছিলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

সাইমন কমিশন ও ছাত্র-সংগঠনে সুভাষচন্দ্র

এ সময়ে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে। সেখানে তিনি ১৯২৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে প্রায়োপবেশন করেন— কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য ব্যয়ভার বহন করতে অস্বীকৃত হন— ৪ মার্চ তাঁদের দাবি পূর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন।

১৯২৭ সালের ১৬ মে যখন সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পেলেন তখন তিনি খুব অসুস্থ। ১৯২৮ সালে সুস্থ হয়ে তিনি "সাইমন কমিশন"-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয় (Anti Simon Commission) তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

"১৯২৭ সালের শেষ দিকে ভারত শাসন আইনের ৪৮ ধারার নির্ধারণ অনুসারে শাসনপদ্ধতি, শিক্ষাবিস্তার, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারণ জ্ঞাপন জন্য এই কমিশন গঠিত হয়। ইহাতে ভারতবাসীর স্থান না থাকায় জাতীয় দল ইহা বর্জন করেন। শেষে সরকার এই কমিশনের সঙ্গে এক ভারতীয় কমিটি নিযুক্ত করেন। জাতীয় দল ইহা জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করেন।"— হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, 'কংগ্রেস ও বাঙ্গালা'।

সাইমন কমিশন সম্পর্কে যে সরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়— সে সম্বন্ধে —Mr. Kate L. Mitchell -লিখিত শ্লেষাত্মক নিবন্ধের নিম্নমুদ্রিত অংশটি পড়ে পাঠকগণ কৌতূহল বোধ করবেন—

"In most western discussions of the "Indian problem" the main emphasis is laid on the diversity rather than the unity of the Indian people. India has been repeatedly pictured as a vast

welter of races, religions and languages, possessing only the unity imposed upon it by British rule and ready to fly into hostile and warring fragments if that rule should be weakened or removed...

The same thesis is implicit through the 'survey volume' of the famous Simon Report, which laid the basis for the new constitution granted in 1935. Issued in 1930 as a scientific and objective presentation of the facts about the Indian problem, this Report is filled with references to the "complication of language", with no less than "222 vernaculars" the rigid complication of innumerable castes", the "variegated assemblage of races and creeds", and similar expressions which suggest the utter impossibility of unity among the Indian people and the consequent importance of British rule as the only means of preserving internal peace and order, among the diverse elements composing Indian Society.

Yet what would an American think if an English commission visited us and made the following 'impartial' report on conditions in the United States :

The sub-continent of the United States is characterised by the great diversity of climate and geographical features, while its inhabitants exhibit a similar diversity of race and religion. The customary talk of the United States as a single entity tends to obscure, to the casual British observer, the variegated assemblage of races and creed which make up the whole. In the city of New York alone there are to be found nearly a hundred different nationalities, some of which are in such great numbers that New York is at once the largest Italian city, the largest Jewish city, and the largest Negro city in the world. The contiguity of such diverse elements has been a fruitful cause of the most bitter communal conflicts. In the Southern States especially, this has led to interracial riots and murders which are only prevented from recurring by the presence of an external impartial power able to enforce law and order. The notoriety of the rival gangs of Chicago...has diverted attention from the not less pressing problems presented

to the Paramount Power by the separate existence of the Mormons in Utah, the Finns in Minnesota, the Mexican immigration up the Mississippi, and the Japanese on the West Coast; not to speak of the survival in considerable numbers of the aboriginal inhabitants.

(This parody was written by an Englishman in 1930, to illustrate his objection to the spirit in which the Simon Commission approached the task of surveying conditions in India, and to the Report's one-sided emphasis on factors justifying the continued existence of an "external impartial power".)

এই সময় সুভাষচন্দ্র All Bengal Students Association (A.B.S.A) নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির গঠনে বাঙলার ছাত্রসম্প্রদায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। ব্যাপকভাবে ছাত্রসংগঠনের ব্যাপার ভারতবর্ষে এই প্রথম। এই সময় তিনি নিখিলভারত যুব সমিতি (All India Youth Association) গঠনেও বিশেষভাবে সহায়ক হন। ১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের পুনা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

কলিকাতা-কংগ্রেস ও কংগ্রেস প্রদর্শনী

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পার্ক সার্কাসে কংগ্রেসের ত্রিচত্বারিংশৎ (৪৩তম) অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি— যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মূল সভাপতি— পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অধিবেশনের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (G.O.C, General Officer Commanding) সুভাষচন্দ্র বসু। স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর কাপ্তেন বা নায়িকা ছিলেন শ্রীযুক্তা লতিকা বসু; কংগ্রেস প্রদর্শনীর সভাপতি— ডা. বিধানচন্দ্র রায়, সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। "এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র 'স্বরাজের' যে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা গৃহীত হয় নাই বটে কিন্তু পরবর্তী অধিবেশনে করাচীতে সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।"

কলিকাতা-কংগ্রেসে বাঙলা-প্রতিনিধিদের মুখপাত্র হয়ে সুভাষচন্দ্র স্থির করেন যে 'ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা'— এই প্রস্তাব অধিবেশনে পেশ করতে

হবে। মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেসের নেতৃবর্গ স্থির করলেন যে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে এক বৎসরের ওয়াদা দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে চরমপত্র (ultimatum) পাঠানো হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করার প্রস্তাবটিও তখন সুভাষচন্দ্রই তুলেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রস্তাবে পণ্ডিত জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন কিন্তু পরে মহাত্মাজী সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালকে ডেকে নিয়ে একটা আপস-মীমাংসা করলেন— অর্থাৎ তাদের চরমপত্র উপেক্ষা করে পার্লামেণ্ট যদি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অবিলম্বে না দেয় তা হলে পরবর্তী কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করা হবে বলে তিনি তাঁদের আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াল ঠিক অন্যপ্রকার। বাংলার প্রতিনিধিবর্গ মহাত্মাজীর "ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন" দাবির বিরোধিতা করবেন বলে সেই রাত্রেই স্থির হয়ে গেল। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্রও সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন বলে স্থির করলেন। পরদিন সকালে "বিষয় নির্বাচনী সভা"র (Subject Committee) অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে এই বিরোধিতার মুখপাত্র রূপে দাঁড়াতে দেখে গান্ধীজি খুব ক্ষুব্ধ হলেন। জওহরলাল মহাত্মাজীকে কথা দিয়েছিলেন— তার ব্যতিক্রম তিনি করলেন না। ভোটের আধিক্যে সাবজেক্ট কমিটি বা বিষয় নির্বাচনী সভায় এবং কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবই পাস হয়ে গেল তবে সেই থেকেই সুভাষচন্দ্রের উপর মহাত্মাজীর ভরসা কমে গেল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সূচনা হল এখান থেকেই। এই কারণে বাঙলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধির নিকট সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল। বাঙলার এই প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে পুরাতন বিপ্লবী দলের প্রাধান্য ছিল। এ সম্পর্কে "যুগান্তর" দলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবারকার কংগ্রেসের প্রদর্শনী দ্রষ্টব্য জিনিসের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্যে অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। প্রদর্শনী-সম্পাদক নলিনীরঞ্জনের সহকারীরূপে "হিন্দুস্তান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স"-এর সুধাংশুমোহন চৌধুরী ও অশ্বিনীকুমার মজুমদার দিবারাত্রি প্রদর্শনীর কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এবং বিরুদ্ধদলের বাধা পেয়েও এই প্রদর্শনী যে কংগ্রেসের ইতিহাসে আজও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে তার মূলে ছিল প্রদর্শনীর সভাপতি ডা. বিধানচন্দ্র রায় ও সম্পাদক নলিনীরঞ্জন সরকারের চেষ্টা ও অধ্যবসায় এবং

কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের সহকর্মীগণের আনুগত্য ও গভীর নিষ্ঠা ; প্রদর্শনীর আয় হয়েছিল প্রায় ৪ লক্ষ। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর এমন সুন্দর ও শৃংখলাবদ্ধভাবে সংগঠনের মূলে ছিল "জি-ও-সি" সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা। পোশাকে আশাকে চালচলনে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের মনে সেদিন তিনি যে ভাব ও প্রেরণা উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন তার উৎস ছিল সুভাষচন্দ্রের নিজের অন্তরে। কে জানে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠনের পরিকল্পনার সূত্রপাত এইখানে কিনা। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের কর্তব্যজ্ঞান, নিয়মকানুন পালনের কঠোরতা সম্বন্ধে আমরা বহু ঘটনার কথা শুনেছি ; শুনেছি যে তাঁর মধ্যম ভ্রাতৃজায়া (শরৎবাবুর স্ত্রী) প্রবেশপত্র না দেখাতে পারায় সুভাষচন্দ্রের কাছে সে বিষয় জানানো হল কিন্তু টিকিট দেখাতে না পারা পর্যন্ত তাঁকে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। কিছুক্ষণ পরে যাঁর কাছে টিকিট ছিল তিনি এসে পড়ায় সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

গান্ধীজি কলিকাতা-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী দেখে মৃদুহাস্যে "সেলার্স সার্কাস" বলে বিদ্রূপ করেছিলেন কিন্তু আমরা এ কথাও জানি যে কলিকাতা-কংগ্রেসে প্রবর্তিত নিয়মকানুন ও রীতিনীতি অনুসরণ করেই পরবর্তী কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল এবং তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও গান্ধীজি তার প্রশংসা করেছিলেন। তখন থেকেই এইপ্রকার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কংগ্রেসের একটি অপরিহার্য প্রধান অংশ বলে সমাদৃত হয়ে আসছে।

লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯২৮ সালের কংগ্রেসে উত্থাপিত পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি গভর্নমেন্ট মানলে না— ১৯২৯ সালের লাহোর-কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়ে গভর্নমেন্টের কাছে তাঁদের "চরমপত্র" প্রেরণ করলেন— এবং মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হওয়ার সংগে সংগে পূর্ণস্বাধীনতার দাবি কংগ্রেস-কর্তৃক ঘোষিত হল। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃবর্গের মধ্য থেকে এই পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার পর কী করা হবে তার কোনো প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম কেহই দিতে পারলেন না। একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেদিন বললেন প্যারালাল গভর্নমেন্ট

(Parallel Government) বা প্রতিদ্বন্দ্বী সমান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হোক। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সে প্রস্তাব নেতৃবৃন্দ গ্রহণ তো করলেনই না,— বরং সে প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁরা সম্যক বিবেচনা করলেন কিনা তাও ঠিক বোঝা গেল না।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র হিন্দুস্তান সেবাদল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তার কিছুকাল পরেই তিনি পণ্ডিত জওহরলাল, স্বর্গীয় শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখকে নিয়ে Indian Independence League বা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি নেহরু কমিটির সর্বদলীয় সম্মেলনেরও (All Parties Confererce) অন্যতম সভ্য ছিলেন।

১৯৩০ সালে তিনি All India Trade Union Congress-এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন। আগের বৎসর সভাপতি হয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ

১৯২৯ সালের লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করা হল বটে কিন্তু গভর্নমেন্টের দম্ভ ও উপেক্ষার ফলে গান্ধীজিকে আইন অমান্য (অহিংস ভাবে) করার নির্দেশ দিতে হল। ফলে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বিধানে বে-আইনী বলে ঘোষিত হল এবং সংগে সংগে অনেক কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। ১৯৩০ সালে এই কারণেই কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ থাকে। এই সময় গভর্নমেন্টের সংগে একটা মিটমাট করার জন্য সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু এবং মি. জয়াকর বিশেষ চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু কোনো ফল হল না।

এই সময় গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের উপর জুলুম করে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ভেঙে দেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে পরবর্তী নির্বাচন দ্বন্দ্বে বহু-সংখ্যক কংগ্রেসপ্রার্থী নির্বাচিত হয়ে এলেন। আগস্ট মাসে তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী দিবস (All India Political Sufferer's Day) পালন করে একটি শোভাযাত্রা বের করেন। এর জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করে ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে ৯ মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বাঙলা কংগ্রেসের দলাদলি

১৯২৯ সাল থেকে বাংলা কংগ্রেসে ভীষণ দলাদলি আরম্ভ হয়— একদিকে সুভাষচন্দ্র অন্য দিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে মুদ্রিত সুভাষচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধ "আমাদের দলাদলি" পড়ে দেখা কর্তব্য। সুভাষ-চন্দ্রের সহায়ক ছিলেন— শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ও ডা. বিধানচন্দ্র রায়। তখন-কার দিনে এঁদের হৃদ্যতার কথা, একযোগে একপ্রাণ হয়ে সখ্যতার সঙ্গে কাজ করার কথা আমরা জানি। ১৯৩০ সালের ২২ আগস্ট তারিখে সুভাষবাবুকে রাজবন্দী অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত করার মূলে এই Big five— পাঁচজন মুরুব্বির অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম ছিল। 'স্টেটস্-ম্যান' পত্রিকা এইজন্য এঁদের Big five— 'পঞ্চ মুরুব্বি' নামে অভিহিত করে-ছিল। এই সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত -পরিচালিত *Advance* পত্রিকায় এই পাঁচজন কংগ্রেসী মুরুব্বিদের উপর দিনের পর দিন বিষ উদ্গীরণ হতে দেখা গেছে। তার পর অবশ্য এই পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতির পরিবর্তন ঘটে।

'দলাদলির হোক অবসান' এই আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে সুভাষচন্দ্র যদিও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বাঙলার কংগ্রেস, কর্পোরেশন ও কাউন্সিলের নেতৃত্ব করার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন তবু দলাদলির অবসান ঘটতে দেখা গেল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী -সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অভ্যুদয়' থেকে সম্পাদকীয় অংশের উদ্ধৃত তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে অনেকটা আভাস দিতে পারবে :—

"ভাবিয়াছিলাম সেনগুপ্ত মহাশয় এবং সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আপস-মীমাংসার

ফলে বাংলায় এতদিন পরে বুঝি শান্তি ফিরিয়া আসিল, এতদিনে দ্বন্দ্ব, সকল অনর্থের বুঝি অবসান হইল। ভাবিয়াছিলাম, বাংলার নির্বিরোধ জনসাধারণ এইবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিবে। ঘরে খবরের কাগজে এবং রাস্তায় ফেরিয়ালার চিৎকারে আর একপক্ষের অপরপক্ষ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনিতে হইবে না। কিন্তু বাংলার বিধিলিপি অন্যরূপ। বিরোধ এখানে মিটিয়াও মিটিতে চাহে না ; এক বিরোধ শুধু অন্য বিরোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেয়, এই মাত্র।

"কংগ্রেস বিরোধের অবসান বলিয়া ঘোষণা হইবার পর হইতে এখন পর্যন্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'অ্যাড্‌ভ্যান্স' কাগজের সুর কিছুমাত্র বদলায় নাই এবং কর্পোরেশনেও শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে সেই পুরাতন গোলযোগ এখনও চলিতেছে।

"আজ সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর বাংলা দেশে নেতৃত্ব করিবার তিনি ছাড়া যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই। নিজের সম্বন্ধে সমস্ত মিথ্যা অহংকার বিসর্জন দিয়া সকল তুচ্ছতার উর্দ্ধে উঠিয়া সেই যোগ্যতা প্রমাণ করিবার এই প্রথম সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। কর্পোরেশনের কেলেঙ্কারীর মধ্যে নিজের জেদ্ বজায় রাখিতে ও অহঙ্কারের খোরাক জোগাইতে গিয়া সেই সুযোগ তিনি যেন না হারান ইহাই আমরা চাই।" - 'অভ্যুদয়', ১৮ আশ্বিন ১৩৩৮, ৫ অক্টোবর ১৯৩১।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ায় সরকারি নীতির প্রতিবাদে এবং লাহোর জেলে অনশনকারীদের সমর্থনে কলিকাতার একটি বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনাকালে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হন ও পরে মুক্তি পান। সেই সময় লাহোর জেলে বন্দী-আবাসে দীর্ঘ ৬৩ দিন প্রায়োপবেশনে যতীন্দ্রনাথ দাসের ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ মৃত্যু হয়— জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র শহীদ যতীন্দ্র দাসের শবদেহ নিয়ে কলকাতায় বিরাট মিছিল করেন। আমরা সে শবযাত্রার মিছিল স্বচক্ষে দেখেছি— দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর এমন বিরাট শবযাত্রা আমরা এখনো পর্যন্ত দেখতে পাই নি। শুনা যায় গান্ধীজিকে এ সম্বন্ধে একটি বাণী (message) পাঠাবার জন্য তারযোগে সুভাষচন্দ্র বারবার অনুরোধ করার পর এই আত্মত্যাগকে তিনি ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যা (Diabolical suicide) বলে অভিহিত করেন, যদিও কিছুকাল পরে ভগৎ সিংহের মৃত্যুকে তিনি মহান আত্মত্যাগ বলে প্রশংসা করেছিলেন। এর পরেই সুভাষচন্দ্র হাওড়া রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং ২১ অক্টোবর পাঞ্জাব প্রাদেশিক

ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে মতদ্বৈধ হওয়াতে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদে ইস্তফা দিলেন। ১ ডিসেম্বর অমরাবতীতে আহূত মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে সুভাষচন্দ্র বিপুল সংবর্ধনা পেলেন।

১৯৩১-১৯৩৯

গোল টেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন এবং ১৯৩১ সালে, ১৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী গোল টেবিলে যোগদান করার মতো মনোভাব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ২৫ জানুয়ারি বড়োলাট লর্ড আরউইন-কর্তৃক বে-আইনী বলে ঘোষিত কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির উপর থেকে পূর্ব আদেশ প্রত্যাহার করেন। ৫ মার্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তিশর্ত সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। এর ফলে কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতারা মুক্তি পান। কিন্তু তখনো শতসহস্র কংগ্রেসকর্মী কারারুদ্ধ থাকেন। তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

'স্বাধীনতা দিবস'-এ শোভাযাত্রা

১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন পরিভ্রমণ করেন। ঐ সময় তিনি ১৪৪ ধারা অমান্য করে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রেল স্টেশনের বিশ্রাম কক্ষে এই বিচার হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তখন মেয়র —২৬ জানুয়ারি 'স্বাধীনতা দিবস'-এ কর্পোরেশন থেকে বিরাট মিছিল বার করে তার পুরোভাগে চললেন সুভাষচন্দ্র। শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতি কর্পোরেশনের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অক্টরলোনি মনুমেন্টের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ডেপুটি কমি-শনারের অধীনে পুলিস বাহিনী মিছিলের সামনে এসে দাঁড়াল, অগ্রসর হতে দেবে না— সুভাষচন্দ্রও জোর করে এগিয়ে যাবেন; এই সংঘর্ষের সময় তিনি পুলিসের লাঠিতে গুরুতরভাবে আহত হলেন। সুভাষবাবুর সামনে ক্ষিতীশ-বাবুও মাথায় আঘাত পেয়েছিলেন। এই মিছিলে স্বর্গীয়া জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি তাঁর স্বভাবসুলভ নির্ভীকতার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও পুলিসের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রকে পুলিসের আঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নারী বলেও পুলিস তাঁর প্রতি সেদিন কোনো শ্রদ্ধা দেখায় নি। যাই হোক, সেই-খানেই সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন এবং পুলিস কোর্টের বিচারে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ৮ মার্চ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহ সুভাষচন্দ্রও মুক্তি পেলেন এবং সেই মাসেই (১৯৩১) করাচী-কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এবার সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডা. চৈতরাম গিধওয়ানী। এই অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র "নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভা" এবং "নিগৃহীত রাজনৈতিক বন্দীদের" (Political Sufferer's Conference) সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় প্রগতিশীল তরুণের দল গান্ধীজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পুনঃপুনঃ আপস করার মনোভাবের বিরুদ্ধাচরণ করেন— সুভাষচন্দ্র এই ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন কিন্তু গান্ধীজি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিনা শর্তে গোলটেবিল বৈঠক অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন এ কথা পূর্বেই বলেছি। আমাদের মনে হয়— গান্ধীজি-প্রবর্তিত যে আইন অমান্যের জন্য তখনো পর্যন্ত বহুসংখ্যক কংগ্রেস-কর্মী কারারুদ্ধ ছিল, তাদের মুক্তি না দিলে তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন না — এ রকম শর্তে গভর্নমেন্টের দ্বারা আইন-অমান্যকারী রাজবন্দীদের কারামুক্ত করতে পারতেন। এ ব্যাপারে গান্ধীজি মডারেট-পন্থী নেতাদের মতোই আচরণ করলেন— অথচ তাঁর যোগদান করার উদ্দেশ্যও সফল হল না— সাম্প্রদায়িক সমস্যা যেমন জটিল ও শোচনীয় তেমনই থেকে গেল।

আইন-অমান্য ও বন্দাবিলা সত্যাগ্রহ

এই ব্যর্থতার জন্য বারদোলির পর আবার "আইন অমান্য" আরম্ভ হল— অবশ্য এবার গান্ধীজির অনুপস্থিতির সময়েই তার আয়োজন করা হয়েছিল। বাঙলাদেশে বন্দাবিলার (যশোহর) আইন অমান্য ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র নেতৃত্ব করেছিলেন। সে সময় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী, সম্প্রতি-কারামুক্ত 'সংহতি'-সম্পাদক সুরেন্দ্র নিয়োগী ও শ্রীযুক্ত বিজয় রায় এবং চন্দ্রবাবু, কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির উদ্যোগে এবং খ্যাতনামা সমাজসেবক ও কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর সহযোগিতায় এই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছিল।

এতে করে গভর্নমেন্টের আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষার অজুহাত বেড়ে গেল

দ্বিগুণ। ফলে চন্ডনীতি শুরু হয়ে গেল দেশের মধ্যে নানাস্থানে। নেতৃবৃন্দ একে একে বন্দী হতে লাগলেন। এই অবস্থায় গভর্নমেন্টের শাসন অমান্য করে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে শেঠ রণছোড়লাল ও কলিকাতায় শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে— কংগ্রেস অধিবেশনের চেষ্টা হল বটে কিন্তু সে চেষ্টা সফল হল না। এর পরই গান্ধীজি মুক্তি পেলেন— সংগে সংগে কংগ্রেসের তরফ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল।

আইন-অমান্য আন্দোলনে নলিনীরঞ্জন ও বিধানচন্দ্র

দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের অনেকটা শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। কিভাবে আন্দোলনকে লোকবল ও অর্থবলের সাহায্যে সফল করা যায় এ বিষয় যাঁরা তখন চিন্তা করতেন, বুদ্ধি দিতেন, ব্যবস্থা করতেন, শ্রম স্বীকার করতেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন নলিনীবাবু। বিধানবাবুও (ডা. বিধানচন্দ্র রায়) এই আন্দোলনকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই কারণেই ১৯৩২ সালের প্রথমে নলিনীবাবু ও বিধানবাবুর বাড়ি খানাতল্লাসী হয়— তাঁদের জমাখরচের খাতা ও চেকবইগুলি পুলিস নিয়ে যায় পরীক্ষা করে দেখার জন্য।

ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে রাজবন্দী সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হতে অনুরোধ করে নলিনীবাবু তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড উইলিংডনকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন, ফলে নলিনীবাবুর সহিত বড়োলাটের সাক্ষাৎকার হয়। ইহারই অব্যবহিত পরে বড়োলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি মি. এরিক মিভিল (Mr. Eric Mieville) নলিনীবাবুর কলিকাতার বাসায় (হিন্দুস্তান বিল্ডিংস) নিজে উপস্থিত হয়ে শরৎবাবু, বিধানবাবু, সত্যেন্দ্রবাবু (মিত্র), কিরণবাবু এবং আরো দু-একজন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে আলাপ-আলোচনা করেন। রাজবন্দী সমস্যার আলোচনায় দুইপক্ষের মতামতের খোলাখুলিভাবে আদানপ্রদান হল বটে কিন্তু পুলিসের তাড়না থেকে নলিনীবাবু বা বিধানবাবু নিষ্কৃতি পেলেন না— নববর্ষের (১৯৩২) প্রথমেই পুলিস তাঁদের বাড়িতে হানা দিয়ে শুভেচ্ছা জানাল এবং বোধ হয় মৃদু হাস্য করেই তারা একান্ত বন্ধুভাবে চেক বই নিয়ে চলে গেল। এটাকে নিখুঁত রাজনীতির চরম দৃষ্টান্তই বলতে হবে।

বাংলাদেশের এক পল্লীতে

কার্লসবাদ। ১৯৩৫

বেতার ভাষণরত। সিঙ্গাপুর

সিংগাপুর ক্যাথে হলের সামনে

এ সি চ্যাটার্জী, এম জেড কিয়ানী এবং হবিবুর রহমান-এর সঙ্গে

হিজলী বন্দী-আবাস

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে সুভাষবাবু জানতে পারলেন যে— হিজলী বন্দী আবাসে পাহারা (Guard) গুলি চালিয়েছে, তার ফলে রাজবন্দীদের মধ্যে দু-জন মারা গিয়েছেন এবং অনেকে আহত হয়েছেন। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির (B.P.C.C.) সভাপতিত্ব এবং কর্পো-রেশনে অলডারম্যান পদে ইস্তফা দিলেন। ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ কাজ করেছিলেন— সেটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। তবে এর পর দু মাস কাল তিনি এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেদিক দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফল পাওয়া যায় নি। ডিসেম্বর মাসে তিনি বিলাতের গোল টেবিল বৈঠক থেকে সদ্যপ্রত্যাগত গান্ধীজির সঙ্গে পরা-মর্শ করার জন্য বোম্বাই রওনা হলেন। এ সময় সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সফরের সঙ্গী হয়ে অনেকদিন দেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। শোনা যায় সুভাষচন্দ্র তখন দেশের সম্মুখে যে Fighting Programme অর্থাৎ সংগ্রামের কার্যক্রম উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন— দেশ তার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলে গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রকে স্বমতে আনবার জন্যই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে সুভাষচন্দ্র অবিরাম সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন বলে গান্ধীজির সঙ্গে কোনো আপসই তখন কেন, কোনো সময়েই হয় নি।

জাতীয় পতাকা উৎসব

১০ আশ্বিন ১৩৩৮ রবিবার ইংরাজি ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। ইতিপূর্বে বাংলাদেশে —বাংলাদেশে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে— জাতীয় পতাকা উৎসব পৃথকভাবে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি— এই উৎসব সর্বপ্রথম বলে যেমন আমাদের মনে রাখা উচিত তেমনি এটাও আমরা যেন ভুলে না যাই যে এ যাবৎ একাধিকবার এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকলেও নিয়মিতভাবে একটি বিশিষ্ট দিনে আমরা যে এইপ্রকার উৎসব পালন করি না সেটা আমাদের ত্রুটিই বলতে হবে।

যাই হোক, উক্ত দিনে কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কের সুপ্রশস্ত ময়দানে মাদ্রাজের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বুলুভাই শম্ভোমূর্তি এই উৎসবে পৌরোহিত্য

করেন এবং এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন প্রধানত ছাত্রগণ এবং তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বর্তমান "কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ"-এর অন্যতম সম্পাদক শ্রীশচীন মিত্র, এবং তাঁর স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রায় দুইশত চারণ-চারণী দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ব্যান্ড প্রভৃতি বহু বাদ্যযন্ত্রের সমবায়ে আমার নিম্নোদ্ধৃত জাতীয় সংগীতটি গেয়েছিলেন :—

যারা যুগ যুগ ধরি তুলিয়াছে ভরি' মায়ের পূজার ডালা
অস্থি-সমিধে হোমানল জ্বালি' ভোলে কলঙ্ক জ্বালা,
প্রাণ বলি দিতে পূজার বেদীতে যারা সদা আগুয়ান
ত্রিবর্ণ ধ্বজা তাদেরি গর্ব ভারতের সম্মান।
তাদেরি চরণ করিয়া স্মরণ ভরা দুর্যোগ মাথে
দুর্গম পথে ছুটে চলে আয় মুক্তি-নিশান হাতে।
ঊর্ধ্বে তুলিয়া বৈজয়ন্তী উন্নত রাখি শির
লাঞ্ছিত এই ভারতবর্ষে দাঁড়ারে বন্দীবীর ;
আপনার গৃহ যদি কারাগার স্বদেশ বন্দীশালা
জীবন-শিখায় বন্দিনী মার আরতির দীপ জ্বালা ;
দাঁড়া দেখি তোরা মানুষের মতো অবনত মাথা তুলি
পাপের ভারে যে বাসুকীর ফণা গর্জিয়া ওঠে দুলি'
নবজীবনের নবীন সৃষ্টি হোক তারি আয়োজন
অরুণোদয়ের উজ্জ্বল পথে জয়-যাত্রার পণ।

এই গানটির সুরসংযোগ করেছিলেন বিদ্রোহী কবি বন্ধুবর নজরুল ইসলাম এবং গেয়েছিলেন— বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুরশিল্পীগণ। তাঁদের মধ্যে —উমাপদ ভট্টাচার্য (স্বর্গীয়), সুরসাগর হিমাংশু দত্ত (স্বর্গীয়), অনিল বাগচী, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, হরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিকুমার মজুমদার, বিনয় ঘোষ, অমলেন্দু ঘোষাল, সুধীর দত্ত, হরিদাস গোস্বামী, অনাদি দস্তিদার, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আব্বাস উদ্দিন আহম্মদ, বিপিনবিহারী বসু, হরিপদ রায় (স্বর্গীয়), কুমুদেশ সেন এবং সুধীরা দাশগুপ্ত, অঞ্জলি সেন, পুষ্প সান্যাল, পুষ্প দে, নীলিমা দাশগুপ্ত, কমলা ভট্টাচার্য, রমলা শিকদার, মাধুরী মুখোপাধ্যায়, বীণা মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই গানখানি রাজনৈতিক সম্মেলন ও স্বদেশী প্রদর্শনীতে বহু স্থানে গীত হয়েছে। সম্প্রতি কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে জাতীয় সংগীত শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা হয়েছে— তার ভার দেওয়া হয়েছে প্রধানত সুরশিল্পী সুকৃতি সেন-এর উপর। তিনি "বন্দীবীর, বন্দীবীর, বন্দীবীর" এই কথাগুলি প্রথমে দিয়ে কলকাতায় রাজনৈতিক সভা (বিশেষত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবর্ধনা সভায়) ও প্রভাতফেরীতে এই গানখানি গাইয়েছেন শুনেছি।

জাতীয় পতাকা উৎসব সম্পর্কে এখানে যে বিবরণ দেওয়া হল— তার উদ্যোক্তা বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদের ছাত্রনেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগ ছিল এবং আমাদের দেশের ছাত্র আন্দোলনের মূলে যে সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা ও উৎসাহ ছিল এ কথা স্থানান্তরেও উল্লেখ করেছি।

আবার বন্দীজীবন

গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বাঙলাদেশে ফিরবার সময় অর্থাৎ ১৯৩২ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে কল্যাণ রেল স্টেশনে ১৮১৮ সালের তিন আইনে সুভাষচন্দ্র আবার বন্দী হলেন। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য এ সময় ভালো ছিল না। সেইজন্য গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে পরপর সিওনি, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, ভাওয়ালী স্বাস্থ্য নিবাস, ও লক্ষ্মৌ-এর বলরামপুর হাসপাতালে রাখা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র ও ভি. জে. প্যাটেল

এই-সকল স্বাস্থ্যনিবাস বা হাসপাতালে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হল না দেখে ১৯৩৩ সালে গভর্নমেন্টের মেডিক্যাল বোর্ড অর্থাৎ সরকারি ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বললেন— তাঁর ফুসফুস ও অন্ত্রে (Intestines) যক্ষ্মা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য যাকে হাসপাতালে যেতে হয়— তার গতিবিধি ও কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সবল সুস্থ মানুষের মতো— এইপ্রকার মানসিক বলের তুলনা পাওয়া দুষ্কর। যাই হোক, গভর্নমেন্ট তাঁকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠালেন। ৮ মার্চ তারিখে তিনি ভিয়েনাতে পৌঁছে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে আশ্রয় পেলেন। এই সময় তিনি বিঠলভাই প্যাটেলের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে আসেন।

প্যাটেলের অসুস্থতার সময় সুভাষচন্দ্র নিজে রোগী হয়েও তাঁর সেবা-

শুশ্রূষা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্যাটেলের স্নেহপ্রীতির কথা আজ সকলের কাছে সুবিদিত। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর উইলে সুভাষচন্দ্রের নামে এক লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন— সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছামত দেশের কাজে খরচ করবার জন্য। তার ফলাফলও যে কী হয়েছে তা দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত নয়।

১৯৩৪ সালে লন্ডনের ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সমিতি (Indian Republic Association) কর্তৃক আহূত রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য সুভাষচন্দ্র আমন্ত্রণ পেলেন কিন্তু বিলাত, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকায় যাওয়া তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল বলে তিনি ছাড়পত্র পেলেন না। এই সময় তিনি এবং স্বর্গীয় ভি. জে. প্যাটেল ভারতে আইন-অমান্য মুলতুবি রাখার বিরুদ্ধে একযোগে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ

ডিসেম্বর মাসে তাঁর পিতার সংকট পীড়ার কথা শুনে তিনি গভর্নমেন্টের বিনা অনুমতিতেই ইউরোপ ত্যাগ করে ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হন। ৩ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র করাচী পেঁছে শুনলেন আগের দিন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। দমদম বিমানঘাঁটিতে পেঁছবামাত্র তাঁর প্রতি অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হল— সেইসংগে এ আদেশও দেওয়া হল যে সাতদিনের মধ্যে তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু পরে তাঁকে পিতৃশ্রাদ্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই সময় লন্ডনের কোনো পুস্তক-বিক্রেতা তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক 'ভারতীয় সংগ্রাম' (*Indian Struggle*) প্রকাশ করেন কিন্তু ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সে পুস্তকখানির প্রচার ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ কিনা জানি না।

পুনরায় ইউরোপ যাত্রা

৮ জানুয়ারি ১৯৩৫ চিকিৎসার জন্য আবার সুভাষচন্দ্র ইউরোপে যাত্রা করলেন। ভিয়েনাতে বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডা. ডেনিয়াল-কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের অস্ত্রোপচার হল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অসুস্থ অবস্থার মধ্যেই তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আর-একখানি বই লিখতে আরম্ভ করেন— কিন্তু ডাক্তার তাঁকে কঠোর পরিশ্রম থেকে বিরত থাকতে বলায় সে বইখানি লেখার কাজ তখন আর শেষ হয় না। ৬ জুন তিনি ভিয়েনাতে মধ্য-ইউরোপীয় ভারতীয় সমিতির

(Indian Central European Society) যে সম্মেলন বসে তাতে যোগদান করেন। ডিসেম্বর মাসে রোমে সিনর মুসোলিনী যে এশিয়াবাসী ছাত্র সম্মেলনের (Asiatic Students Conference) উদ্বোধন করেন— সুভাষচন্দ্র তাতেও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি রোমের গভর্নর-কর্তৃক বিশেষভাবে সংবর্ধিত হন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের তৃতীয় মহাসম্মেলনেও সভাপতিত্ব করেছিলেন।

৩ আইনে আবার বন্দী

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমে সুভাষচন্দ্র আয়র্ল্যান্ডে যান। ৮ এপ্রিল "S.S. Comte Verde" নামক জাহাজে বোম্বাই পেঁছিবার সংগে সংগে তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার করে আর্থার রোড জেলে আনা হয়। ১৩ এপ্রিলে তাঁকে জারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২০ মে কারশিয়াং-এ তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৭ ডিসেম্বর তারিখে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় এনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

বিনা শর্তে মুক্তিলাভ

১৭ মার্চ ১৯৩৭ তারিখে সুভাষচন্দ্রকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি মাসাধিককাল স্বর্গীয় ডা. নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীন থাকেন। ৬ এপ্রিল তারিখে সুভাষচন্দ্রকে কলিকাতায় নাগরিক সংবর্ধনায় সংবর্ধিত করা হয়। ২৫ এপ্রিল তিনি পাঞ্জাবে ডালহৌসিতে বায়ু পরিবর্তনে যান এবং ডা. এন. আর. ধরমবীরের চিকিৎসাধীনে থাকেন। সকল চিন্তার মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধেও যে তিনি চিন্তা করতেন— পরিশিষ্টে মুদ্রিত চিঠিখানি থেকে সেটা বেশ বুঝতে পারা যায়। এখানে ছ' মাস থাকার পর তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন।

আবার ইউরোপ যাত্রা

হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত

১৮ নভেম্বর তিনি বিমানযোগে আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ডে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। ১৮ জানুয়ারি তিনি হরিপুরা-কংগ্রেসের (একপঞ্চাশৎ অধিবেশন) সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই

মাসেই ডি ভ্যালেরার সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। লন্ডন থেকে তিনি ২৪ জানুয়ারি কলিকাতায় ফিরে আসেন এবং ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্য হরিপুরা যাত্রা করেন— কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি। এরপর কয়েক মাসের খবরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা আমার জানা নেই।

শান্তিনিকেতন যাত্রা

১৯৩৯ সালের ২১ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনে কবিগুরু সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধিত করেন। 'দেশনায়ক'-শীর্ষক অভিনন্দনে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ত্রিপুরী-কংগ্রেস

২৯ জানুয়ারি তিনি কংগ্রেসের প্রধান কর্তৃপক্ষদের প্রকাশ্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র পুনরায় ত্রিপুরী-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু এতে গান্ধীজির সমর্থন ছিল না বলে ২২ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির (Congress Working Committee) অধিকাংশ সদস্য ইস্তফা পত্র দাখিল করেন এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি তাঁদের ইস্তফাপত্র মঞ্জুর হয়। সে সময় সুভাষচন্দ্র ঘুষঘুষে জ্বরে ভুগছিলেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই জ্বরকে 'Political Fever' বা রাজনৈতিক জ্বর বলে বক্রোক্তি করেন। তারই উত্তরে সুভাষচন্দ্র 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়— জামডোবা থেকে—'My Strange Illness' ("আমার আশ্চর্য পীড়া") নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সে সময় মহাত্মা গান্ধীর সংগে যে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর পত্র-বিনিময় হয়েছিল কিছু-দিন পরে সেগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

৫ মার্চ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী যাত্রা করেন এবং অসুস্থ অবস্থায় একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ পাঠ করে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। যে National Planning Committee-তে আজ পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতিত্ব করছেন— তার পরিকল্পনা ও প্রস্তাব ত্রিপুরী-কংগ্রেসের 'অবাঞ্ছিত' সভাপতি বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রই এই অধিবেশনে পেশ করেছিলেন।

বিপ্লবী জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়

[১৯৩৯-৪১]

রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতির (All India Congress Committee) কলিকাতা অধিবেশনের সময় গান্ধীজি সোদপুর খাদি আশ্রমে ছিলেন। কয়েকদিনব্যাপী গান্ধীজির সঙ্গে আপস-মীমাংসার জন্য অক্লান্ত চেষ্টায় বিফলমনোরথ হয়ে সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন এবং তাঁর স্থানে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ নির্বাচিত হন। ইস্তফা দেবার সময় সুভাষচন্দ্র যে লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন— সেটি অতি সংক্ষিপ্ত। আমরা এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলাম। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে যে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ পেতে থাকে তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং স্বকর্ণে শুনেছি। সেদিন সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই সভাগৃহে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নি। শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র নিজেদের গাড়িতে করে নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে স্বগৃহে নিয়ে যান। তবে এ কথাও ঠিক যে সেদিনের গণবিক্ষোভের ফলে সভাগৃহের বাহিরে অনেক নেতাকে অপদস্থ হতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এবং কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের সুভাষচন্দ্রের সহিত অসহযোগিতাই এইপ্রকার শোচনীয় ঘটনার জন্য দায়ী।

"ফরওয়ার্ড" ব্লক সংগঠন

এর পরই তিনি কংগ্রেসের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন করেন। তিনি কংগ্রেসের সভ্যদিগকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির (All India Congress Committee) বোম্বাই অধিবেশনে ২৪ জুন তারিখে গৃহীত দুইটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য পরামর্শ দেন। প্রথম প্রস্তাবটি ছিল-- প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহিত কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সম্পর্কে ; দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার পূর্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে আবশ্যিক অনুমতিগ্রহণ সম্পর্কে। এতে ফল হল এই যে ১৯৩৯ সালের ১১ আগস্ট তারিখে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (Congress Working Committee) এই নির্দেশ (Ban) ঘোষণা করলেন যে, যে-সকল কংগ্রেস কমিটির মনোনয়নের ক্ষমতা আছে —তিন বৎসর পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র সেই-সকল কমিটির কোনো পদে অধিষ্ঠিত

থাকতে পারবেন না। এই দিনের একটি ঘটনা— অর্থাৎ যেদিন সুভাষচন্দ্রের সংগে লেখকের শেষবার সাক্ষাৎ হয়— পরে বলা হয়েছে।

তিনি এই বছরের অক্টোবর মাসে গৌহাটিতে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন এবং নাগপুরে আহূত সাম্রাজ্যবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১ নভেম্বর নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অভিনন্দিত

গত এপ্রিল মাসে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির কলিকাতায় আহূত সভায় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেবার ঘটনাটি মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। সেইজন্য তিনি (১৯৩৯) মে মাসে 'দেশনায়ক'-শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ বাণী সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে রচনা করেন— কিন্তু বাণীটি মুদ্রিত হলেও তখন প্রকাশিত হয় নি। সেই অপূর্ব সুভাষ-প্রশস্তিটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হল।

'মহাজাতি সদন' প্রতিষ্ঠা

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় কংগ্রেস-গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। অনতিকালমধ্যেই এই গৃহের 'মহাজাতি সদন' নামকরণ ক'রে রবীন্দ্রনাথ তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাজাতি সদনের প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করে তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন। আমি ও বন্ধুবর সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী (কংগ্রেসকর্মী ও বঙ্গীয় আইন সভার প্রাক্তন ডেপুটি-স্পিকার) এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমন্ত্রণলিপি দ্বারা সভার আহ্বান করা হলেও বাহিরে অসম্ভব জনতা হয়। ফলে দ্বাররক্ষী শিখ স্বেচ্ছাসেবকগণ বিব্রত হয়ে পড়েন। আমরা দেখলাম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে (স্বর্গীয়) একরকম 'পাঁজাকোলা' করে নিয়ে এসে সভাগৃহে উপস্থিত করা হল— তখন রবীন্দ্রনাথ সভায় পৌঁছে গেছেন। তার পরই জনতার চাপে বহির্দ্বার ভাঙবার উপক্রম হতেই, সুভাষচন্দ্র ডায়াস থেকে নেমে দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে সমবেত

জনতাকে উদ্দেশ করে দু-তিন মিনিটের জন্যে কী বলতেই সমস্ত গোলমাল নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং যেটুকু স্থান তখনো সভাগৃহে ছিল, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পূর্ণ করে দিলেন ও চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেতেই সভার কাজ আরম্ভ হল। আমার পাশেই জনৈক উগ্র কংগ্রেসীকে বলতে শুনলাম — "কংগ্রেস ছেড়েও সুভাষবাবুর প্রতিপত্তি কমে নি দেখছি।"

রামগড়ে আপস-বিরোধী সম্মেলন

ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র গভর্নমেন্টের শাসননীতির প্রতিবাদকল্পে নানা-স্থানে সভা আহ্বান ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। মার্চ মাসে তিনি যুক্তপ্রদেশে ব্যাপক সফরের জন্য যাত্রা করেন এবং সেই মাসের ১৮ তারিখে 'অফিসিয়াল' কংগ্রেসের পাশাপাশি রামগড়ে উপস্থিত হয়ে আপস-বিরোধী কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। সে সময় বহুসহস্র কংগ্রেসকর্মী এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে সেখানে যে শোভাযাত্রা হয়েছিল সেটা কংগ্রেসের ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। যার ফলে চিরাচরিত প্রথা পরিহার করে আদি কংগ্রেসের সভাপতির শোভাযাত্রা বাহির করাই হল না।

বাঙলাদেশে কর্মপ্রচেষ্টা

এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের 'অল্ডারম্যান' নির্বাচিত হয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে কর্পোরেশনের কাজকর্মের ব্যাপারে মিলনচুক্তিতে আবদ্ধ হন। মে মাসে ২৪ পরগনায় যুব সম্মেলনে বক্তৃতা দেন এবং সেই মাসেই ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন, জুনমাসে নাগপুরে আহূত নিখিলভারত ফরওয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

২০ জুন তারিখে তিনি ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এবং ২২ জুন তারিখে মি. জিন্না ও শ্রীযুক্ত সাভারকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর ২৯ জুন তারিখে তিনি ইতিহাসের কলঙ্ক অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা নিদর্শন 'হলওয়েল মনুমেন্ট' অপসারণের আন্দোলন শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কৃতকার্য হন। এই প্রচেষ্টায় শ্রীমতী লীলা রায় ও শ্রী যুক্ত

অনিল রায় তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। বাঙলার মহানগরী কলিকাতার বুকের উপর থেকে জাতির মিথ্যা কলঙ্কের চিহ্ন দূর করে সুভাষচন্দ্র হিন্দু-মুসলমানের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস সমিতির (All India Congress Committee) অধিবেশনে সুভাষবাবু রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঠিক এমনি সময় একদিন সুভাষচন্দ্রের সংগে আমার শেষবার সাক্ষাৎ হয়, ১৯৩৯ সালের ১১ আগস্ট তারিখে, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে। একদিক দিয়ে এই দিনটি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, ঐ দিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের উপর তিন বৎসরের জন্য নিষেধাজ্ঞা (Ban) প্রচারিত হয়। পূর্বেই এ-কথার উল্লেখ করেছি। দুই-দুইবার যিনি ভোটাধিক্যে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হলেন, তিনিই আবার মতানৈক্যের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন—ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটে নি। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁর পূর্বেকার সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, একমাত্র তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মধারার পার্থক্যের জন্য। যে কিরণশংকরের সংগে তাঁর অন্তরংগতার কথা সকলের কাছে সুবিদিত, তাঁর সংগেও অনেক আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এমন-কি অভিমান ক'রে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কাছে সুভাষচন্দ্র দুঃখপ্রকাশও করেছেন, কিন্তু মিটমাট হয় নি; অথচ এমন একদিন ছিল যখন কিরণবাবুর বাড়ি থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে, লালবাজারে টেলিফোন করে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, বাড়িতে সে খবর পেঁচেছে কিরণবাবুর মারফতে।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, গ্রেপ্তারের কথা জানতে পেরে কংগ্রেসের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে নিজের অনুপস্থিতির সময় তাঁর করণীয় কাজ কিভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হবে তার আলোচনা করতে সেই সংকট মুহূর্তে সুভাষবাবু এলেন তাঁর প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু কিরণশংকরের কাছে—কিরণবাবুর প্রতি এতখানি ছিল তাঁর নির্ভরতা।

কিন্তু ইদানীং মতের এতই পার্থক্য হয়েছিল যে সেই কিরণবাবুর সঙ্গে,

অর্থাৎ 'অফিসিয়াল' কংগ্রেসের সংগে তাঁর কোনো বোঝাপড়া হ'ল না। বাইরে থেকে এ-কথা শুনে আমরা খুব দুঃখিত হয়েছিলাম। আমাদের বিশ্বাস কিরণবাবুর সংগে অন্তরের দিক থেকে কোনো ব্যবধানের সৃষ্টি হয় নি বলেই তাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্রের অভিমান এতখানি গভীর হয়ে পড়েছিল। আমরা জানি এই মনোমালিন্যের আগুনে কয়েকজন তথাকথিত বন্ধু ও দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। বাঙলা কংগ্রেসের ধারক, বাহক ও নায়ক কিরণশংকরের সংগে সামনাসামনি কথাবার্তা কয়ে বোঝাপড়া করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও সুভাষচন্দ্রের স্বভাবজাত কুণ্ঠাই পুনর্মিলনের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। সেই বিষাক্ত আবহাওয়ায় সুভাষচন্দ্র হাঁফিয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু উপায় ছিল না। মত ও আদর্শের বৈপরীত্যে যে রকম বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়েছিল, এও অনেকটা সেই রকম। সুভাষচন্দ্র ও কিরণশংকরের মধ্যে যে মিটমাট হল না, এটা বাঙলাদেশের পরম দুর্ভাগ্য। কিন্তু ঘটনাপরম্পরার দিক থেকে মিটমাটের কোনো উপায় ছিল না। তবুও ভাবতাম হয়তো একদিন অসম্ভবও সম্ভব হবে।

সুভাষচন্দ্র কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন ব'লে জানতাম। যতীন্দ্রমোহনও সুভাষচন্দ্রকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। এই মনোভাব থেকেই যতীন্দ্রমোহন আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—"কিরণবাবু ও সুভাষের মধ্যে একটা মিটমাট হয় না?" আমি বললাম, "এটা তো ঝগড়া নয়, গৃহবিবাদ নয়, স্বার্থ নিয়ে মনোমালিন্য নয় যে মিটমাট হবে—রাজনৈতিক মতের মিল তখনই হতে পারে, যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হয়; অর্থাৎ যেমন চিত্তরঞ্জন কংগ্রেস থেকে দেশবাসীকে স্বরাজ্যপার্টির আদর্শ ও কার্যক্রমকে স্বীকার ও অনুসরণ করতে প্রবুদ্ধ করেছিলেন। সুভাষবাবু যদি তাঁর মতে কিরণবাবুকে আনতে পারেন বা কিরণবাবু সুভাষবাবুকে তাঁর মতে লওয়াতে পারেন, তা হলে এই অবস্থার অবশ্যই অবসান হতে পারে।" যতীন্দ্রমোহন বললেন, "দেখ, তুমি common friend, তুমি এদের একটা দিন একসংগে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করো— তুমিই পারবে।" আমি নিজে যদিও একেবারেই আশান্বিত ছিলাম না তবুও যতীনদার আগ্রহে রাজী হলাম। কিরণবাবুর সংগে এ-বিষয়ে কথা হতেই তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, "সব সময়েই রাজী আছি— যেখানে হোক দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হতে পারে। আপনার বাড়িতেই করুন-না, শুধু একটু চায়ের

ব্যবস্থা রাখবেন। কিন্তু আপনি শুনে দুঃখিত হবেন, ফলাফল সম্বন্ধে আমার একেবারেই আশা নেই। সুভাষবাবু অন্তরে রাজী হলেও, কার্যক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেওয়ার মতো লোকের অভাব নাই।" ঠিক এই সময়ে যতীন্দ্রমোহন তাঁর বাড়িতে সুভাষবাবুকে এক ঘরোয়া সান্ধ্য সভায় নিমন্ত্রণ করে আনলেন। আমরা অর্থাৎ আমি, কবি কালিদাস রায়, কবি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডা. রমাপ্রসাদ চন্দ, সুব্রত রায়চৌধুরী, (ইনি এখন বিলাতে) রায়বাহাদুর অঘোরনাথ অধিকারী প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হলাম। অনেকদিন সুভাষবাবুর সংগে দেখাসাক্ষাৎ নাই— অনেকদিন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করায় সুযোগ ঘটে নি। কয়েকদিন আগে তাঁকে দেখলাম— দেশপ্রিয় পার্কের সভায় বক্তৃতা করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে অন্তরালেই রেখে চলেছি, তাই দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ হয় না। কথাবার্তা হয়েছিল কিছুদিন আগে আশুতোষ কলেজে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিসভায়। সভায় কবিতা পাঠের পর তিনি আমাকে নিজের কাছে ডেকে বসালেন। সভার কাজের ফাঁকে ফাঁকে যা দু-একটি কথা। সেও শরৎচন্দ্র সম্পর্কে। সেইজন্য সুভাষবাবুকে ঘরোয়া বৈঠকে কাছে পাওয়া যাবে এবং কথা-বার্তা হবে— এটা আমার পক্ষে বিশেষ প্রলোভনের বিষয় ছিল। তাই যতীন-দার বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

সেইদিনই সুভাষবাবুর একটি ছোটো ভাই মারা গেছেন, এবং কলিকাতায় জোর গুজব যে আজই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির (Congress Working Committee) অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর্ব শেষ হবে।

সন্ধ্যার সময় সুভাষচন্দ্রের আসার কথা— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সুভাষ-বাবু এলেন না, এটা তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক। যতীনদা বললেন, "কথা যখন দিয়েছে, তখন আসবেই।" লোক পাঠিয়ে জানা গেল প্রতি মুহূর্তেই সুভাষ-চন্দ্র টেলিগ্রামের অপেক্ষা করছেন— কংগ্রেস থেকে তাঁর বহিষ্কারের পাকা খবরটার জন্যে।

প্রায় ৯টার সময় নগ্নপদে সুভাষচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন এবং জানা গেল —টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই তিনি সরাসরি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেদিন ১৩৩৯ সালের ১১ আগস্ট— সুভাষচন্দ্রের উপর কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা (Ban) জারি করেছেন— সেই টেলিগ্রাম সুভাষচন্দ্র রাত্রি ৮টার সময় পেয়েছেন— সেই-

দিনই তাঁর ভাইটিও মারা গেছে— তবুও কথা দিয়েছেন বলে সেদিনকার সেই সান্ধ্যসভায় তিনি উপস্থিত হলেন এমনভাবে— যেন কিছুই হয় নি।

আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হল। রমাপ্রসাদ চন্দ বললেন, "কংগ্রেসের এই নির্দেশে (Ban) সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভালো হল, না, মন্দ হল।" কেউ কোনো কথা বলেন না— সুভাষচন্দ্রও না। রমাপ্রসাদবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, "সাবিত্রীবাবু, আপনি কী মনে করেন?" আমি ইতস্তত না করে উত্তর দিলাম, "ভালোই হয়েছে। সুভাষবাবুর এখন হাত পা খোলা, নিজের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে তিনি নিজের আদর্শ অনুসারে কাজ করতে পারবেন।"

"সুভাষ, তুমি নিজে কী মনে কর?" যতীন্দ্রমোহনের এ প্রশ্নের উত্তরে সুভাষচন্দ্র একটু মৃদু হেসে গম্ভীরভাবে বললেন, "সাবিত্রীবাবু ঠিকই বলেছেন। আমি মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, কারণ আমার পক্ষে এইভাবে কংগ্রেসের 'হাইকমান্ড'দের বর্তমান আদর্শ ও মতবাদের সঙ্গে লড়াই করা মানে অনর্থক শক্তি ক্ষয়, তার চেয়ে আমি নিজের মতো কাজ করে যাব।" অন্যান্য কথার পর সুভাষচন্দ্রকে কালিদাস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্দেমাতরম' গানটি আপনার সভাপতিত্বেই আংশিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে, এতে অবশ্যই আপনার সম্মতি ছিল?" সুভাষবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমার সম্মতি না থাকলে আমি নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করতাম। শুধু বাঙলার দিক থেকে বা বিশেষ কোনো ধর্ম বা জাতির দিক থেকে কোনো বিষয়ের বিচার কংগ্রেস করতে পারে না, আজ সমস্ত সমস্যাকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে। সেইজন্য সর্ববাদীসম্মতভাবে যে অংশটুকু গৃহীত হয়েছে তাতে 'বন্দেমাতরম' সংগীতের মর্যাদা কোনোমতে ক্ষুণ্ণ হয় নি বলেই আমি মনে করি।"

ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, অধিক রাত্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছি, ভাবছি— আজ সুভাষবাবুর কাছ থেকে কত দূরে সরে গিয়েছি, ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টিতে একদিন নিজের সামান্য পাথেয় নিয়েও তাঁর পাশে থেকে কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। অটল বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভরতা, বন্ধু-প্রীতি ও সহৃদয়তায় তিনি আমাকে একদিন নিজের একান্ত কাছেই টেনে নিয়েছিলেন। আজ সেই ভাগ্যের বক্রদৃষ্টিতে নৃশংস সংসারের অক্টোপাসে আজ আমি বন্দী— তবু— তবু সে-সব দিনের স্মৃতিগুলি কত মধুর, কত সুন্দর। খানিকটা দূরে এসেছি— পিছনে এসে মণি (যতীনবাবুর বড়ো ছেলে) আমায় ডাকলে। বললে, "সুভাষবাবু আপনাকে খুঁজছিলেন— আপনি কখন কাউকে না বলে

চলে এলেন ?" পিছন ফিরে দেখি সুভাষবাবু মোটরে বসে আছেন, আমাকে দেখে বললেন, "চলুন একসঙ্গে কথা কইতে কইতে যাই।" গাড়িতে উঠে বসলাম। সুভাষবাবু বললেন, "অনেকদিন দেখাশুনা নাই, একদিন আসুন-না ?" আমি সেই ফাঁকে যতীনদার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলাম— তিনি বললেন, "আচ্ছা— মি. কামাথ প্রভৃতি কয়েকজন বিশেষ প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছেন— তাঁদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজ আমার পরশু শেষ হবে। একদিন একটু ফোন করে আসবেন।" বাড়ির কাছে নামিয়ে দিয়ে গেলেন, বললেন, "কবিকুঞ্জ দেখতে আসব একদিন।" আমি বললাম, "সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।" দু-তিন দিনের মধ্যে 'ফোন' করি নি, তবে বিশদভাবে সবকথা লিখে চিঠি পাঠিয়েছিলাম সুভাষবাবুর কাছে। সুভাষবাবুর কাছ থেকে চিঠির জবাব পাই নি, তিনি কোনো একজন বন্ধুর মারফতে আমাকে জানিয়েছিলেন দেখা হলে এ-সব কথার আলোচনা করবেন। সময়ের দ্রুত গতি ও অবস্থার ততোধিক দ্রুত পরিবর্তনে সে সুযোগ ঘটে নি— সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সেই আমার শেষবারের সাক্ষাৎ।

ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার

১৯৪০ সালের ২ জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল। সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের পরই 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা রায় সুভাষচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন।

৩০ আগস্ট তারিখে মহম্মদ আলি পার্কে প্রদত্ত বক্তৃতা ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কাগজে প্রকাশিত "The day of Reckoning" (বুঝাপড়ার দিন) প্রবন্ধের জন্য সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আলিপুর ফৌজদারি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। জেলে থাকার সময়েই ২৮ অক্টোবর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৯ নভেম্বর তিনি বন্দী অবস্থায় প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন এবং ৫ ডিসেম্বর স্বাস্থ্যহানির জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

বিপ্লবী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়

[১৯৪১]

অন্তর্ধানের আয়োজন

মুক্তি পাওয়ার অল্পদিন পরেই সুভাষচন্দ্র রুদ্ধকক্ষে আত্মসমাহিত অবস্থায় থাকেন। তিনি কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করেন না; সামান্য আহার্যবস্তু বাড়ির যে-কেহ তাঁর ঘরে দিয়ে আসে— এই কথা আমরা শুনেছি। কাজেই তিনি কবে কী উদ্দেশ্যে এবং কোন্ সময়ে যে গৃহত্যাগ করে চলে যান এ-কথা কারো জানবার সুযোগ ছিল না বলেই আমরা জানতাম। তাঁর এই প্রকার অন্তর্ধানের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক বা রাজনৈতিক সে সম্বন্ধে আমরা গবেষণা করেছি, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছু করতে পারি নি; এমন-কি তাঁর মধ্যম ভ্রাতা শরৎচন্দ্র, যাঁর সঙ্গে তাঁর সমগ্র পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল অত্যন্ত গভীর, তিনিও মহাত্মাজীর টেলিগ্রামের উত্তরে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তাতে তিনি '**Renunciation**' (সংসার ত্যাগ) বলেই ঘোষণা করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান

যা হোক, ১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি অর্থাৎ অন্তর্ধান হওয়ার সাত-আট দিন পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে সুভাষচন্দ্র তাঁদের কলিকাতার ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়ি থেকে রহস্যজনক ভাবে ১৭ কি ১৮ তারিখে অন্তর্ধান করেছেন। সে রহস্য সংবাদপত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত দুটি সংবাদে কিছুটা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

"কলিকাতা, ৯ জুন: ভারতবর্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের কাহিনী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অমিয়নাথ বসু অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট একটি বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ১৮ জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবন ত্যাগ করিয়া একখানি মোটরগাড়িযোগে কলিকাতা হইতে কয়েকশত মাইল দূরে একটি স্টেশনে যাইয়া দিল্লী মেলে আরোহণ করেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু মোটর-গাড়িখানি চালাইয়া লইয়া গিয়াছেন এবং তিনিই বসুপরিবারের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর ভারতত্যাগ সম্পর্কীয় সমস্ত পরিকল্পনাই জানিতেন।" (এ. পি.)

কলিকাতা ১০ জুন: ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের

উত্তরে শ্রীশিশিরকুমার বসু বলেন, "নেতাজীর নিজমুখ হইতে তাঁহার ভারত-ত্যাগের চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনিবার জন্য ভারতের সকলেই আকুল আগ্রহ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সেই চাঞ্চল্যকর দিনটির জন্য আমাদের ধৈর্য রক্ষা করিতেই হইবে।"

নেতাজীর ভারতত্যাগের ব্যাপারে শিশিরকুমার বসু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এতৎসম্পর্কে তিনি বলেন, "অনশন অবলম্বনের পর নেতাজীকে মুক্তি দেওয়া হয়, মুক্তি লাভের পর হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে। ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত্রি ১-২৫ মিনিটে আমরা একখানি মোটর যোগে সত্যসত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই, আমি ও নেতাজী মাত্র এই দুই জনেই ঐ গাড়ির আরোহী; উজ্জ্বল চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রিতে আমাদের এই দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু হইল। বাড়ির বেশিরভাগ লোকই তখন নিদ্রিত। নেতাজী পশ্চিমা মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেস, বিছানা ও একটি অ্যাটাচিকেস সংগে লইয়াছিলেন। এলগিন রোড হইতে যাত্রা শুরু করিয়া কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্রান্ড ট্রাংক রোড ধরিয়া তীব্রবেগে আমাদের গাড়ি চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যুষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম। সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হইল; অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পেঁীছিলাম, এইদিন ১৯৪১ সালের ১৮ জানুয়ারি; শেষরাত্রিতে নেতাজী ট্রেনে উত্তরভারত অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম। বাঙলার সীমান্ত হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় নেতাজীর ভারত ত্যাগের পরিকল্পনায় আমার কর্তব্য কার্যতঃ শেষ হইল। আমি বিদায় লইলাম, "তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও"— ইহাই ছিল নেতাজীর শেষ কথা।"— (ইউ. পি.)

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর বহু কাহিনীই আমরা শুনেছি। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের দরুন ১৯৪১-১৯৪৫ পর্যন্ত কোনো আসল খবর পাওয়ার সুযোগ ছিল না। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদহিন্দ ফৌজের বিচারব্যপদেশে সুভাষচন্দ্রের পূর্বএশিয়ার কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক খবর প্রথম জানতে পারা যায়। অন্তর্ধান রহস্যের প্রাথমিক উদ্‌ঘাটন হিসাবে উপরের বিবৃতি দুইটি আপাতত আমাদের এতদিনকার কৌতূহল অনেকটা প্রশমিত করবে।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আমাদের এবং বোধ করি সারা পৃথিবীর দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের নানারকমের জল্পনাকল্পনা ও সন্দেহকে কিছুটা প্রশমিত এবং কিছুটা নানা কারণে আরো উদ্দীপ্ত করে দিল— ১৯৪৬ সালের মার্চমাসে দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকায় (*Hindusthan Times*) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত উত্তমচাঁদের লেখা ; ভারতবর্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হওয়ার অতি চমকপ্রদ কাহিনী। কাবুলে উত্তমচাঁদের দোকান ছিল, তিনিই যে কাবুলে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অন্তর্ধানের গোপন ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর কিছুটা হাত ছিল এ থেকে সেটা বুঝতে পারা যায়। উত্তমচাঁদ কাবুলেই গ্রেপ্তার হয়ে ভারতবর্ষের কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী থাকেন এবং সেই সময়েই তিনি এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন। দীর্ঘ কাহিনীটি সংক্ষেপে এই :—

১৯৪১ সালের শীতের রাত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শান্ত করে দিয়েছেন ভেবে আরামে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন, তখন দীর্ঘ শ্মশ্রু সুন্দর চেহারার একটি লোক, চশমার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের জ্যোতি, এলগিন রোডের একটি দ্বিতল বাড়ির নির্জন কক্ষে আত্মনির্বাসিত অবস্থায় থেকে তাদের বোকা বানিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সে গৃহের চারিদিকে শিকারের সন্ধানে সজাগ পাহারায় মোতায়েন ছিল কয়েকজন ভদ্রবেশী সরকারি গুপ্তচর পুলিস।

তারা তাদের কবল থেকে সুভাষচন্দ্রকে পালিয়ে যেতে দেবে না— এই ছিল তাদের পণ। কিন্তু তাদের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে একদিন রাত্রে তাদের শিকার পালিয়ে গেল। আপাদমস্তক মৌলভীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে হেঁটে এসে তিনি মোটরে উঠলেন। নক্ষত্রবেগে গাড়িখানি ছুটে চলে গেল কোনো দূরবর্তী স্টেশনের দিকে। তার পরদিন সকালে দেখা গেল মৌলভীসাহেব একজন শিখ ভদ্রলোকের সামনাসামনি দ্রুতগামী একখানি রেলগাড়ির উচ্চ শ্রেণীর কামরায় বসে আছেন। সর্বজনপরিচিত ছদ্মবেশী ভদ্রলোকটিকে শিখ ভদ্রলোকটি চিনতে পারলেন না। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মৌলভীসাহেব খুব গম্ভীর গলায় বললেন যে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর লোক— নাম তাঁর জিয়াউদ্দিন। তিনি বীমার দালালি করেন, সেই কাজেই বেরিয়েছেন।

যখন লালপাগড়ি পুলিসের দল কলিকাতায় এলগিন রোডে তাদের কর্ম-

তৎপরতা দেখাতে ব্যস্ত থাকেন তখন সুভাষচন্দ্র মৌলভীর বেশে ভারতসীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দুদিনের মধ্যে তিনি পেশোয়ারে এসে পেঁছে গেলেন। সেখানে তিনি মৌলভীর শেরওয়ানী ও ফেজ্ বদলে পাঠানের পোশাক পরলেন। লক্ষ্নৌ-এর মৌলভীবেশ বদল করে হয়ে গেলেন পাঠান। তিনি এই বেশে রহমৎ খাঁ নামক একজনের সঙ্গে কাবুলের দিকে রওনা হলেন। কয়েকদিন ধরে অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁরা কাবুল নদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন।

নদী পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা পাওয়া গেল না, কতকগুলি ব্যাগ জেলেদের জালে বেঁধে, সেই অদ্ভুত ভাসমান 'বাহনে' চেপে তাঁরা নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করে ছিল নদীর পরপারে। কাবুলের উন্মুক্ত আকাশতলে, ভয়ংকর শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি কোনো যানবাহন পাওয়া যায় তারই আশায় তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই রাস্তার পাশে বড়ো বড়ো গাছের ঝোপ— তারই মধ্যে একটা কুয়া ; অবিরাম পদব্রজে এসে, পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র সেই গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন। শীতের সমাচ্ছন্ন কুয়াশার উপর নেমে এল রাত্রির গভীর অন্ধকার। সুভাষচন্দ্র ঘুমিয়ে আছেন, রহমৎ খাঁ একখানি লরীকে থামালেন, কিন্তু অসংখ্য বাক্সতে বোঝাই সেই লরী— সুভাষচন্দ্র জেগে উঠে ভাবতে লাগলেন কী করে এ লরীতে বসা যাবে। কিন্তু লরীর 'ক্লিনারের' তাড়ায় তাঁর চিন্তার অবসর রইল না, অগত্যা একটি বাক্সের উপর তিনি চড়ে বসলেন। এইভাবে তুষারাবৃত শীতের রাত্রে বিনা গরম পোশাকে তিনি একটা বাক্সের উপর কোনোরকমে বসে রইলেন। মুক্ত প্রান্তর দিয়ে লরিখানি ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে গাছের লম্বিত শাখা-প্রশাখার আঘাত লাগতে লাগল তাঁর দেহে, বার বার মাথা নিচু করে তাঁকে সে আঘাত সামলাতে হচ্ছিল। সে রাত্রির অভিজ্ঞতা অতি ভয়াবহ। দ্বিতীয় দিনে একজন আফগান গোয়েন্দা তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিলেন। রহমৎ খাঁ বললেন, তিনি তাঁর এই হাবা কালা ভাই জিয়াউদ্দিনকে সাকীসাহেব মস্‌জিদে তীর্থ করতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাবুলে জিয়াউদ্দিনেরা এমন কোনো আশার লক্ষণ দেখতে পেলেন না যাতে করে মনটা তাঁদের প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। সে শহরে তিনি ও তাঁর বন্ধুটি সম্পূর্ণ নবাগত। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে একটি ছোটো সরাইয়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। অতি নোংরা সেই বাড়িটি। তার উঠানে একপাল উট আর খচ্চর এবং তাদের ছানাগুলি বারান্দায় বাঁধা।

তাদের বাসের জন্য যে প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করা হল যেখানে দিনের আলো প্রবেশ করে না। সমস্ত দিন যেন সেখানে রাত্রির অন্ধকার বিরাজ করছে। কোনো গত্যন্তর নেই— কোনো রকমের একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই যে পাওয়া গেছে এতেই তাঁরা খুশি। কিন্তু তাদের সেই সামান্য সুখেও ব্যাঘাত ঘটল। কিছুদিনের মধ্যেই একটি আফগান কনস্টেবল তাঁদের উপর জুলুম আরম্ভ করল। ঠিক এই সময় তাঁরা উত্তমচাঁদের সন্ধান পেয়ে তাঁর সাহায্য চাইলেন। যে সময়ে তিনি কাবুলে উত্তমচাঁদের গৃহে আত্মগোপন করে আছেন, সে সময়ে দেশের মধ্যে তাঁকে নিয়ে সাড়া পড়ে গেছে। সরকারি কর্মচারীরা শশব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দৈনিক কাগজগুলিতে বড়ো বড়ো হরফে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর নিরুদ্দেশের সংবাদ প্রত্যহ ছাপা হচ্ছে। চারি দিকে জল্পনা-কল্পনার আর বিরাম নেই।

কোথায় আজ সুভাষচন্দ্র? কাবুলে? রাশিয়ায়? জাপানে? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি আজ দেশান্তরী হয়েছেন? যখন দেশের সমগ্র পরিবেশ উৎকণ্ঠার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত, তখন সেই নির্ভীক দেশভক্ত, বীর যোদ্ধা গৃহত্যাগ করে একাকী অগ্রসর হয়ে চলেছেন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রবল আকর্ষণে। স্বাধীনভারতের কল্পনা তাঁকে সমস্ত দৈহিক ক্লেশ সহ্য করবার অসীম শক্তি দিয়েছিল। কাবুলের পার্বত্য জনপদ অতিক্রম করে চলেছেন; কোথায় পাওয়া যাবে উপযুক্ত স্থান, যাকে কেন্দ্র করে তিনি সাম্রাজ্য-বাদী ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ চালাবেন।

১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ইঙ্গ-আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংস-বহ্নি জ্বলে উঠল সারা পৃথিবীতে। এরই কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন আচম্বিতে সারা ভারতবর্ষের রেডিও-শ্রোতারা শুনতে পেলে সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত মধুর কণ্ঠস্বর।

এইভাবে ভারতের সুভাষচন্দ্র, উত্তরকালের নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর বিপদ-সংকুল অভিযানের প্রথম অধ্যায় শেষ করলেন— ভাবীকালের উচ্চতম গৌরবের আসন অধিকার করবেন বলে।

শুনতে পেলাম এক বন্ধুর বাড়িতে Azad Hind Station Calling—আজাদ হিন্দ স্টেশন ডাকছে— যতদূর মনে আছে কথাগুলি এই :—

আমি সুভাষ; এতদিন আপনাদের কাছে আমার বক্তব্যবিষয় বলবার সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষে যে অপবাদই দিক, আমি জানি আপনারা তা

বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ ক'রে চলে যাব, কে কী বলে না বলে তাতে আমার কিছুমাত্র আসে যায় না। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আমেরিকার রাজনৈতিক চালবাজিতে শেষ হতে চলেছে। অক্ষশক্তির আক্রমণ থেকে নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য যদি ব্রিটেন আজ আমেরিকার দ্বারস্থ হ'তে লজ্জা না পায়— ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অপর কোনো জাতির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া আমার পক্ষে অন্যায়ও নয়, অপরাধও হ'তে পারে না। আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকবেন। আমি যেভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে ভারতবর্ষ থেকে চলে এসেছি, ঠিক তেমনি ক'রেই উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হব। প্রয়োজনের উপযুক্ত পাথেয় আপনাদের কাছে ঠিক সময়েই হাজির হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। যে সুযোগ আসছে সেটা সম্পূর্ণভাবে যাতে কাজে লাগাতে পারেন, তার জন্য নিজেরা জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন— চাই ঐক্য ও একাগ্রতা— ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমা বার্মার আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে কিন্তু বিচারক কোনো সিদ্ধান্তেই এ পর্যন্ত উপস্থিত হ'তে পারেন নি। সুভাষচন্দ্রের গৃহ নিলামে তোলা হয়েছিল, কিন্তু ক্রেতার অভাবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এখন সে গৃহ 'নেতাজী ভবন' নামে দেশের কাছে উৎসর্গিত। সেকথা পরে বলব।

ভারতসরকার-কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের সংবাদ জ্ঞাপন

১৯৪১ সালের ১০ নভেম্বর তারিখে ভারতসরকারের খাস দপ্তরের মুন্সী (সেক্রেটারি) কাউন্সিল অফ্ স্টেটের অধিবেশনে প্রকাশ করেন যে সুভাষচন্দ্র বার্লিন কিংবা রোমে আছেন। ২৭ তারিখে অক্ষশক্তির বেতার বার্তা (Axis Radio) থেকে ঘোষণা করা হয় যে সুভাষচন্দ্র জারমানিতে আছেন এবং জারমান গভর্নমেন্টের সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এদিকে ২৭ তারিখে ভারতসচিব মি. অ্যামেরি সুভাষচন্দ্রের গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো খবর জানেন না ব'লে ঘোষণা করলেন। ১৯৪২ সালের ১৯ মার্চ আচার্য কৃপালানি (কংগ্রেসের সম্পাদক) ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজে সুভাষচন্দ্র শত্রুপক্ষের কাছ থেকে টাকাকড়ি ছিনিয়ে

নিয়েছেন ব'লে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা মিথ্যা ব'লে প্রতিবাদ করলেন।

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু রটনা

২২ মার্চ রয়টারের ফরাসী সংবাদদাতার নিকট প্রাপ্ত বলে বর্ণিত একটি খবরে প্রকাশিত হল যে বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। তার পর লন্ডনের একটি খবরে প্রকাশিত হল যে এ সংবাদ অসমর্থিত এবং অবিশ্বাস্য।

ক্রীপ্‌স্ ও অ্যামেরির বিবৃতি

১ এপ্রিল (১৯৪২) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ বলেন যে সুভাষচন্দ্র অক্ষশক্তির (Axis) সঙ্গে আছেন এবং ইউরোপে থাকাকালীন তিনি সেখানকার আজাদহিন্দ ফৌজ (নং ১) গঠন করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই সেনা-সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিপ্লবী জীবনের চতুর্থ অধ্যায়

[১৯৪১-১৯৪৫]

ইউরোপে আজাদহিন্দ সংঘ

পূর্ব এশিয়ায় আজাদহিন্দ ফৌজ সংগঠন ও আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্ট স্থাপনের বিস্ময়কর ইতিহাস আমরা প্রথমত আই. এন. এ. (I.N.A.) বা ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর বিচারের সওয়াল জবাবে পাই। তা ছাড়া আজাদহিন্দ ফৌজ এবং গভর্নমেণ্টের সংগে সংশ্লিষ্ট ভারতে প্রত্যাগত অনেকের কাছ থেকে এবং সংবাদপত্র ও প্রচারপুস্তিকার মারফতেও আমরা অনেক বিষয় জানতে পেরেছি। কিন্তু সেইসংগে ইউরোপে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুভাষচন্দ্র কী-প্রকার অধ্যবসায় ও তৎপরতার সংগে কাজ করছিলেন সেটাও আমাদের জানা দরকার। সংবাদপত্রের মারফতে ইতিপূর্বে আমরা সে সম্পর্কে অনেক সংবাদ পেয়েছি এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর সৈনিকদের বিবৃতিতেও অনেক কথা প্রকাশ পেয়েছে। আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের প্রাক্তন পদস্থ 'অফিসার' বা কর্মচারী, সর্দার রামসিং রওয়াল সংবাদপত্রে যে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন— তা থেকে মোটামুটি ইউরোপে সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ সংঘ গঠনের কথা জানতে পারা যায়।

ব্রিটিশ দূতাবাসে সিনর ও-মোজোটা

১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে ভারতবর্ষ থেকে সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের কথা প্রথম প্রকাশ পায়।

কয়েকমাস পরে একদিন সকালে বার্লিন-প্রবাসী নামকরা ভারতীয়দের কাছে সিনর ও-মোজোটা (Signor Mozotta) নামক এক ব্যক্তি তাঁদের সংগলাভের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠান। যুদ্ধের আগে বার্লিনস্থ ব্রিটিশ দূত ৬ নং সোফিনস্ট্রাসে (No 6 Sophienstrasse, Berlin) অবস্থিত যে ভিলায় (আবাসে) থাকতেন সেখান থেকেই ঐ নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হয়েছিল। যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ভারতীয়গণ সেই ভিলাতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিলেন সুস্পষ্ট হিন্দুস্থানীতে, দীর্ঘবাহু সুঠামদেহ চশমাপরা অতি সুশ্রী একটি ভদ্রলোক; তাঁর ব্যক্তিত্বে অভিভূত হতে হয়। নিজেদের সকলকেই ভারতীয় দেখে অতিথিরা আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা চমৎকৃত হয়ে দেখলেন যে তাঁদের আমন্ত্রণকারী সিনর ও-মোজোটা ইতা-

লিয়ন নয়, তিনি ভারতবাসী এবং তিনি আর কেহই নন, তিনি তাঁদের প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। এতে তাঁরা ভারি খুশি হলেন। সেই ভাবাবেগের মধ্যে তাঁরা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। সুভাষচন্দ্র সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন যে তিনি ইউরোপে এসেছেন, বিদেশ থেকে ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

এই সময়ে ইজিপ্ট এবং সিরিয়ার রণক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য জারমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এই-সকল যুদ্ধবন্দীর দল যখন শুনল যে সুভাষচন্দ্র ইউরোপে এবং তিনি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সংগঠন ক'রে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে চান, তখন তারা উল্লসিত হয়ে প্রস্তাবিত 'স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী'তে যোগদান করার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

এই ভারতীয় বাহিনী গঠন করার পূর্বে ইউরোপে, বার্লিনে প্রধানকেন্দ্র স্থাপন ক'রে সুভাষচন্দ্র আজাদহিন্দ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মি. আবিদ হোসেনই ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সুভাষবাবুর সঙ্গে যোগদান করেন। ইনি পরে প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে তাঁর সঙ্গে পূর্ব এশিয়ায় যান এবং পরে আজাদহিন্দ ফৌজের লেফ্‌টেনান্ট কর্নেলের পদে উন্নীত হন।

আজাদহিন্দ সংঘের প্রথম ও প্রধানতম প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় 'রেডিও'র দ্বারা প্রচারকার্যে। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে আজাদহিন্দ সংঘের রেডিওতে সর্বপ্রথম প্রচারকার্য শুরু হয়, এবং ঐ সালেরই ২৬ জানুয়ারি তারিখে 'স্বাধীনতা দিবস' এ হাম্‌বুর্গে শিবির সংস্থাপন ক'রে স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী সংগঠিত হয়। এই বাহিনীকে সেখানে The Freise Indian Legion এই নামে অভিহিত করা হত। এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবসে জারমান ও জাপানী প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা

সুভাষচন্দ্র প্রথমে এই বাহিনীর জন্য স্বেচ্ছায় যোগদান করবে এমন চারশত জন সৈনিক চেয়েছিলেন, কিন্তু যারা প্রস্তুত হয়ে এল তাদের সংখ্যা দাঁড়াল চারহাজার। এই বাহিনীতে অনেকগুলি ইউনিট (Unit) বা স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল; যথা: প্যারাসুটিস্ট, ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি (পদাতিক) ক্যাভালরি (ঘোরসওয়ার)

মিকানাইজড্ কোর (যান্ত্রিক রণসম্ভারে সজ্জিত দল)। তাদের মধ্যে অনেককে Regenwormleger শহর থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মেসার্জ (Mesertz) শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রুশিয়ার রাজধানী Koenigsburg শহরে অবস্থিত শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

'মেশিনগান' থেকে আরম্ভ করে এদের যুদ্ধের সকলপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এ কৌশলে শিক্ষিত করা হয়েছিল। ("All weapons like heavy and light Machine guns, Mortars, Mountain training, Swimming, Riding, Pioneer, Artillery etc")

সর্বপ্রকার সামরিক শিক্ষা ছাড়া এই বাহিনীর সকলকে রাজনীতি শিক্ষাও দেওয়া হত। ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস (১৮৫৭ সালের পূর্বে ও পরে স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের মধ্যেকার সংগ্রামের ইতিহাস) ভারতীয় নেতৃবৃন্দের জীবনের কথা এবং সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধেও শিক্ষা দেওয়া হত।

এই তো গেল সামরিক সংগঠনের কথা। অসামরিক ভাবেও আজাদহিন্দ সংঘ ইউরোপে অবস্থিত সমস্ত ভারতবাসীকে একই ত্রিবর্ণপতাকার নিম্নে সংঘবদ্ধ করছিল এবং এই সংঘের শাখা সমগ্র ইউরোপের প্রধান শহরে স্থাপিত হয়েছিল। ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন— শ্রীএ. জি. এন. নেশ্বিয়ার। সুভাষচন্দ্র তাঁকে ইউরোপীয় সংগঠনের প্রধান নায়করূপে নিযুক্ত করেছিলেন।

তার পর সুভাষচন্দ্র পূর্বএশিয়ায় চলে গেলে নেশ্বিয়ার আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের অন্যতম সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সংঘের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে ডা. সুলতান (বৈদেশিক ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত) মি. এম. ভি. রাও (প্যারিস শাখার প্রধান নায়ক) ডা. মল্লিক, মি. গণপিলে, মি. প্রমোদ সেনগুপ্ত, ডা. কান্তরাম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজাদহিন্দ সংঘের তরফ থেকে প্রচারকার্য বিশেষ সু-নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃংখল ভাবে চলেছিল। এই সংঘ থেকে 'আজাদ হিন্দ' নামে একখানি কাগজ বের হত। তা ছাড়া সংঘের অধীনে আজাদ হিন্দ রেডিও, ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও এবং আজাদ মুসলিম রেডিও এই তিনটি রেডিও কেন্দ্রের মারফতে প্রচারকার্য চলত।

ইউরোপ ত্যাগের চেষ্টা

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ ত্যাগ করেন। ইউরোপ ত্যাগের এটা তাঁর দ্বিতীয় চেষ্টা। এই সালেরই জানুয়ারি মাসে তিনি আর একবার এ চেষ্টা করেছিলেন। জানুয়ারি মাসে সুভাষচন্দ্র বার্লিন ত্যাগ ক'রে রোম অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখান থেকে তাঁর অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাত্রা করার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তিনি জানতে পারেন, তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা শুনতে পেয়েছে। সেই কারণে তিনি সংকল্পিত যাত্রা তখনকার মতো স্থগিত রাখেন।

টোকিওতে আগমন

দ্বিতীয়বারের চেষ্টা সফল হল এবং সুভাষচন্দ্র ফেব্রুয়ারি মাসে জারমানি ত্যাগ করে চলে গেলেন। এবার তাঁর যাত্রার কথা, কবে যাত্রা করবেন সেদিনের কথা, গন্তব্যস্থানের কথা, কোন্ দিকে, কোন্ পথে কী উপায়ে তিনি যাবেন ইত্যাদি সমস্ত কথাই অত্যন্ত গোপন থাকে। খুব অল্প লোকই সে-সব কথা জানত। রাসবিহারী বসুর পরামর্শে এবং পূর্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে আসেন, জাপান গভর্নমেন্টের সঙ্গে পূর্বএশিয়ার রণনীতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ও প্রথম আই. এন. এ.

পূর্বএশিয়ায় জাপানের জয়লাভের পর প্রত্যেক স্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) গঠিত হয়। জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া, মানচুরিয়া, সাংহাই, হংকং, ইন্দোচীন, নানকিন, বর্মা, শ্যাম, আন্দামান, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়ের সংঘগুলি ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি ব্যাংককে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে একটি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কার্যপদ্ধতি স্থির করে এবং একটি কর্মীসংঘ (Council of action) গঠন করে। রাসবিহারী বসুকে সভাপতি এবং এন. রাঘবন, কে. পি. কে. মেনন., ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কর্নেল জিলানীকে সভ্য নির্বাচিত করা হয়। এই কর্মী সংঘ (Council

of action) আই. এন. এ. বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৪২ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই জাপানের নির্দেশে বর্মায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যদের পাঠাতে অসম্মত হওয়ায় জাপানের সঙ্গে পূর্বএশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অবনিবনাও হয় এবং কর্মীসংঘের সভ্যগণ জাপান গভর্নমেন্টের এই নির্দেশের প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করেন। জাপানীরা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার মতলব করছে বুঝতে পেরে ক্যাপ্টেন মোহন সিং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ভেঙে দেন। এই মনোমালিন্যের আরো কারণ ছিল বর্মায় ভারতীয়দের উপর জাপানীদের অন্যায় আচরণ। এটা ঘটে ১৯৪২ সালের ১২ ডিসেম্বর। তখন সভাপতি রাসবিহারী বসু একাই সংঘের কাজ চালাতে থাকেন এবং অল্পকাল পরেই কর্নেল ভোঁসলের নেতৃত্বে আই. এন. এ. পুনর্গঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (I.I.L.) গঠিত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেখানে ভারতীয় যুব-আন্দোলনের সূচনা করে তাদের সহায়তায় গণজাগরণের চেষ্টা করা হয়।

প্রথম ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (First I.N.A.) ভেঙে যাওয়ার পর, সাধারণত অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ ও নৈরাশ্য দেখা দিল। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ কর্নেলদের মন এতে দমে গেল না। তাঁরা আশা করতে লাগলেন তাঁদের সেনা-বাহিনীকে তাঁরা আবার গড়ে তুলবেন। সৈন্যদের খাওয়াপরার ব্যবস্থা করার জন্য একটি পরিচালক-সমিতি গঠিত হল; তার সদস্য নির্বাচিত হলেন লে. ক. লোগানাথন, লে. ক. ভোঁসলে, লে. ক. এহ্শন কাদির, লে. ক. জামান কিয়ানি যিনি প্রথম আই. এন. এ.-র প্রধান নায়ক (Chief of General Staff) ছিলেন।

এই সময় জাপানীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁরা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। দূরদর্শী পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ আশংকা করতে লাগলেন যে, যেহেতু জাপানীরা নিজেদের তাঁবেদার ভারতীয় বাহিনী গঠন করবার জন্য কৌশল করছে এবং তাদের মনোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে ভারতবর্ষে গিয়ে তারা ভারত-বাসীদের ইচ্ছামতো নিজেদের দলভুক্ত করবে এবং তাদের এ-সব গুপ্ত অভিসন্ধির কথা বিন্দুমাত্র জানবার সুযোগ না পেয়ে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ভারতীয়েরা জাপানীদের সঙ্গে যোগদান করবে, সেইজন্য ভারতের স্বাধীনতাকামী কোনো সৈনিকের পক্ষে জাপান কবে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে সেই প্রত্যাশায় আর এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা চলে না।

এই সময়টি খুব অনিশ্চয়তা ও গোলমালের মধ্যে কাটতে লাগল। প্রথম জাতীয় বাহিনী ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, নায়ক বা সৈন্যাধ্যক্ষের বিভাগীয় নিদর্শনী বা 'ব্যাজ' ছিল না, কে কী করবে না করবে, তারও কোনো নির্দেশ ছিল না। কাজেই প্রথম আই. এন. এ. অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যগণ স্ব স্ব প্রধান হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অধিনায়ক মোহন সিং-এর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বর্তমান বিশৃংখল অবস্থার সংগে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না।

জাতীয়বাহিনী পুনর্গঠনের চেষ্টা

সে সময় পূর্বএশিয়ার ভারতীয়েরা সুস্পষ্ট নির্দেশ ও দৃঢ় নেতৃত্বের অপেক্ষায় দিন গুনছিলেন। কাজেই যে সময় জাতীয়বাহিনী বিজয়গর্বে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার কথা, সে সময়টা অনর্থক অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছিল। এদিকে ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালের বিপ্লবী কর্মীরা জাতীয়বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। অতএব এই কারণেই জাতীয়বাহিনী এক অপূর্ব সুযোগ হারিয়ে বসল। ১৯৪২ সালে ইম্‌ফাল ও চট্টগ্রামে ওয়াভেলের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সৈন্য ও রণসম্ভার অতি সামান্যই ছিল— কিন্তু ১৯৪৩ সালে সে অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন হতে দেখা গেল। ওদিকে তখন বর্মা ও মালয়ে মিত্রশক্তি ভারতীয় ও জাপানীদের মধ্যে মনোভাব নৈরাশ্য ও ক্ষোভে অতিশয় তিক্ত হয়ে উঠেছে; রাসবিহারী বসু এবং জাতীয়বাহিনীর নেতৃবৃন্দ অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন, জাপানীদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী মনোভাব তার গবেষণা করবার মতো ধৈর্য তাঁদের তখন ছিল না। কাজেই ভারতীয় জাতীয়বাহিনীকে (I.N.A.) পুনর্গঠনে তাঁরা কৃতসংকল্প হলেন— ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যতটা হোক না-হোক অন্তত পূর্বএশিয়ার ভারতীয়দের এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য। রাসবিহারী বসু সিংগাপুরে এক সভায় পদস্থ সেনানায়কদের উদ্দেশ করে বললেন—

Comrades, the question of sincerity or insincerity of the Japs does not arise. Our Struggle has been continuously going on since 1857, against British Imperialism. It was the time when Japan was unheard of as a great nation. Our struggle had

continued even in the last war, under the revolutionary leadership of Raja Mohendra Pratap and Dr. Hardyal, though Japan was then siding our enemy the British. Even now when Japan declared war on Britain she did not think of India, while preparing her strategy which was completely independent of Indian help.

[বন্ধুগণ, জাপানীরা কপট কি অকপট সে প্রশ্ন ওঠে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলে আসছে ১৮৫৭ সাল থেকে। সে সময় জাপানীরা যে একটা বড়ো জাতি এ কথা কেউ শোনে নি। গত মহাযুদ্ধের সময়ও বিপ্লবী নেতা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও ডাঃ হরদয়ালের অধীনে আমাদের চেষ্টা চলেছিল, যদিও তখন জাপান ব্রিটিশের দিকেই ছিল। এমন-কি বর্তমানেও যখন জাপান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তখন ভারতের কথা সে ভাবে নি এবং তারা ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।]

তিনি আরো বলেন যে যদি ধরে নেওয়া যায় জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, তা হলেও তো তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করার একান্ত প্রয়োজন। তিনি আরো বললেন :

The new army will be purely a voluntary army and those who want to leave the old army (No. 1. I.N.A.) can do so.

অর্থাৎ এই নূতন সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সৈনিকের দ্বারা সংগঠিত হবে, এবং যারা চায় তারা পুরাতন জাতীয়বাহিনী (No. 1. I.N.A.) ত্যাগ করে যেতে পারে।

তার পর একটি নির্ধারিত দিনে দ্বিতীয় আই. এন. এ.-তে কেন যোগদান করব এবং কেনই-বা করব না তার কারণ দেখিয়ে নাম তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হল। প্রথম আই. এন. এ.-র সুবিধাবাদী মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সকলে এসে পুনর্গঠিত আই. এন. এ. বাহিনীতে যোগদান করলে। আবার স্বীয় মত ও ধারণাকে অভ্রান্ত মনে করে কয়েকজন সৈন্য আই. এন. এ. পরিত্যাগ করেও চলে গেল।

ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘ ও প্রথম আই. এন. এ.-র পুনর্গঠন

১৯৪৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি কর্নেল ভোঁসলে— সামরিক সংঘের পরিচালক, (Director of Military Bureau) লে. ক. শাহনওয়াজ – প্রধান সেনানায়ক (Chief of the General Staff), মেজর পি. কে. সেগল— যুদ্ধ-সচিব (Military Secretary), মেজর হবিবউল্ রহমান — নায়কদের শিক্ষা-শিবিরের অধ্যক্ষ (Commandant, Officers School), মেজর মাতাউল্ মালিক— (লে. ক. বুরহান উদ্দীনের ভাই) সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারের নায়ক (Commandant, Reinforcement), মেজর এ. ডি. জাহাংগীর— সংস্কৃতি ও ব্যয়-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (incharge of establishment and culture) নির্বাচিত হলেন। পূর্বের সামরিক নিদর্শনী বা 'ব্যাজ' সৈন্যদের ফিরিয়ে দেওয়া হল এবং আবার পুরোপুরি জাতীয়বাহিনী সংগঠিত হল।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘেরও (Indian Independence League) পুনর্গঠন করা হ'ল বারোটি বিভাগে। এর মধ্যে এহ্‌শন কাদিরের অধীনে সৈন্য-সংগ্রহ বিভাগ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেছিল। এহ্‌সন কাদির সাইগন রেডিও থেকে পাঞ্জাবীতে দিনের পর দিন দেশপ্রীতিমূলক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রচারকার্য পরিচালনা করে পূর্বএশিয়ায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর আবেগপূর্ণ আবেদনে পূর্বএশিয়ার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে থেকে সর্বাপেক্ষা বেশি লোক জাতীয় বাহিনীতে সংগৃহীত হয়েছিল। হাজারে হাজারে স্বেচ্ছাসেবক আসতে লাগল। তাঁর আন্তরিক আহ্বানে উন্মুখ প্রাণের সাড়া পড়ে গেল, নাম লেখাবার জন্য সংগ্রাহক শিবিরে প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিড় হতে লাগল অসংখ্য মালয়বাসীর। যারা জীবনে কোনোদিন অস্ত্রধারণ করে নি তারাও এসে উপস্থিত হ'ল সৈন্যের খাতায় নাম লেখাবার জন্য।

সেবা-শুশ্রূষার জন্য মহিলা বিভাগ

সেবাশুশ্রূষা, সমাজকল্যাণ সাধন, দুর্গতদের সাহায্যকল্পে 'হেড-কোয়ার্টার্স'-এ বা প্রধান শিবিরে একটি মহিলাবিভাগ খোলা হ'ল। সিংগাপুরে জনসেবার ব্যাপারে ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের বেশ সুনাম ছিল। এই মহিলাবিভাগের

তিনিই হলেন প্রথম সম্পাদিকা। ডাক্তারি ব্যবসায়ে তাঁর আয় ছিল প্রচুর। তিনি দেশসেবার জন্য তাঁর ডাক্তারি ব্যবসা ছেড়ে দিলেন, এমন-কি তাঁর বৃহৎ ডিস্‌পেনসারিও, আই. এন. এ. হাসপাতালের ব্যবহারের জন্য দান করে দিলেন।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে সিঙ্গাপুরে ডাঃ লক্ষ্মী একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন—

"The men had for the most precious one year (1942-43) been groping in the dark. They in that period had never thought of inviting women and now that they have called upon us to work with them, at this crisis, I assure them on behalf of my sisters that we women will do our level best to keep them on the right path."

অর্থাৎ—১৯৪২-১৯৪৩ সালের বহু মূল্যবান এক বৎসর পুরুষেরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছে। এসময় নারীদের আহ্বান করার কথা তারা কখনো ভেবেও দেখে নি। যেহেতু এই সংকটকালে আজ তারা তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য আমাদের ডাক দিয়েছে, আমি আমার ভগ্নীদের তরফ থেকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে আমরা তাদের ঠিক পথে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।

তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত ঘোষণা শ্রোতারা বিপুল উৎসাহ ও আবেগের সঙ্গে শ্রবণ করলে। এই বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বহু মহিলা ডঃ লক্ষ্মীকে সাহায্য করার জন্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

জাপানীদের প্রতি মনোভাব

প্রথম আই. এন. এ. এবং দ্বিতীয় আই. এন. এ.-র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ছিল ব'লে তারা কোনোরকম নৈরাশ্য বোধ করলেন না বরং তাঁদের মনোভাব জাপানীদের প্রতি দৃঢ়তর হতে দেখা গেল এবং এটাও দেখা গেল যে প্রথম আই. এন. এ. ভেঙে যাওয়ার পর থেকে তাদের সাহস ও বীরত্ব যেন বেড়ে গেল দ্বিগুণ। এমনও দেখা গেছে যে শিক্ষানবিশ ভারতীয় সৈন্যেরা সময় বিশেষে কুয়েলালামপুর এবং অন্যান্য স্থানে জাপানীদের বেশ জব্দ ক'রে দিয়েছে। কোনো বিরোধ ঘটলে যখন ব্যাপারটা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিচারের জন্য আসত তখন জাপানীদেরই বারবার ত্রুটি স্বীকার করতে হয়েছে।

জাতীয় বাহিনীর নায়কগণ পাছে জাপানীদের সাম্রাজ্যজয়ের অভিসন্ধি প্রকাশ পায় তারই জন্য আগে থেকেই গুপ্তভাবে সামরিক আয়োজন করতে লাগলেন, তাদের সংগে লড়বার জন্য। সে সময় জাতীয় বাহিনীর নায়কদের জাপানীরা বলতে লাগল যে অতিসত্বর সুযোগ পেলেই সুভাষচন্দ্র বসু জারমানি থেকে নিশ্চয়ই আসবেন, কিন্তু একথা তখন কারও বিশ্বাস হয় নি। সুভাষ বসু যদি না আসেন তাহলে ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতের বিপ্লবী নেতাদের উপরই নির্ভর করতে হবে; সিংগাপুরের ভারতীয় জাতীয় বাহিনী তখন সেই কথাই চিন্তা করছিলেন।

পূর্ব এশিয়ার ভ্রাতৃসংঘ

আই.এন.এ.-র অভিজ্ঞতা থেকে মালয়বাসী কমিউনিস্ট জাপানীরা এবং জাতীয়-তাবাদী বর্মীরা বুঝতে পারল যে জাপান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উপায় একমাত্র তাদের নিজের সশস্ত্র শক্তি; এবং তারা এও বুঝতে পারলে যে পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে নিপীড়িত এশিয়ার জাতিসমূহের সংগে সহযোগিতা করার একান্ত প্রয়োজন।

এমন-কি যে মালয়বাসীরা যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা দূরে থাক্ ব্রিটিশের কাছে কুলিগিরি ছাড়া এ যাবৎ আর কিছুই করে নি, তারাও দেশের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রশিক্ষা করতে লাগল। অলস মালয়বাসীরা জেগে উঠে হোমগার্ড (Home guard) তৈরি করল। চীনারা, জাভা ও বর্মার লোকেরা সকলে আই. এন. এ.-র সংগে সহযোগিতা করতে লাগল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভ্রাতৃসংঘের মধ্যে এসে তারা নিজেদের অনেক নিরাপদ ব'লে মনে করল। ভারতীয়দের সংগে জাভার লোকদের ঘনিষ্ঠতা হ'ল গভীর এবং তারা এক অলিখিত চুক্তিতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে লাগল। কিভাবে ভারতীয় বাহিনীর চেষ্টার সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় অধিবাসী-গণ দেশাত্মবোধে সজাগ হয়ে উঠল তার বিস্ময়কর ইতিহাস একদিন আমরা বিশদভাবে জানতে পারব। জাপানীরা এদের মধ্যে বিভেদ আনার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে দুরভিসন্ধি সফল হয় নি। ভারতীয় বাহিনী ও আজাদহিন্দ সংঘের সেনানায়কদের তীক্ষ্ন রাজনীতিক বুদ্ধি ও দুর্জয় সাহসের জন্য জাপানীদের বহু-প্রচারিত 'Co-prosperity sphere' সংগঠিত হ'তে

পারে নি। যখন আশেপাশের এশিয়াবাসী দেখলে যে স্বাধীনতাকামী যুবকবৃন্দ বিজয়ী জাপানীর দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে লড়বার জন্য বীরের মতো দাঁড়িয়েছে তখন তারাও খুব উৎসাহিত হল। এমনও হয়েছে যে তাদের বীরত্বে ও দেশপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে ব্রিটিশের গুপ্তচর, যারা এতদিন বেতার যোগে ভারতীয় বাহিনীকে অপদস্ত ও তাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বিফল করবার চেষ্টা করেছে—তারা সরাসরি এসে রেডিও যন্ত্রপাতি ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে তাদের এই গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করেছে এবং ভারতীয় বাহিনীর দেশপ্রীতিতে আকৃষ্ট হয়ে তারা স্বেচ্ছায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের মধ্যে অনেককেই ১৯৪৩ সালে প্যারাসুট অথবা সাবমেরিনে ক'রে মালয়ে পাঠানো হয়েছিল।

টোকিওতে সুভাষচন্দ্র

একদিন শোনা গেল সুভাষচন্দ্র পূর্বএশিয়ার ভারতীয়দের উদ্দেশে টোকিও রেডিও থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সেদিন বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না।

সেদিন 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' নীরব থাকলেও সমগ্র পূর্বএশিয়ায় সুভাষচন্দ্রের আগমনবার্তা বিঘোষিত হয়ে গেল। জাপান গভর্নমেণ্টের কাছে শোনা গেল, সুভাষচন্দ্র বসু টোকিওতে এসেছেন এবং শীঘ্রই ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘের (Indian Independence League) পরিচালনভার গ্রহণ করবেন।

শোনা গেল যে তিনি ১৯৪৩ সালের মে মাসে জারমান সাবমেরিনে করে পিনাঙে আসেন এবং সেখান থেকে জাপান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারের বোঝাপড়ার জন্য বিমানপোতে টোকিওতে যান। এ যাত্রায় সহযাত্রী ছিলেন রাসবিহারী বসু। ১৯৪৩ সালের ২০ জুন তারিখের নিম্নোদ্ধৃত সংবাদটি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

The following is the Press Statement of Subhas Babu when he arrived in a Submarine at Tokyo with Mr. Hassan :

"During the last World War our leaders had been bluffed and deceived by the wily British Politicians. That was why we took the vow more than 20 years ago never again to be deceived by

them. For more than 20 years my generation has striven for freedom and eagerly awaited the hour that has now struck; the hour that is for the Indian people the dawn of freedom. We know very well such an opportunity will not come again for another 100 years and we are, therefore, determined to make the fullest use of it. British imperialism has meant for India moral degradation, cultural ruin, economic impoverishment and political enslavement. It is our duty to pay for our liberty with our own blood. The freedom that we shall win, through our sacrifice and exertions, we shall be able to preserve with our own strength.

২০ জুন (১৯৪৩ সাল) সুভাষবাবু হাসানের সঙ্গে সাবমেরিনে ক'রে টোকিওতে পেঁছে সংবাদপত্রে এই বিবৃতিটি দেন :

গত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে আমাদের নেতৃবৃন্দ ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। সেইজন্যই আমরা বিশ বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আর আমরা কখনো প্রতারিত হব না। বিশ বছরেরও বেশি এই প্রজন্মে (generation) স্বাধীনতার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং সাগ্রহে যে সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলাম, সে সময় আজ উপস্থিত হয়েছে। ভারতীয়দের পক্ষে সে-সময় স্বাধীনতার প্রভাতকাল। আমরা ভালো করেই জানি যে একশো বছরের মধ্যে আর এমন সুযোগ আসবে না। সেইজন্য আমরা এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়েছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে ভারতের নৈতিক অবনতি ঘটেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস হয়েছে, আর্থিক দুর্দশা এসেছে, রাজনৈতিক দাসত্ব কায়েম হয়েছে। আমাদের কর্তব্য রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার মূল্যদান। আমাদের ত্যাগ ও উদ্যমে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করব, আমাদের নিজের শক্তিতেই সে স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করতে পারব।

মিত্রশক্তির সংবাদ-সরবরাহক রটিয়েছিল যে সুভাষ বসু ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সেই সুভাষ বসু খোশ মেজাজ ও বহাল তবিয়তে পূর্ব এশিয়ায় উপস্থিত হলেন ১৯৪৩ সালে; ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্য।

অনেকে মনে করেন যে ১৯৪২ সালের ব্যাংকক সম্মেলনের পর রাসবিহারী বসুর আহ্বানে তিনি যদি পূর্বেই এসে পৌঁছাতেন তা হলে ভারতের বাহিরে ও ভিতরে বিপ্লবী শক্তিসমূহের সংযোগ ও সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতার

সমস্যা সমাধান হয়ে যেত ; বাঙলার সর্বজনপ্রিয় নেতা অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, ত্যাগী ও বীর সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে ভারতীয় বিপ্লবের কেন্দ্র ও উৎস, যুদ্ধকালীন সামরিক গুরুত্বে উত্তেজিত ভারতবর্ষের সীমানা-নির্দেশক বাঙলার প্রত্যেক নরনারী সাড়া দিয়ে উঠত। বাঙলার সেই বিপ্লবের ছোঁয়াচ লাগত সারা ভারতবর্ষে, জয়যাত্রার পথে অগ্রসর করে নিয়ে যেত সেই অনিবার্য বিপ্লব— আমাদের এ ধারণার সমর্থক নেতাজীর বাণী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

Countrymen at home and abroad ! Lose no time. Gird up your loins and launch the last struggle at once. We, here in East Asia, are doing everything possible, with the help of our powerful Allies. Soon we must cross the frontiers of India and plant the flag of freedom on Indian soil. Then will begin the long and historic march to Delhi—the march that will end only when the last Britisher is thrown out of India—when our national flag proudly floats over the Viceroy's House in New Delhi—and when India's Army of liberation holds its Victroy Parade inside the ancient Red Fortress of India's Metropolis.

অর্থাৎ— দেশ ও বিদেশে অবস্থিত হে আমার স্বদেশীয়গণ ! সময় নষ্ট করবেন না— অবিলম্বে বদ্ধপরিকর হয়ে শেষ সংগ্রামে নেমে পড়ুন। পূর্ব এশিয়ায় আমরা আমাদের শক্তিশালী মিত্রশক্তির সাহায্যে যা-কিছু সম্ভব সবই করছি। অতি শীঘ্রই আমরা ভারতসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতভূমিতে স্বাধীনতার ধ্বজা প্রোথিত করব। তারপর আরম্ভ হবে আমাদের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিযান দিল্লী অভিমুখে। সে অভিযান শেষ হবে তখনই যখন শেষ ব্রিটেনবাসী ভারতবর্ষ থেকে দূরীভূত হবে, যখন নয়াদিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদে আমাদের জাতীয়পতাকা গর্বভরে উড়তে থাকবে— যখন ভারতের মুক্তিসৈন্যগণ ভারতের রাজধানী পুরাতন লাল কেল্লার অভ্যন্তরে বিজয়-উল্লাসে তাদের সামরিক প্রদর্শনী পরিচালনা করবে।

সুভাষচন্দ্রের আগমনের পূর্বে

সুভাষচন্দ্র পূর্বএশিয়ায় আসার আগে সেখানে তিনটি বাহিনী আপন আপন রীতিপদ্ধতি অনুসারে কাজ করে চলেছিল। এম. পি. জে.-এর ৫০,০০০ সৈন্য

জাপানের পরাজয়ের জন্য যুদ্ধ করছিল। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রায় ১00000 সৈন্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধ করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছিল। নিপ্পন সৈন্য (জাপানী সৈন্য) যুদ্ধ করছিল তাদের তৎকালীন অধিকৃত অঞ্চলে নিজেদের প্রতিপত্তি কায়েম করার জন্য। কাজেই সুভাষচন্দ্রের আসার আগেও জাপানের স্বার্থে এদের মধ্যে কেউ নিজেদের নিযুক্ত করে নি; তাদের তাঁবেদারও কেউ ছিল না।

ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটে। প্রথম আই. এন. এ.-র প্রতিষ্ঠাতা ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের (প্রধান সেনাশিবির) ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী কর্নেল নিরঞ্জনসিং গিলকে টোকিওর সামরিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের অন্যতম বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ সে সময় টোকিওতে ছিলেন। তাঁর সংগে এঁরা দেখা করবার অনুমতি পেলেন না। তবে কোনো সুযোগে তাঁর সংগে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে তাঁরা জানতে পারেন যে জাপানের অভিসন্ধি অনুসারে কাজ করতে রাজী হন নি বলে তিনি নজরবন্দী অবস্থায় আছেন।

একদিন রাত্রে জাপানী সামরিক কর্মচারীরা এল তাঁদের আবাসে কর্নেল গিলকে গ্রেপ্তার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মোহনসিং কিছুতেই তা হ'তে দিলেন না; কর্নেল গিলের বিরুদ্ধে কী তাদের অভিযোগ জানতে চাইলে জাপানী সৈনিক তাদের দুজনকেই বন্দী করে নিয়ে গেল। তারা আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের আমলেও মুক্তি পেলেন না কেন, একথা সম্প্রতিমুক্ত জেনারেল মোহনসিংকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন—

Japanese Government did not want to compromise on their release issue; there were difficulties in the way of Azad Hind Government.

অর্থাৎ, তাদের মুক্তি সম্পর্কে জাপান কোনো মিটমাট করতে রাজী ছিল না; এবং আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের পক্ষেও তাঁদের মুক্তি দেওয়ার সম্পর্কে অনেক রকম বাধা ছিল।

জাপানের এইপ্রকার মনোভাবের উপর সন্দিহান হয়ে রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ১৯৪২ সালের ২৮-৩০ মার্চ তারিখে আহূত টোকিও-সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হ'ল—

That Military action against India will be taken only by the

Indian National Army and under the Command of Indians, together with such military naval and air co-operation and assistance as may be requested from the Japanese authorities by the Council of Action of the Indian Independence League to be formed and that the framing of the future constitution of India will be left entirely to the representatives of the people of India.

অর্থাৎ, ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান একমাত্র ভারতীয় নায়কত্বে ভারতীয়-বাহিনীর দ্বারাই পরিচালিত হবে। সেইসঙ্গে জাপানের নৌবিভাগ, বিমান বিভাগ ও সাধারণ সামরিক বিভাগ থেকে কী প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন, ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘের কর্মীসংঘই সেটা স্থির করবেন। এই স্বাধীনতাসংঘ সত্বরই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের আইনকানুন তৈরি করার ভার সম্পূর্ণরূপে ভারতের প্রতিনিধিবর্গের উপরই অর্পিত হবে।

তার পর যেভাবে সংঘের বিস্তৃত প্রতিষ্ঠালাভ হয় তা আমরা পূর্বেই বলেছি।

সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতাসংঘের অধিবেশন

এই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই পূর্বএশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিনিধিবর্গ সিঙ্গাপুরে জমায়েত হচ্ছিলেন। ক্যাথে বিল্ডিংটি (Cathay Building) সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। ৪ জুলাই তারিখে এই হলটি জনতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হলের মধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিনিধি বসেছিলেন। একজন ভারতীয় একটি আসনের জন্য সেদিন একলক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সেই হলের চারিদিকে নানাজাতির সহস্র সহস্র লোক ভিড় করে দাঁড়াল— সেই রহস্যময় মানুষ, সুভাষচন্দ্র বসুর মুখখানিও যদি দেখতে পাওয়া যায় এই আশায়।

সুভাষচন্দ্র সেই জনতাকে লক্ষ্য করে উদ্দীপক ভাষায় বক্তৃতা করলেন এবং রাসবিহারী বসুর নিকট থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

সেই জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি ক'রে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন— অনতিবিলম্বে জাতীয়বাহিনী এবং জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি বললেন—

You are the sons and daughters of the traditionally chivalrous Indians. You are no more slaves. I want you to walk with your head raised up. With due respect to our greatest leader Gandhiji, I say that force must be meted out to force. Better to die than to live a cowardly and slavish life. If we can sacrifice a hundred thousand lives, we can free four hundred millions of our brothers and sisters from the British Slavery in India.

অর্থাৎ, শৌর্যবীর্যে প্রসিদ্ধ ভারতের পুত্রকন্যা তোমরা; তোমরা আর কারো ক্রীতদাস নও। আমি চাই তোমরা মাথা উঁচু করে চলবে। আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা গান্ধীজির প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি বলছি— বলের দ্বারাই বলকে রুখতে হবে। কাপুরুষের মতো দাস-জীবন যাপন করার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। আমরা যদি শতসহস্র জীবন বিসর্জন দিতে পারি, তা হলে ব্রিটিশের দাসত্ব থেকে চার কোটি ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মুক্তি দিতে পারব।

সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুর আসার পর ৭০০০ সৈনিকের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রে এই সময় চারটি সামরিক শিক্ষাশিবির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিক্ষালাভের উৎসাহে ভারতীয়গণ দলে দলে জমায়েত হতে লাগল; তাদের মধ্যে ঘোর প্রতিযোগিতা— কে আগে যাবে শিক্ষাশিবিরে।

সিঙ্গাপুরে সামরিক পরিদর্শন

সমগ্র পূর্বএশিয়া বীর সুভাষচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর দর্শনলাভ করে তাঁর মুখে ভারতের চিরআকাঙ্ক্ষিত মুক্তির বাণী শুনে তারা নব-জীবনের স্পন্দন অনুভব করলে এবং তাঁর আহ্বানে লোকজন এল, অর্থ এল, প্রয়োজনীয় সামগ্রীরও অভাব থাকল না। ভারতীয়েরা সর্বস্ব দিয়ে ফৌজে যোগদান করলে। সিঙ্গাপুর, জোহোর, সিরেমবান, ইপো, পেনাং, জিত্রা, ব্যাঙ্কক এবং রেঙ্গুনে সামরিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। ছ'মাস অন্তর প্রত্যেক স্থানে গড়পরতা ৩৫০০ সৈন্যের শিক্ষাদান চলতে লাগল, প্রত্যেক ঘন্টায় দলে দলে লোক আসতে লাগল ফৌজে যোগদান করবে ব'লে কিন্তু তাদের স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন হয়ে পড়ল।

সিঙ্গাপুরে ঝাঁসীর রানী বাহিনীর মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ কেন্দ্র খোলা হ'ল। এখানকার সামরিক শিক্ষা ছিল উঁচু ধরনের। ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক শাসন ব্যবস্থার জন্য আজাদহিন্দ দলকে যোগ্যতা অর্জন, উৎকৃষ্ট সামরিক শাসন ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল। ক্রমশ জাতীয় বাহিনী ও ঝাঁসীর রানী ও আজাদহিন্দ দল শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠল এবং ২১ অক্টোবর (১৯৪৩) স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্নমেন্ট সংগঠিত হল। তার নাম দেওয়া হয় 'আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট'। আজাদহিন্দ ফৌজের সম্ভাষণ বাণী হ'ল 'জয়হিন্দ'— জয় ভারত! এদিন সকালের দিকে প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় জনতার মধ্যে জাপানী, জারমান, ইটালীয়ান প্রভৃতি নানা দেশের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী সিঙ্গাপুর মিউনিসিপ্যাল ময়দানে সমবেত হয়ে আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টকে স্বীকার করে নেওয়ার পর ভারতীয় ত্রিবর্ণ জাতীয়পতাকা উচ্চে তুলে দেওয়া হ'ল। তারপর ঝাঁসিরানী বাহিনী ও আজাদহিন্দ দলের সামরিক পরিদর্শন আরম্ভ হ'ল বিশেষ উম্মাদনা ও উৎসাহের মধ্যে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্ট

আমরা পূর্বেই বলেছি যে ১৯৪৩ সালের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র একখানি জারমান সাবমেরিনে পূর্বএশিয়ায় এসেছিলেন। ৭ জুলাই তারিখে চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ পেল যে সুভাষচন্দ্র ২ জুন তারিখে সিঙ্গাপুর পেঁাচেছেন এবং সেখানে তিনি জাতীয় বাহিনী ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ গঠন করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ২১ অক্টোবর (১৯৪৩) তারিখে তাঁরই নেতৃত্বে অস্থায়ী আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু— স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান (Chief of the State), প্রধান সচিব, (Prime Minister), সমর-সচিব (Minister of war), পররাষ্ট্র সচিব (Foreign Minister), জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief of the National Army); মিঃ এস. এ. আয়ার, (প্রচার ও আন্দোলন); ক্যাপ্টেন মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন (নারী সংগঠন); লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি (অর্থসচিব); লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ, লেঃ কঃ এন.

এস. ভগৎ, ক. জে. কে. ভোঁসলে, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম. জেড. কিয়ানী, লেঃ কঃ এ. পি. লোগনাথন, লেঃ কঃ এহ্‌শান কাদির, লেঃ কঃ শা'নওয়াজ (সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিবর্গ); মিঃ এ. এম. সহায় (সম্পাদক, সচিব-পদাধিকারে); শ্রীরাসবিহারী বসু (প্রধান পরামর্শদাতা); মেসার্স করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি এম. খান; এ. ইয়ালাপ্পা, জে. থিবি এবং সর্দার ঈশার সিং (পরামর্শদাতা); মিঃ এ. এন. সরকার (আইন বিষয়ে পরামর্শ-দাতা) নির্বাচিত হলেন এবং আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের হেড্‌কোয়ার্টার্স বা প্রধান শিবির হ'ল সিঙ্গাপুর।

স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্টের অর্থবিভাগ পুষ্ট হয়েছিল প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অকুণ্ঠ দানে। শুধু বর্মা থেকেই ৪ কোটি টাকা উঠেছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের ও গভর্নমেন্টের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হ'ত এই টাকা থেকে। 'সুভাষ বসু' এই নামের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে টাকা আসত অফুরন্ত ভাবে। তাঁর অভিনন্দনের একটি ফুলের মালা প্রকাশ্য সভায় নিলাম ক'রে তখন তখনই ১২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। আজাদহিন্দ ফৌজের মধ্যে ভারতের সকল প্রদেশের লোকই ছিল। বেসরকারি বিবরণীতে পাওয়া যায়, এই ফৌজে ১৫০০ অফিসার এবং ৫০,০০০ সাধারণ সৈন্য ছিল। তাঁদের শপথ গ্রহণ করতে হত এই ব'লে—

I voluntarily and of my own free will join and enlist myself in the Indian National Army. I solemnly and sincerely dedicate myself to India and hereby pledge my life for her freedom. I will serve India and the Indian Independence movement to my fullest capacity even at the risk of my life. In serving the country I will seek no personal advantage for myself. I will regard all Indians as my brothers and sisters without distinction of religion, language or territory.

অর্থাৎ: এতদ্দ্বারা আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করিয়া তালিকাভুক্ত হইলাম। আমি আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে ভারত ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিতেছি এবং প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতেছি যে আমি আমার পূর্ণ শক্তির দ্বারা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও ভারত ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিব। দেশসেবার সময় আমি আমার নিজের জন্য কোনো সুখ-

সুবিধা খুঁজিব না। ধর্ম, ভাষা ও প্রদেশ নির্বিশেষে আমি সকল ভারতীয়-দের আমার ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া জ্ঞান করিব।

আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট ১৯টি বিভাগের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হ'ত; অক্ষশক্তির সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময় করা হয়েছিল। মালয়ে ৭০টি, বর্মায় ১০০টি, থাইল্যান্ডে ২৭টি স্বাধীনতা সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ ছাড়া আন্দামান, সুমাত্রা, জাভা, সেলীবিস, বোর্নিও, ফিলিপাইন্স, চীন, মাঞ্চুকু এবং জাপানে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর দ্বারা কোহিমা অঞ্চল অধিকৃত হওয়ার পর আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট কর্তৃক সেখানে পৌরশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। তাদের সংকল্প ছিল এর পরই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রথমত আসামে ও বাঙলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমশ ভারতের অন্যান্য স্থানে নিজেদের প্রতিপত্তি সম্প্রসারিত করবে।

যাই হোক, এখন থেকেই সুভাষচন্দ্রের প্রভাব প্রতিপত্তি, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র মাধুর্যের গুণে সমগ্র পূর্বএশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। The magic name of Subhas Bose— সমগ্র পূর্বএশিয়ার অধিবাসীদের কাছে এক অভাবনীয় আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই ঝাঁসিরানী বাহিনীতে পূর্বএশিয়াবাসী বহু প্রদেশের ভারতীয় নারী স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন।

বাঙালী মেয়েদের মধ্যে শিপ্রা সেন, রেবা সেন, রাণু ভট্টাচার্য, মায়া গাঙ্গুলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সবাই বাঙালীর মেয়ে— রাইফেল হাতে নিয়ে এঁরা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয়েছিলেন। 'বিদ্রোহিনী মেয়ের রোজ নামচা' (Diary of a Rebel Daughter) থেকে আমরা জানতে পারি—এক জায়গায় ঝাঁসি বাহিনী ৪৮ ঘণ্টা শত্রুপক্ষকে রুখে রেখেছিল এবং লড়াইয়ে বিজয়িনী হয়ে তারা ঘাঁটিতে ফিরে এসেছিল। তাদের নৈতিক আদর্শ কতখানি উঁচু ছিল, সেটা এই বিদ্রোহিনী মেয়েটির কথায় বুঝতে পারা যায়:

I have already procured a small bottle of Potassium cyanide. If the Japs attempt to molest my body, I shall not be helpless. If you hear me beloved [The writer addresses her-husband] know that I shall not quake before the most ruthless torture. I shall keep the honour and prestige of your family name untainted.

পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ঝান্সিবাহিনীর মেয়েরা সম্মুখযুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি আদায় করেছিল নেতাজীর কাছ থেকে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সভাপতি সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী অর্থাৎ আজাদহিন্দ ফৌজের 'সর্বাধিনায়ক'এর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র পূর্ব-এশিয়ায় 'নেতাজী' নামে অভিহিত ও অভিনন্দিত হ'লেন। অনতিবিলম্বে ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে প্রিয়তম নেতা রূপে, তাদের গভীর প্রীতি, সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হলেন।

সুভাষচন্দ্রের মাতৃবিয়োগ

এই সালেই, অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রের সৌভাগ্যবতী জননী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী পরলোকগমন করেন। সুভাষচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগের পর আমরা একাধিক দিন আজাদহিন্দ স্টেশন থেকে বেতার যোগে তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন এবিষয়ের কোনো উল্লেখ করতে শুনি নি। শুধু স্নেহময়ী মাতৃদেবীর কথাই নয়, পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো ঘটনার উল্লেখমাত্রও তিনি কোনোদিন করেন নি। তাঁর মধ্যমভ্রাতা সুভাষগতপ্রাণ শরৎচন্দ্র, কুনুরে (মাদ্রাজ) দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন, এমন-কি একবার তাঁর জীবনের আশঙ্কাও হয়েছিল, কিন্তু সেকথার কোনো উল্লেখ করতে আমরা শুনি নি অথচ যেভাবে ঢাকাজেলের গোলমালের কথা[১] তিনি ১২ ঘন্টা পরেই বেতারে উল্লেখ করেছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি এখানকার সব খবরই পেতেন। জেলে যারা বন্দী হয়ে আছে তাদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি ক'রে অনেকবার তিনি বক্তৃতা করেছেন অথচ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরা কারাগারে অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করছিলেন— তাঁর সহযোগিতা করার অভিযোগে, তাদের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ও পারিবারিক কোনো ঘটনা সম্পর্কে কোনো উল্লেখই তিনি করেন নি— এইখানেই সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

Comrades behind the prison bars! Wait patiently. First of all you will enjoy the fruits of liberty, which the Indian Army of liberation will bring unto you ere long."

আজাদহিন্দ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (I. N. A. No 2) গঠন ও আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট বা স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর নেতাজী ঘোষণা করলেন—

For the first time since 1857, we have a Government of our own, recognised by so many powerful Allies abroad. For the first time since 1857, our countrymen outside India particularly in Asia and Europe are standing shoulder to shoulder with our freedom-fighters at home. For the first time since 1857, India is ripe for revolution. Last but not least, thanks to the ruthless exploitation— hunger, famine and starvation are further goading the Indian people on to revolution. The stage is, therefore, set for commencing the last war of Indian Independence.

অর্থাৎ, ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম আমাদের নিজেদের গভর্নমেন্ট হ'ল, এবং আমাদের সে গভর্নমেন্টকে বিদেশের শক্তিশালী বহু মিত্রশক্তি স্বীকার করে নিয়েছেন ; ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম, ভারতের বাইরে, বিশেষ করে এশিয়া ও ইউরোপে আমাদের স্বদেশীয়গণ, ভারতের মধ্যে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত যোদ্ধাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন ; ১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম, বিপ্লবের জন্য ভারতবর্ষ প্রস্তুত হয়েছে। নিষ্ঠুর শোষণকে ধন্যবাদ, অবশেষে ক্ষুধার তাড়না, মন্বন্তর ও অনাহার আজ ভারতবর্ষকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অতএব ভারতের শেষ মুক্তি সংগ্রামের জন্য আজ ক্ষেত্র প্রস্তুত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে স্থাপিত আজাদহিন্দ বা স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট, জাপান, জারমানি, ইটালি, স্পেন, শ্যাম, বর্মা, ফিলিপাইনস্, নানকিং, মাঞ্চুকু এবং আয়ার্ল্যান্ড প্রভৃতি স্বাধীন শক্তিপুঞ্জ কর্তৃক স্বীকৃত হ'ল। যতই দিন যেতে লাগল, পূর্বএশিয়ায় ভারতীয়দের সম্মান ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। নেতাজী যেন সকলের চোখ খুলে দিলেন। তাঁরই হাতে পূর্বএশিয়াবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বহু বীরের সৃষ্টি হ'ল ; তারা ক্রমশ অনুভব করতে লাগল, স্বাধীনজাতি হওয়ার মহত্ত্ব ও গৌরব কতখানি তারা সংকল্প করলে আর কখনো তারা কোনো বৈদেশিক জাতির, এমন-কি জাপানেরও দাস হতে যাবে না ; এমনি হ'ল তাদের পরিবর্তিত মনোভাব। সকলের দৃঢ় সংকল্প হ'ল— যতক্ষণ পর্যন্ত একটি মানুষও বেঁচে থাকবে ততক্ষণ তারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে যাবে।

এইভাবে ভারতীয় জতেীয় বাহিনীর শক্তিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। সম্মুখ সমরে তারা বিশেষ শক্তিমান বলে অনুমিত হ'ল। এমন-কি বেপরোয়া জাপানী সৈন্যদের মনেও এতে ভয়ের সঞ্চার হ'ল। তারা তাদের ভারত স্বাধীন করবার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এগিয়ে চলল— দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি। অবশেষে ভারত ও বর্মার সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসেনার বহুপ্রতীক্ষিত যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

নেতাজী 'জয়হিন্দ' অভিবাদন ধ্বনিতে সকলকে একত্রিত করলেন, তেজোদ্দীপ্ত জাতীয় সংগীতে অনুপ্রাণিত করলেন, ১২ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েনিয়ে 'বালসেনা' গঠন করলেন। এত কমদিনের মধ্যে এমনধারা ব্যাপক সংগঠনের ক্ষমতা এক সুভাষচন্দ্রেরই থাকা সম্ভব।

হেডকোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত

সিঙ্গাপুর থেকে ১৯৪৪ সালের ৭ জানুয়ারি, আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট ও ফৌজের হেডকোয়ার্টার্স রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়; উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষের যতটা সম্ভব নিকটে থাকা। পিছনের হেডকোয়ার্টার্স থাকে সিঙ্গাপুরে। তখন হুফুয়াং-এ ইঙ্গ-আমেরিকার আক্রমণ চলেছে ব'লে জাপানীরা এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করার পক্ষপাতী ছিল না। যাই হোক, ইম্‌ফলে আক্রমণের কল্পনা কার্যে পরিণত করা হ'ল, ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ঐ দিনই আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়ে চলল।

তারা অগ্রসর হয়ে চলল দৃঢ় সংকল্প নিয়ে, তাদের সংঘর্ষ বাধবে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে। তারা পাহাড়-পর্বত, নদনদী, সমতলভূমি পেরিয়ে, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এগিয়ে চলল সম্মুখের দিকে। হাতে হাতিয়ার, বুকে দুর্জয় সাহস, অন্তরে জ্বলন্ত দেশপ্রেম। কণ্ঠে কণ্ঠে তাদের ধ্বনিত হ'তে লাগল 'জঙ্গী' গীত :—

কদম্‌ কদম্‌ বঢ়ায়ে যা
খুশীকে গীত গায়ে যা,
ইয়ে জিন্দগী হৈ কৌম-কী
(তো) কৌম্‌ পর লুটায়ে যা ॥

তু শেরে-হিন্দ আগে বঢ়
মরনেসে ফিরভী তু ন ডর
আস্‌মান্‌ তক্‌ উঠাকে শির্‌
জোশে বতন বঢ়ায়ে যা ॥

তেরী হিম্মৎ বঢ়তী রহে	চলো দেহ্‌লী পুকারকে
খুদা তেরে শুনতা রহে	কৌমী নিশান্ সম্‌হালকে
জো সামনে তেরে চঢ়ে	লাল কিল্লে পে গাঢ়কে
তো খাক্‌মেঁ মিলায়ে জা ॥	লহ্‌রায়ে যা লহ্‌রায়ে যা ॥

নেতাজী তাঁর সৈন্যদলকে উৎসাহিত ক'রে বললেন :

There, there in the distance, beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land, the soil from which we sprang ; the land to which we shall now return.

Hark ! India is calling, India's Metropolis Delhi is calling, three hundred and eighty-eight millions of our countrymen are calling. Blood is calling to blood. Get up, we have no time to lose. Take up your arms, there in front of you is the road that our pioneers have built. We shall march along that road. We shall curve our way through the enemy's ranks, or if God wills, we shall die a martyr's death.

And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom,

"CHALO-DELHI"

ওই দূরে— বহুদূরে— নদীর পরপারে, পর্বত ও অরণ্য পেরিয়ে আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত দেশ— ওখানকার মাটিতে আমাদের জন্ম, ওই দেশে আমরা এখন ফিরে যাব।

শোনো, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদের ডাকছে, কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে— আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে।

ওঠো, সময় নষ্ট কোরো না, অস্ত্র নাও, তোমাদের সম্মুখে ওই পথ ; ওপথ নির্মাণ ক'রে গেছেন আমাদের অগ্রগামীরা— ওই রাস্তা দিয়ে আমরা অগ্রসর হয়ে চলব, শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের রাস্তা করে নেব, অথবা যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়— আমরা শহীদের মতো মৃত্যু বরণ করে যাব।

যে পথ আমাদের সৈন্যবাহিনীকে দিল্লীতে নিয়ে যাবে, আমাদের অন্তিম নিদ্রায় সেই পথকেই চুম্বন করে চলে যাব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।

আজাদহিন্দ্ ফৌজের সৈন্যগণ তাদের 'জংগীগীত' গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়ে চলল :—

অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে
রোকেন হম্ কিসীকে রুকে' হৈ' ন রুকেংগে ॥
ঝন্ডা তিরংগা লাল কিলে পে উড়ায়েংগে
'জয়হিন্দ'কে নারো সে ফলক কো হিলায়েংগে।
হিন্দোস্তাঁ মে হিন্দী হী অব রাজ করেংগে।
অব দিল্লী চলো···

ইম্ফল আক্রমণ

ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। জাতীয়বাহিনীর বীর সেনানায়কেরা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আজাদহিন্দ ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করছেন; প্রজ্বলন্ত দেশপ্রেমের বহ্নিতে ভারতের মুক্তিকামী আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ, পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে —জন্মভূমি ভারতের সীমান্তভূমির দিকে।

১৯৪৪ সালের ১৮ মার্চ তারিখে তারা ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করল। জাতীয়বাহিনীর তিনটি অংশ বা ব্রিগেড্, ব্রহ্ম-জাতীয়বাহিনীর তিনটি অংশ এবং কিছুটা জাপানী সৈন্য সংগে নিয়ে মোরাই, কোহিমা এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম দখল করার পর ইম্ফল বেষ্টন করে ফেলল। কিছুদিনের জন্য অবরোধ অবস্থায় থাকল, এই অধিকৃত স্থানগুলি। ভারতের পবিত্র মাটিতে লেঃ কর্নেল শা নওয়াজ কর্তৃক ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল ; নেতাজী বললেন—

"The soil has been sprinkled with our blood. The very air is sanctified by the breath of our dying heroes."

"ভারতের মৃত্তিকা আজ আমাদের রক্তে অভিষিক্ত— এখানকার বাতাস আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বীরগণের শেষ নিশ্বাসে আজ পবিত্র।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বর্ষার প্রাদুর্ভাবে এবং জাপান গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুতি বিমানপোতের সাহায্যের অভাবে রণসম্ভার ও খাদ্যাদির সরবরাহ ক্রমশ

বন্ধ হয়ে আসল। প্রধানত সেই কারণেই আজাদহিন্দ ফৌজকে পশ্চাৎ অপসরণ করে ফিরে যেতে হ'ল।

পূর্ব-এশিয়ায় সংগ্রামের শেষ অধ্যায়

ঠিক এই সময় ব্রিটিশবাহিনী বর্মা আক্রমণ করল। ভারতীয় জাতীয়বাহিনী তখন আত্মরক্ষায় নিযুক্ত। মিচিলা পতনের পর ব্রিটিশ চতুর্দশবাহিনীর দ্রুত অগ্রসর হওয়া দেখে জাপানীরা স্থির করলে তারা রেঙ্গুন ত্যাগ করে যাবে। ১৯৪৫ সালের ২৩ এপ্রিল সৈন্যাধ্যক্ষসহ জাপানবাহিনী রেঙ্গুন ত্যাগ করে চলে গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রকে ২৪ এপ্রিল রেঙ্গুন ত্যাগ করে যেতে হ'ল। যাবার সময় জাতীয়বাহিনীর খানিকটা অংশ রেখে গেলেন রেঙ্গুনে— ভারতীয়দের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য। রেঙ্গুন থেকে জাপানের অপসরণ এবং ব্রিটিশের আগমন এই মধ্যবর্তী সময়টায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এখানে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করেছিল এবং তাদের সতর্কতায় সে সময় কোনো চুরি ডাকাতি খুন বা লুঠতরাজ হয় নি। বর্মায় ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘের অনেকগুলি শাখা ভারতীয়দের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছিল। বর্মা থেকে যাওয়ার সময় ভারতীয় জনসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার কোনো দায়িত্বই ব্রিটিশবাহিনী পালন করে নি। কিন্তু আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের উপর তাদের কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করেছে। আজাদহিন্দ সৈনিকের উক্তিতে এবং নির্ভরযোগ্য অনেক বিবৃতিতেই এটা প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজী না থাকলে ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা ৯০ জন প্রাণ হারাত এবং তাদের সম্পত্তিরও কোনো চিহ্ন থাকত না।

বর্মায় ব্রিটিশ আসার পরে ঘটনাস্রোত দ্রুত বইতে লাগল। রেঙ্গুনে The National Bank of Azad Hind, ৯ মে তারিখে ব্রিটিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। স্বাধীনতাসংঘের সদস্যবৃন্দ ২৮ মে তারিখে বন্দী হলেন এবং সংঘের কাজকর্ম সেইসঙ্গে সব বন্ধ হয়ে গেল। দক্ষিণ-পূর্বএশিয়ার অন্য অংশে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি জাপানের পতন পর্যন্ত আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট ও আজাদহিন্দ ফৌজের কাজকর্ম চলতে লাগল। ২৪ এপ্রিল তারিখে টোকিও যাত্রার প্রাক্‌কালে সুভাষচন্দ্র বেতারযোগে পূর্বএশিয়াবাসীদের কাছে তাঁর বাণী

প্রকাশ করেন। আজাদহিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি এই ঘোষণাই তাঁর শেষ 'অর্ডার অফ দি ডে' বা নির্দেশনামা :—

It is with a very heavy heart that I am leaving Burma, the scene of the heroic battles that you have fought since February, 1944, and are still fighting. In Imphal and Burma we have lost the last round in our fight for Independence. But it is only the first round. We have many more rounds to fight. I am a born optimist and I shall not admit defeat under any circumstances, Our deeds in the battles against the enemy on the plains of Imphal, the hills and jungles of Arakan, and the oilfield area and other localities in Burma will live in the history of our struggle for Independence for all time.

Inquilab Zindabad
Azad Hind Zindabad
"Jai Hind"

চাকা ঘুরে গেল— 'অ্যাটম' বোমায় বিধ্বস্ত জাপান ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ শেষ হয়ে এল। ১৯৪৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশবাহিনীর ভারতীয় সৈন্যগণ মালয়ের নানাস্থানে জাহাজ থেকে নামতে শুরু করে দিল। এই মাসের মধ্যেই মালয় অধিকার সম্পূর্ণ হয়ে গেল। জাপানী মুদ্রা ও জমিজমাসংক্রান্ত আদানপ্রদান ব্রিটিশের এক কলমের খোঁচায় বাতিল হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘের সভ্যগণকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হ'ল।

এইভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের আর একবারের চেষ্টা আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একথা ঠিক যে সহস্র সহস্র ভারতীয় জাতীয় সেনার দুঃখকষ্ট, কারাগারের যন্ত্রণা ভোগ, সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকার ; সবার উপর দেশের মুক্তির জন্য তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জনের ফল আমরা হাতে হাতে পেলাম না বটে, তারাও চোখে দেখতে পেল না তাদের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতমাতার সুপ্রসন্ন মুখচ্ছবি— কিন্তু আমরা জানি, তাদের ত্যাগ, তাদের একবিন্দু রক্তদানও বিফলে যায় নি। আমরা আজ কল্পনা করতে পারি, ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে তারা যখন মার্চ করে চলত দুর্গম গিরিদরি প্রান্তর ও অরণ্যপথে— তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে তাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত, বুক ফুলে উঠত তাদের

সাহসে, আনন্দে ও উৎসাহে। তারা চিরদিন অমর হয়ে থাকবে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মালিন্যমুক্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে।

নেতাজীর দ্বিতীয়বার মৃত্যু

২৩ আগস্ট তারিখে জাপানী সংবাদে নেতাজীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা আমরা জানতে পেলাম। এই সংবাদে বলা হয়েছিল—

"Mr. Bose, head of the Provincial Government of Azad Hind, left Singapore on August 10, by air for Tokyo for talks with Japanese Government. He was seriously injured when his plane crashed at Taihoku airfield at 2 p.m. on August 18. He was given treatment in hospital in Japan, where he died at midnight.

অর্থাৎ, আজাদহিন্দ সরকারের সর্বপ্রধান নায়ক মিঃ বসু ১০ আগস্ট তারিখে বিমানযোগে সিঙ্গাপুর ত্যাগ ক'রে জাপানী সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য টোকিও অভিমুখে রওনা হন। তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে ১৮ আগস্ট বেলা ২টার সময় বিমানপোতখানি ভেঙে পড়ায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। জাপানের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা হয়, কিন্তু সেখানেই মধ্যরাত্রে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আমরা কিন্তু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন— কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। সুভাষচন্দ্র ভারতের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক বলে চিরদিন দেশবাসী তাঁকে পূজা করবে। আমাদের কাছে তাঁর মৃত্যু নাই। আমাদের অন্তরের ইচ্ছাই মহাত্মা গান্ধীর কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে :

I believe Subhas is still alive. He is hiding time and will come out at the right moment. Long live Subhas.

অর্থাৎ, আমি বিশ্বাস করি সুভাষ বেঁচে আছেন। তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করছেন, ঠিক সময়েই তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। সুভাষ দীর্ঘজীবী হোন।

১১ জানুয়ারি (১৯৪৬) গৌহাটিতে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন :

I did not think Subhas Babu is dead. He is hiding somewhere and would come in time.

অর্থাৎ আমি মনে করি না যে সুভাষবাবু মৃত। তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন, সময় হলেই আত্মপ্রকাশ করবেন।

ক্যাপ্টেন এহ্‌শান কাদিরের কথা আমরা নানাস্থানে বলেছি। তিনি ৪ মে (১৯৪৬) তারিখে লাহোরের এক সভায় বললেন—

The mission was wasting nation's time. Once the Tamasha was over, the country would march under Netajee's leadership. Netajee is not dead. We are being asked by our enemies where is Subhas Bose. Why should we tell them. Only time will tell it. অর্থাৎ মন্ত্রীমিশন অযথা জাতির সময় নষ্ট করছে। এই তামাশা শেষ হয়ে গেলেই নেতাজীর নেতৃত্বে দেশ আবার অগ্রসর হয়ে চলবে। নেতাজী মারা যান নি। শত্রুপক্ষ জিজ্ঞাসা করে, "সুভাষ বসু কোথায় ?" অমরা সে কথার উত্তর দেব কেন ? সময়ই একমাত্র সে প্রশ্নের জবাব দেবে।

আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ অফিসারগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেন নেতাজী জীবিত আছেন। আজ আমাদেরও তাই বিশ্বাস। নেতাজী যে জীবিত আছেন এ বিশ্বাস দেশে ও বিদেশে কতটা প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নে মুদ্রিত কতকগুলি পত্রান্তরে প্রকাশিত সংবাদে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ ?

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

ওয়ার্ধা, ৬ মে— "আপনি কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ?" মাদ্রাজগামী গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক এক্সপ্রেসে খাদির পায়জামা পরিহিত জনৈক স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘশ্মশ্রুমণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিয়া আমি প্রশ্ন করি। ভদ্রলোক চতুর্দিকে চাহিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় থাকেন ?" আমি জবাব দিলাম, "আমি ওয়ার্ধায় থাকি এবং আমি সংবাদপত্রের একজন সংবাদদাতা।" ভদ্রলোক তখন সেবাগ্রম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া বলিলেন, "এমন দিন আসিবে যেদিন আপনারা আপনাদের প্রিয় নেতাজীকে ভারতবর্ষে দেখিতে পাইবেন। জাতির তাঁহাকে লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করেন এবং বেতুলে (নাগপুর ও ইটাকীর মধ্যে) নামিয়া যান। আমার কোনো সন্দেহ নাই যে উনি নেতাজী। আমি তাঁহার হাতে কতকগুলি সংবাদপত্র দেখিতে পাই। (আনন্দবাজার ৭ মে, মঙ্গলবার, ১৯৪৬)

ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানের কথা

দক্ষিণভারত আরকোনামে কে. এস. এম. স্বামী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

"গত ১৮ এপ্রিল তারিখে বোম্বাই এক্সপ্রেসের তৃতীয়শ্রেণীর এক কামরায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখিয়াছি বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি সেই সময় মুসলমানের পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়া আমাকে বসিবার জন্য ইংগিত করিলেন।"

গত ২১ এপ্রিল তারিখে কুইলনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে লে. কর্নেল লক্ষ্মী বলেন, "সম্ভবত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন, তবে রাশিয়া অপেক্ষা চীনদেশেই তাঁহার অবস্থানের সম্ভাবনা বেশি।"

"লন্ডন, ২৫ এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ, ইংলন্ড ও আয়ারল্যান্ডের অনেকেরই দৃঢ় ধারণা, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ

করিবেন ; ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আর দীর্ঘদিন প্রচ্ছন্ন থাকিবেন না। সকলেরই দৃঢ় অভিমত এই যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু আত্মপ্রকাশ করিলে কর্তৃপক্ষের তাঁহাকে স্পর্শ করিবার সাহস হইবে না। ডা. বা ম'র মুক্তি ও জেরুজালেমের ভূতপূর্ব মুফতির দৃষ্টান্তকে এই ধারণার পক্ষে যুক্তি হিসাবে উপস্থিত করা হইতেছে। সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীগণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষীয় মহলের অনেকেই তাঁহার মৃত্যু অপেক্ষা জীবিত থাকার উপরই বেশি আস্থাশীল। ব্রহ্ম, মালয় ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত অনেকেই এই ধারণার বশবর্তী যে, শ্রীযুক্ত বসু খুব সম্ভব হিমালয়ের কোথাও আত্মগোপন করিয়া আছেন।"

২৭ এপ্রিল তারিখের 'ব্লিৎস' পত্রিকায় সিংগাপুর হইতে এক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবিত থাকার ও নানাস্থানে ঘোরাফেরা করার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার ভারতে অবস্থানের নানা গুজব সিংগাপুরে সমর্থিত হয় নাই। কম্যুনিস্ট-অধিকৃত চীন, ফরাসী, ইন্দোচীন ও মালয়ের বহু দায়িত্বশীল লোক তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একবার তিনি নাকি রুশ সাবমেরিনযোগে ইন্দোনেশিয়াতে গিয়া তথাকার বিদ্রোহী নেতাদের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালান।

মালয়ের জনৈক সংবাদদাতা 'ব্লিৎস' পত্রিকার জন্য বাণী চাহিলে সুভাষচন্দ্র নিম্নলিখিত বাণী দেন :—

"প্রকৃত বিপ্লবী সে, যে নিজ আদর্শকে ন্যায়সংগত বলিয়া বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা পোষণ করে যে তাহার সেই আদর্শের জয় অবশ্যম্ভাবী। ব্যর্থ বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে হতাশ হইয়া পড়ে তাহাকে বিপ্লবী বলা যায় না। বিপ্লবীর আদর্শ হইতেছে 'শ্রেষ্ঠের জন্য আশা করো, কিন্তু নিকৃষ্টের জন্য প্রস্তুত থাকো।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি সংগ্রাম চালাইয়া যাই, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠিকমতো চাল দিতে পারি, তাহা হইলে স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হইব। কিন্তু তাই বলিয়া দৈবক্রমে ব্যর্থ হইলে আমাদের নিরাশ হইলে চলিবে না। যদি বিপর্যয়ই ঘটে এবং ভারত স্বাধীন না হয় তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে আমাদের পরিকল্পনা হইতেছে ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করা। তাহাতেও যদি আমরা ব্যর্থ হই তখন তৃতীয় মহাসমর আমাদিগকে স্বাধীনতার জন্য আঘাত হানিবার সুযোগ দিবে। এই মহাসমর শেষ হইবার দশ

বৎসরের মধ্যেই যে সেই তৃতীয় মহাসমর বাধিবে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। ভারতের স্বাধীনতা অবধারিত। কখন এই স্বাধীনতা আসিবে, সেই সময়টাই অনিশ্চিত। তবে খুব বেশি করিয়া ধরিলেও আর কয়েক বৎসর মাত্র লাগিতে পারে। অতএব আমরা নিরাশ হইবই বা কেন এবং আপসের জন্য বড়োলাটের বাড়ি ছুটাছুটি করিবই বা কেন? বিপ্লবী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হইতেছে স্বাধীনতার নিশান উড্ডীন রাখা এবং দিল্লীর লাটপ্রাসাদের উপর তাহা সগৌরবে শোভা না পাওয়া পর্যন্ত রক্ষা করা।"

পাটনা ২৯ এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ নালন্দার জনৈক শ্রমিক কয়েকদিন পূর্বে বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেলওয়ের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুকে অবতরণ করিতে দেখেন। এই সময় তাঁহার পরিধানে খাকির হাফ্‌শার্ট, হাফপ্যান্ট এবং ক্যানভাসের জুতা পায়ে ছিল।

আলফ্রেড ওয়াগের বিবৃতি

ব্রিটিশ গোয়েন্দা-পুলিসের তৎপরতা

'শিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা মি. আলফ্রেড ওয়াগ উপযুক্ত নজির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ফরমোসার অন্তর্গত তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন নাই। মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবার চারদিন পরে তাঁহাকে ইন্দোচীনে দেখা গিয়েছিল। মি. আলফ্রেড ওয়াগ আরো জানাইয়াছেন যে, ইন্দোচীনে একজন ব্রিটিশ-ভারতীয় গোয়েন্দার সহিত তাঁহার ঘটনাচক্রে দেখা হয়। তাঁহার নিকট হইতে তিনি যে-সমস্ত গোপনীয় সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করেন না এবং তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য চতুর্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করা হইতেছে।

কলিকাতা পুলিসবিভাগের একজন অফিসার নেতাজী জীবিত অথবা মৃত —সেই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে প্রেরিত হন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে মি. ওয়াগ প্রশ্ন করেন, "সুভাষবাবুকে দেখিবামাত্র গুলি করিবার জন্যই কি আপনার প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে?" ইহাতে উক্ত অফিসার থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকেন এবং তাঁহার সহকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন।

মি. আলফ্রেড ওয়াগ লিখিতেছেন, আজ একজন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পিছনে ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিতেছে। ভারতবর্ষে পরপর যে কয়টি হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে উহার পরিণাম ও বিপুল হতাহতের সংখ্যা ছাপাইয়া একটি প্রশ্নই আজ সরকারি ও বেসরকারি মহলের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। গভর্নমেন্ট আশঙ্কা করেন যে, একজন গণ-বিদ্রোহের নেতা শীঘ্রই আবির্ভূত হইয়া এক বিরাট বিপ্লবের নেতৃত্ব করিবেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনকভাবে ভারতের রাজনৈতিক মীমাংসার আশা ব্যর্থ হইবে। তাই পৃথিবীব্যাপী গোয়েন্দা পুলিস খুঁজিয়া ফিরিতেছে: "সুভাষচন্দ্র বসু কি বাঁচিয়া আছেন?"

নেতাজী ভারতে প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন

জাপ নিউজ এজেন্সি কর্তৃক নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবার পর পাঁচমাস ধরিয়া আমি এশিয়ার সর্বত্র সুভাষচন্দ্র বসুর অনুসন্ধান করিয়াছি এবং বিভিন্ন ঘটনা ও প্রমাণপঞ্জি হইতে আবিষ্কৃত এইরূপ এক তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে পারি যে, 'মৃত ব্যক্তিটি' (?) ভারতে প্রত্যাবর্তনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। সুভাষচন্দ্র যদি কোনোরূপে প্রতারিত না হন অথবা ঘটনাক্রমে কিংবা ইচ্ছা করিয়া গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত না হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম কার্য হইবে ভারতে এক বিরাট বিপ্লবের উদ্যোগ করা। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-বিরোধী দলগুলি সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্য তলে তলে এইরূপ আয়োজন করিতেছেন।

কোনো আদালত তাঁকে দণ্ড দিতে পারে না

সুভাষচন্দ্রের ভারতে প্রত্যাবর্তনের বিপদ সম্পর্কে কোনো উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ জেনারেল বলেন, যদি সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হইয়া ভারতবর্ষে জীবিত অবস্থায় নীত হন অথবা তাঁহার গুপ্ত আশ্রয়স্থল হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হয়, তাহা হইলে ভারতের কোনো আদালতই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে সাহস করিবে না, জাপানীদের পক্ষে যোগ দিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধে মৃত্যু-

দন্ড প্রদানের কথা তো দূরের কথা। তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোনো সামরিক আদালতে তাঁহার দন্ড দিবার চেষ্টা হইলে দেশব্যাপী বিপুল বিক্ষোভ ও হাংগামা অপরিহার্য। যদি তাঁহাকে জেলে আটক করিয়া রাখার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে তিনি শহীদ হইবেন এবং সহানুভূতিশীল ধর্মঘট, আইনঅমান্য আন্দোলন এবং বিক্ষোভ ও অবিরত দাংগাহাংগামার ফলে সেই প্রচেষ্টা আরম্ভেই শেষ হইবে।

আমি উক্ত জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আইন কিংবা বিশ্বের ন্যায়-বিচারের দিক হইতে আপনি তাঁহার কার্যকলাপ ন্যায়সংগত বলিয়া মনে করেন কিনা?" তিনি বলিলেন, এশিয়ার ন্যায়বিচার কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নহে, সমস্ত জনগণের সহিত উহার সম্পর্ক আছে। সুভাষ বসু জীবিত কিংবা মৃত তাহাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু যখন তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তখন তাঁহাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাইবে। ব্রিটেন অথবা ভারত গভর্নমেন্ট কেহই তাহাকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে দিতে চায় না, কারণ তাঁহারা জানেন সেরূপ অবস্থায় তিনি দেশে রক্তপাত, আতঙ্ক ও বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিবেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে ফিরিয়া চায়

অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়গণ জর্জ ওয়াশিংটনরূপে তাঁহাদের নেতাজীকে ফিরিয়া পাইতে চান। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুইবার নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিসবিভাগের একজন অফিসার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজীর সন্ধান করিবার জন্য প্রেরিত হন। তিনি আমাকে খোলাখুলিভাবে বলিলেন যে, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে সম্ভবত নেতাজীর মৃত্যু হইয়াছে। ভদ্রলোক পুলিসবিভাগের লোক বলিয়া আমি বিভিন্ন সূত্র হইতে যে-সমস্ত সংবাদ আহরণ করিয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম না। অফিসারটি বলিলেন যে, তিনি সুভাষচন্দ্রের দেহভস্ম টোকিওতে আনয়ন করার কোনো সংবাদ পান নাই। কিন্তু মার্কিনমহলের বিশ্বাস, নেতাজীর দেহভস্মের বিবরণ সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা; কারণ, নেতাজীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও ব্যক্তি-গত জিনিসপত্রের কোনো প্রমাণ নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সুভাষচন্দ্রকে দেখিবামাত্র আপনি কি তাঁহাকে গুলি করিবেন? আপনার প্রতি কি এরূপ

আদেশ দেওয়া হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, "ইহা গোপনীয় সরকারী ব্যাপার। এ বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করিতে আমি অস্বীকার করিতেছি।"

ডা. লক্ষ্মী স্বামীনাথন আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধুদের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, সুভাষচন্দ্র একজন চীনা জেনারেলের অতিথিরূপে দক্ষিণচীনে আগমন করেন। উক্ত চীনা সেনাপতির শিবির ব্রিটিশ সামরিক মিশনের খুব নিকট। জায়গাটির নাম পোসে। আমি ভাবিতেছি যে, উক্ত অফিসারটি আমাকে এই বিষয়টি মন হইতে দূর করাইবার জন্য মিথ্যা বলেন নাই তো ? প্রকাশ, এই স্থান হইতে নেতাজী হ্যানয়স্থিত আনামী গভর্নমেন্টের কোনো কোনো বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তাঁহারা নেতাজীর আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টকে জাপানের তাঁবেদার বলিয়া মনে করেন না। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রকাশ, আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট ঘটনাক্রমে জাপানীযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে মিত্রবাহিনীর বিরোধিতা করে নাই। তাঁহারা বলেন, সুভাষচন্দ্রের বাহিনী কখনো মার্কিন বাহিনীর সহিত মুখামুখি হয় নাই। এই বিবৃতির সত্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। তাঁহারা আরো বলেন, যেহেতু সুভাষচন্দ্রের গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চান, সেইজন্য আনামী সরকার কেবল নেতাজীকে নহে এমন-কি যে-কোনো ভারতীয় জাতীয়বাহিনীকে ইন্দোচীনের আনামী-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আশ্রয় দিয়াছিলেন।

নেতাজীর শেষ বাণী

একজন আনামী আমাকে সৈন্যবাহিনীর প্রতি প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের শেষ বাণী প্রদান করেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে,(স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে ব্রহ্মদেশে তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আরো অনেক সংগ্রাম করিতে হইবে।)

ইহার অর্থ কি ? সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা যদি তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় ভারতে ফিরাইয়া আনিতে পারেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া ফেলিবে। সৈন্যদল ও নাবিক, রাজনৈতিক নেতা ও শ্রমিকগণ একটি বিরাট বিপ্লব ঘটাইবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তি তিরোহিত হইতেছে। অধৈর্য ভারত রক্তস্নান করিবে

এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী সংগ্রাম করিবে। সুভাষচন্দ্র শীঘ্র অথবা একবৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবেন। কিন্তু ফিরিয়া আসিলে যোগাযোগকারীগণ তাঁহাকে সমর্থনের জন্য প্রতিরোধ আন্দোলন করিবেন। ১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্রের বাণী লইয়া প্রথম যে দল সাবমেরিনযোগে মালাবার উপকূলে অবতরণ করিয়াছিল তাহাদের প্রতি নেতাজীর নির্দেশ ছিল বিপ্লবের জন্য কার্য করা।

ভারতসীমান্তে গোয়েন্দা পুলিসের তৎপরতা

'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন নেতাজীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমগ্র ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে দিবারাত্র পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরো জানা গেল এই ব্যাপারে বিলাতের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন বিশেষজ্ঞ গোয়েন্দা এবং বিভিন্ন প্রদেশের বহুসংখ্যক গোয়েন্দা অফিসার ভারতসরকারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে কার্য করিতেছেন। নেতাজী পাছে কোনোপ্রকারে ভারতে প্রবেশ করেন তাহার জন্য এই ঢালাও ব্যবস্থা ভারতসরকার করিয়াছেন। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের উপজাতিদিগের এলাকায় ঢোল শোহরতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ফকিরের ছদ্মবেশে একজন সুপুরুষ দীর্ঘদেহ ভারতীয় রাজাকে যদি কেহ ধরাইয়া দিতে পারে তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। সীমান্তের গ্রামগুলিতে এই ঘোষণার সহিত নেতাজীর বৃহদাকার ফোটোও বিলি করা হইতেছে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা এই সংবাদ প্রকাশ করিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা এই : "উপরোক্ত সংবাদটি আমাদের শিলং অফিস হইতে তার-যোগে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা আমাদের নিকট আজও পেঁছে নাই। পরে এই সংবাদ বিশেষ প্রতিনিধি মারফত আমাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে।"

নেতাজী জীবিত না মৃত?

কর্নেল হবিবর রহমানের রহস্যজনক উক্তি

লাহোরে, ১ আগস্ট :— নেতাজী বাঁচিয়া আছেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে— এই গুজব সম্বন্ধে কর্নেল হবিবর রহমানের কোনো বক্তব্য আছে কিনা— এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "বর্তমানে আমি অধিক কিছু বলিতে চাই না।"

স্মরণ থাকিতে পারে কর্নেল রহমান নেতাজীর শেষ বিমানযাত্রার সংগী ছিলেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত প্রশ্ন পেশ করা হইয়াছিল। সম্মেলনে জাতীয়বাহিনীর মেজর জেনারেল কিয়ানী, মেজর জেনারেল আজিজ আহম্মদ, কর্নেল হবিবর রহমান, ক্যাপ্টেন সায়গল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকরা যখন বলেন যে, কর্নেল রহমানের উত্তরে রহস্য আরো ঘনীভূত হইবে। তখন মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি বলেন, "তবে এইরূপ প্রশ্ন করেন কেন? নেতাজী মারা গিয়াছেন বলিয়া হবিবর রহমান যাহা বলিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাহা বিশ্বাস করি না। যে অবস্থাতেই হোক যাহারা সুভাষচন্দ্রকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, তাহাদের নিকট সুভাষবাবু সম্বন্ধে হবিবর রহমান কোনো খবর ব্যক্ত করিবেন, এ আপনারা কেমন করিয়া আশা করিতে পারেন?" কাজেই অবস্থা এইরূপে দাঁড়াইল যে, কর্নেল রহমান ইতিপূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বেশি আর কিছু বলিতে চান না। (এ. পি.)

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত উল্লিখিত সংবাদগুলি 'ঘটনা'ও হতে পারে, 'রটনা'ও হতে পারে। এই সংবাদগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে দেশে ও বিদেশে নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাস করে না। জাপান-প্রবাসী একজন বাঙালী ভদ্রলোকও (মি. লাহিড়ী) তারিখের গরমিল দেখিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে নেতাজীর মৃত্যু হয় নি। (নেতাজীর সহযাত্রী কর্নেল হবিবর রহমান পৃথক হাসপাতালে ছিলেন— কাজেই তাঁর পক্ষেও অনুমান ছাড়া নিশ্চয় করে এ বিষয়ে বলা সম্ভব নয়।) জাতীয়বাহিনীর সেনানায়কগণের বিবৃতিতেও নেতাজী বেঁচে আছেন এই বিশ্বাসই প্রকাশ পায়। আমরাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে তিনি বেঁচে আছেন। তিনি আবার ফিরে আসবেন।

"মনে হয় তুমি কখন আসিয়া দাঁড়াবে আমার কাছে
চির পরিচিত স্মিত সুহাস্যে করিবে আলিঙ্গন,
তোমার কণ্ঠে সেই আহ্বান হৃদয় আমার নাচে,
নয়নের জলে তোমার পথে কি দিয়েছি আলিম্পন?"

পূর্বানুবৃত্তি

আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা

আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিস্তারের বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটি সুন্দর গঠনমূলক ব্যাপক পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠন বিভাগ, সহজপ্রাপ্য কাঁচা মালের জন্য বৃহৎ পরীক্ষাগারে (Laboratory) খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যে 'ভিটামিন' দ্রব্য প্রস্তুত ক'রে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা, এ-সব তো ছিলই। 'জাতীয় সংগীত' শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত গায়ক ও বাদকের দল নিযুক্ত ক'রে সেনাবাহিনীর উৎসাহ উদ্দীপনাকে সজাগ রাখার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, সেনাবাহিনীর বাসস্থানের ব্যবস্থা, খাদ্য ও পোশাক সরবরাহ, অস্ত্রশস্ত্র গুলিগোলার মজুত ও খবরদারি করার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ ; এ-সবও ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সেই অশান্ত পরিবেশের মধ্যেও বিদ্যাপীঠের 'অধ্যক্ষ' সুভাষচন্দ্র, পূর্বএশিয়ার 'নেতাজী' যে পরিমাণ যত্ন নিয়েছিলেন এবং তাঁর চেষ্টা যে পরিমাণ সফল হয়েছিল সে বিষয় জেনে বিস্মিত হতে হয়।

বাঙলাদেশে জাতীয়শিক্ষার পরিকল্পনা ও প্রসার সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সংকল্প তখন সিদ্ধ হয় নি, কারণ 'কলিকাতা বিদ্যাপীঠ' ও 'সর্ববিদ্যায়তন' গড়ে উঠতে-না-উঠতেই তাঁকে জেলে যেতে হ'ল, এবং দ্বিতীয়বার যখন বহু চেষ্টায় রায়বাগান স্ট্রীটে এই প্রতিষ্ঠান দুটির কাজ পুনরায় আরম্ভ করা হ'ল ঠিক তার অব্যবহিত পরেই আবার সুভাষচন্দ্রকে সরে যেতে হ'ল কংগ্রেসের কাজে।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার অধিকাংশই কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হয়েছিল ; আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থায়। Religious Instruction by the Department of Education and Culture—Azad Hind Government নামক প্রচারপুস্তিকার আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে আমরা এ বিষয়ে অনেক কথা জানতে পারি। এই পুস্তিকাখানি রেংগুন থেকে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এর ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া ধর্মশিক্ষা আমাদের শিক্ষার বিষয়ীভূত হবে কি না এই বহু পুরাতন জটিল প্রশ্নের উত্তর এতে পাওয়া যায়। দেশাত্মবোধের পরিপন্থী মনে ক'রে আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্টের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া বর্জন করা হয়েছিল।

এই শিক্ষাপ্রদানের কার্যক্রমে ভারতের একতার উপর যে বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল এবং জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মের পার্থক্যকে আমল দেওয়া হয় নি এটা সমীচীনই হয়েছিল বলে আমাদের মনে হয়।

জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বসময়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, কি আর্থিক ব্যাপারে, কি অভারতীয়দের সংগে আদানপ্রদান সম্পর্কে আমি প্রথমত ভারতবাসী এই ধারণা যদি শিশুকাল থেকে জন্মে তার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হ'ত— পাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্মশিক্ষার দ্বারা জাতীয়তাবোধ ধর্মঘেঁষা হয়ে সম্মিলিত ভারতের মূল ঐক্যবোধের অন্তরায় ঘটায়। এজন্য পূর্বএশিয়ার অসংখ্য জাতীয়বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষাকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দেওয়া হয় নি।

লালা লাজপৎ রায়ের এই কথাগুলি দিয়ে পুস্তকখানির সূচনা:

"In every living community inspired by national ideas and ambition, the national consciousness expresses itself through the school as perhaps through no other institution."

অর্থাৎ, জাতীয় ভাবুকতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত প্রত্যেক প্রাণবান সমাজে বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে যেমন জাতীয়তাবোধ উন্মেষ লাভ করে, এমন আর অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করে না।

ভারতীয় জাতীয়বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক শ্রেণীতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া উচিত কি না এই প্রশ্ন একদিন উঠেছিল, তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্যই বোধ হয় এই পুস্তকখানির প্রকাশ। এ থেকে জানা যায় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয়শিক্ষার বিভাগীয় পরিকল্পনাতে— পুঁথিগত বিদ্যার চাইতে সর্বপ্রথম দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ও চরিত্রগঠনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল বেশি। এ শিক্ষার আদর্শ ছিল, 'মানুষ হও'। সেই অনুসারে ভারতের সর্বজাতির মিলন ও ঐক্যই যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন এ ধারণা যদি শিশুর মনে প্রথম থেকে বদ্ধমূল করতে না পারা যায়, তা হলে সে শিক্ষাকে কোনো রকমেই জাতীয়শিক্ষা বলা চলে না।

"No scheme of National Education could be considered complete which does not have the active teaching of patriotism and nationalism as one of the subjects in its regular course of study.

It is an absolute necessity that the little Indian mind from its very infancy be taught to be an Indian first, last and all the time

in all political and economic matters and its relation with non-Indian."

সুতরাং যদি কোনো পাঠ্যবিষয়ের শিক্ষা দ্বারা, তা সে বিষয়টি যত ভালোই হোক-না-কেন, যদি তাতে ছাত্রের মূল শিক্ষণীয় বিষয় 'জাতীয়তা' শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে তা হলে তা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

এইপ্রকার শিক্ষার আদর্শ সম্মুখে রেখে সেখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ভারতবর্ষের গল্প পড়ানো অবশ্যপাঠ্য বলে নির্ধারিত হয়েছিল। যাতে করে শিশুর সম্মুখে ঐক্যবদ্ধ ভারতের একটি মিলিত আদর্শ ধরা যায় এবং গভীর ও ঐকান্তিক দেশপ্রীতির ধর্মকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়; সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যে শিক্ষায় ভারতবাসী ও ভারতবাসীর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হ'তে পারে, এমন শিক্ষাকে বর্জন করা হয়েছিল।

ভারতীয় হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান, শিখ প্রভৃতি যে-কোনো ধর্মের উপাসকই হোক-না-কেন, তাদের অনুভব করতে হবে যে, ভারতবর্ষ সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের দেশ এবং তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করছে এই সার্বভৌম ঐক্যের উপর। এটাও অনুভব করতে হবে যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও রুচির বিষয় মাত্র। তারপর এই প্রচারপুস্তিকায় নেতাজী বলেছেন :—

আমাদের মনে করতে হবে যে বিভিন্নধর্মের পথ বহু ঊর্ধ্বে একই মহান লক্ষ্যের দিকে চলেছে এবং সেই উচ্চলক্ষ্যে উপস্থিত হয়ে দেখা যাবে যে সেখানে আর কোনো পথ নেই, সেখানে এক বিরাট অবিভক্ত সত্তা বিরাজ করছে। ভারতমাতা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পার্থক্য মানেন না।

অতএব সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বাধা সরিয়ে দিয়ে স্কুল, কলেজ, আদালত ও আইনসভাতে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষত এ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম করতে হবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে, যেখানে শিশু সর্বপ্রথম বিবিধ বিষয়ের শিক্ষালাভ করবে। অতএব জাতীয় বিদ্যামন্দিরে কোনো বিশেষপ্রকার ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলে সেটা জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতবাসীর মধ্যে ধর্মসম্পর্কে দলাদলি আছে, কিন্তু সে দলাদলি বস্তুতপক্ষে অলীক— সত্য নয়, তাকে সৃষ্টি করেছে, জিইয়ে রেখেছে স্বার্থান্বেষীর দল। আজাদহিন্দ সরকারের অধীনে মুসলিম

বিদ্যালয়, হিন্দু বিদ্যালয়, খ্রীস্টান বিদ্যালয়গুলি কেন জাতীয়বিদ্যালয়ে (অন্তত এই পূর্বএশিয়ায়) পরিণত হবে না, এ কথা আমি বুঝতে অক্ষম। এই বিদ্যালয়গুলি বর্তমান অবস্থাতে পরিচালিত হতে দিলে চিরন্তন বৈষম্য ও বিরোধই জাগিয়ে রাখা হবে। কারণ দেখা গিয়েছে যে ধর্ম অনুসারে পৃথক বিদ্যালয়ের সার্থকতা স্বীকার করে নিলে তার সংগত পরিণতি হবে পৃথক মুসলিম ভারত, হিন্দুভারত এবং খ্রীস্টানভারত ইত্যাদি। আমরা যদি প্রত্যাশা করি এইপ্রকার পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে আমাদের ছাত্রেরা দেশ-প্রেমিক হয়ে বেরিয়ে আসবে তা হলে তাতে আমাদের নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হবে। কারণ যে স্বার্থে সেখানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে জাতীয়তাবোধের দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

"It is in the teaching of history and religion more than in anything else that instruction can become positively harmful to nationalism and patriotism as the teaching of these touches the very interests that maintain such institutions."

অর্থাৎ, অন্য বিষয় অপেক্ষা বিদ্যালয়ে বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং ধর্মবিষয়ের শিক্ষা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার পক্ষে হানিকর হতে পারে। কারণ এইপ্রকার শিক্ষার সংগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানর পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থ জড়িত থাকে।

সেজন্য বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীতে দেশপ্রেমপূর্ণ ইতিহাস শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দুইটি প্রধান বিষয় সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের বীরবৃন্দের মিথ্যা ইতিহাস যেন শিক্ষা দেওয়া না হয় এবং সত্যঘটনাকে যেন আমরা নির্বিচারে প্রকাশ করতে পারি। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হবে উদার জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ থেকে।

হিন্দুদের উচিত মুসলিমবীর, সাধু ও লেখকদের সম্পর্কে গৌরব অনুভব করতে শেখা ; এবং মুসলিনদেরও এ উদাহরণ অনুসরণ করা কর্তব্য। এতে ক'রে শুধু যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বৃদ্ধি হবে তাই নয়, সেটা চিরস্থায়ী হবে যদি আমরা ভারতবাসীকে একেবারে শিশুকাল থেকে এইপ্রকার শিক্ষা দিতে পারি ; কারণ বিশ্বাস এবং ধারণা শিশুকালেই মনের মধ্যে দৃঢ়ীভূত হয়ে সংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়, তারপর আর কোনো শিক্ষা বা জ্ঞান সে ধারণা ও বিশ্বাসকে টলাতে পারে না।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যদি বিশেষ কোনো ধর্ম সম্বন্ধে (অথবা সকলের প্রতি প্রযোজ্য নয় এমন কোনো বিষয়) শিক্ষা দেওয়া হয়— সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তাতে কতকগুলি মিথ্যা ধারণা, ধর্মভাবাপন্ন জাতীয়তা (Religious Patriotism) এবং সাম্প্রদায়িক জাতীয়তা (Communal Patriotism) বোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই দুটি অনিষ্ট যাতে না ঘটে সেজন্য জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়ার সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশাত্মবোধক শিক্ষাদানের ভিত্তি যেন সমগ্রভাবে ভারতপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং শিক্ষার্থীরা যেন বুঝতে পারে যে এই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর আমাদের যে প্রীতি সেটা পল্লীপ্রীতি, শহরপ্রীতি, প্রদেশপ্রীতি, ধর্মপ্রীতি, জাতি ও নরনারীর প্রতি প্রীতিভাবাপন্ন হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যের মধ্যে এই মনোভাবকে দৃঢ় করার মতো উপাদান যথেষ্ট আছে।

নানকের জন্য যদি ভারতবর্ষ গৌরব অনুভব করে তা হলে খৃষ্ট সম্পর্কেই বা গৌরববোধ করবে না কেন ? তার অশোক ছিল, আকবরও ছিল। যেমন তার চৈতন্য ছিল, তেমনি ছিল কবীর। যেমন তার ছিল হর্ষ, তেমনি ছিল শের শা। একদিকে যেমন ছিল তার বিক্রমাদিত্য অন্য দিকে তেমনি ছিল তার শাজাহান। প্রত্যেক হিন্দু বীরের পাশে ভারতের গৌরব করার মতো আছে মুসলিম বীর। যদি টোডরমল্লকে নিয়ে গৌরবান্বিত হতে হয়, সমভাবেই গৌরবান্বিত হব আমরা আবুল ফজলকে নিয়ে। একদিকে আছে খুসরো, ফৈজী, গালিব, জেক্‌সু, ফেরিস্তা, গাণিমত, অন্য দিকে আছে বাল্মীকি, কালিদাস, তুলসীদাস, রামদাস, চাঁদ নাসিম ও গোবিন্দসিং। এমন-কি আধুনিক ভারতে আমরা একদিকে হ্যালি (Hali), ইকবাল, মোহানি, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরীশচন্দ্রকে নিয়ে সমভাবেই গৌরববোধ করতে পারি। আমরা যেমন সৈয়দ আহম্মদ খানকে নিয়ে গর্ব করতে পারি, তেমনি গর্ব করতে পারি আমাদের রামমোহন রায় এবং দয়ানন্দকে নিয়ে।

আমাদের দেশের বহু প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করলে বুঝা যাবে যে আমরাই প্রথম আজ অধিকতর সংগঠিত, সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ শত্রুর সম্মুখীন হয়েছি। তাই আজ আমরা আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন অতি তীব্রভাবেই অনুভব করছি। আমাদের সন্তানগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা আরো

সংকটের দিনে জন্মগ্রহণ করবে— তাদেরই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে আজাদহিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলছেন :

I think, we shall be doing less than our duty to posterity, if we do not take steps to suitably arm them for the conflict in which they will be engaged in maintaining and keeping India free.

অর্থাৎ : আমি মনে করি যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাখতে হলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়বে তার জন্য যদি আমরা এখন থেকেই তাদের প্রস্তুত ক'রে তুলবার উপায় অবলম্বন না করি, তা হলে তা দের প্রতি আমাদের কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কি ক'রে সেটা সম্ভব হবে— তার একমাত্র উপায় (One remedy) নির্দেশ ক'রে 'নেতাজী' বলছেন :—

India must rebuilt its customs renovated, the evil which is the cause of all our ills, ignorance, must be made to disapprear ; there is but one remedy, the education of all. I can not but quote a great Indian patriot—"not to be altve to our weakness, to the correction of our social standards and to the degradation of our religious values— will be a fatal hindrance to our progress. We must go to the root causes of the same to apply fundamental cures. In our march onward we shall have to destroy a good deal before we can put up new structures necessary for our progress and worthy of our position in the family of nations".

Thank God, the spirit of unity is abroad amongst us in East Asia and we can safely build upon it. But it will be folly to ignore the counteracting forces. We must meet them by active deliberate and well-concerted plans, yet we must take warning from history— no institution inspired by fear or tyranny can further life ; hope, not fear, is the creative principle in human affairs.

It is hoped that this paper will be of some use and guidance to all our officers. teachers and workers, especially those on whom has devolved the responsibility of supervising the instruction of Indian children reading in our National Schools.

অর্থাৎ : ভারতবর্ষকে নূতন ক'রে গড়ে তুলতে হ'বে, রীতিনীতি বদলানোর সঙ্গে—আমাদের সকল দুর্গতির মূল কারণ যে অজ্ঞানতা তাকে দূর করে দিতে হবে। এর একটি মাত্র প্রতিকার আছে—সকলকে শিক্ষিত ক'রে তোলা। একজন ভারতীয় দেশপ্রেমিকের কথা আমাকে এখানে উদ্ধৃত করতে হচ্ছে—"আমাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ না হলে সামাজিক আদর্শের সংশোধন, ধর্মবিষয়ক মূল্য বা তাৎপর্যবোধের আধোগতি সম্বন্ধে অবহিত না হলে, আমাদের উন্নতির পথে মারাত্মক বাধা আসবে। এর আসল প্রতিকারের জন্য মূল কারণ নির্ণয় করতে হবে। সমগ্র জাতিসংঘের মধ্যে আমাদের যথাযোগ্য স্থান করে নেওয়ার পূর্বে আমাদের উন্নতির জন্য নব নব সংগঠনের প্রয়োজন আছে। তার পূর্বে আমরা যেমন এগিয়ে চলব, তেমনি অনেক কিছুই আমাদের ভেঙে ফেলতে হবে।"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে আমাদের মধ্যে এখানে এই পূর্ব এশিয়াতে ব্যাপকভাবে মিলনের আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে। আমরা তারই উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করতে পারি। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে নির্বুদ্ধিতা হবে, সেই বিরুদ্ধ শক্তিকে আমরা সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ কার্যকরী পরিকল্পনা দিয়ে পরাভূত করব এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখে সাবধান হব—ভয় বা নির্যাতনের দ্বারা পরিচালিত কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে না; ভীতি নয়, আশাই মানুষের কর্মে সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করে।

আমি আশা করি যে এই পুস্তকখানি আমাদের উর্ধ্বতন কর্মচারী, শিক্ষক এবং কর্মীদের, বিশেষত আজ যাঁদের উপর জাতীয় বিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়েছে—তাঁদের কাজে লাগবে এবং তাঁরা এই অনুসারে চলতে পারবেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে উপরোক্ত প্রণিধানযোগ্য কথাগুলির সঙ্গে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ থাকাকালীন সুভাষচন্দ্রের মেদিনীপুরে আহূত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ "জাতীয় শিক্ষার কথা" পড়ে দেখা উচিত।... পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় শিক্ষার মূল কথা হিসাবে সুভাষচন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন, পূর্বএশিয়ার আজাদহিন্দ সরকারের অধীনে স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে এই কথাগুলি আরো স্পষ্টভাবে সাধারণ্যে প্রচারিত হ'ল। তিনি পূর্বএশিয়ার জাতীয় বিদ্যালয়ে

ধর্মশিক্ষার অপ্রয়োজনীয়তা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা ক'রে, সর্বজাতি ও সর্ব-সম্প্রদায়ের ঐক্যসাধন করেছিলেন, অসংখ্য জাতীয়বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে। তাঁর পূর্বোক্ত অভিভাষণটি আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসার বিষয়ক সুস্পষ্ট ঘোষণার সংগে একত্রে পাঠ করলে বুঝতে পারা যাবে যে সুভাষচন্দ্রের মন তখন তৈরি হচ্ছিল সুবৃহৎ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে সম্মুখে রেখে।

ভারতীয় জাতীয়বাহিনী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য

জাতীয়বাহিনীর দখলে কোহিমা

আজাদহিন্দ ফৌজের ডেপুটি কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (Deputy Quarter Master General) লে. ক. প্রিয়নাথ দত্ত মুক্তিলাভ করে গত ২২ এপ্রিল (১৯৪৬) সোমবার তারিখে কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ভারতীয় জাতীয়বাহিনী (I.N.A.) কোহিমায় এসে সপ্তাহকাল আধিপত্য করে। বিষেনপুর অঞ্চল কর্নেল এম. এ. মালিক এবং মেজর চক্রবর্তীর অধীনে ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে জুলাই মাসের প্রথম পর্যন্ত প্রায় দুইমাস-কাল জাতীয়বাহিনীর (I.N.A.) দখলে থাকে। ব্রিটিশভারতের মধ্যে এই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা বেশি সময়ের জন্য তাদের অধীনে ছিল। বিষেনপুরের অধিবাসীরা লোকজন ও অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করেছিল। জাপানীরা ভারতীয় জাতীয়বাহিনীর সংগে ছিল শুধু তাদের ব্রহ্মপুত্র নদ পার হবার সময় সাহায্য করবার জন্য ; তারপর ভারতীয় জাতীয়বাহিনীকে নির্ভর করতে হত ভারতবাসীর সাহায্যের উপর। কোহিমা থেকে পিছু হটে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কর্নেল দত্ত বলেন যে, যদিও নেতাজীর সুব্যবস্থায় সমস্ত ঘাঁটিতেই রসদ মজুদ করে রাখা হয়েছিল, কিন্তু আগেভাগেই বর্ষা নেমে যাওয়াতে রাস্তাঘাট দুর্গম হয়ে উঠল, রসদ আর পৌঁছাতে পারা গেল না। কাজেই জাতীয়-বাহিনীর পক্ষে তখন আর ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কর্নেল দত্ত বলেন যে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী সংখ্যায় অগণন এবং আধুনিক রণসম্ভারে সুসজ্জিত ছিল। তাদের বিরুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজ লড়াই করেছে, সাধারণ বন্দুক, কামান, আপনি চলে এমন কতকগুলি

মেশিনগান দিয়ে (Ordinary Rifles, Bren Guns, Automatic Machine Guns, Mortars)। এগুলি সরবরাহ করত জাপান, তার জন্য হাতে হাতে দাম দিতে হ'ত না ; শর্ত ছিল, ভারত স্বাধীন হলে তাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া হবে। স্বল্প রণসম্ভারে সজ্জিত হয়েও আজাদহিন্দ ফৌজ নির্ভয়ে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছে, তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং তাদের আক্রমণে কোনোদিনই তারা পিছনে হটে আসে নি।

তাদের অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল বলেই তারা ইম্ফালের ভিতর দিয়ে এগিয়ে আসে নি, কেননা, কোনোরকমে ব্রিটিশ যদি পালায় বা চারি দিকে আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যদের বেড়াজালে বন্দী হয়ে আত্মসমর্পণ করে এই আশাতেই তারা অপেক্ষা করছিল। তাহলে ব্রিটিশ বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, কামান ও গুলিবারুদ নিয়ে আজাদহিন্দ ফৌজের পক্ষে ভারত অভিযান করা সহজ হ'ত। দুর্ভাগ্যবশত তাদের সে আশা সফল হয় নি।

নেতাজীর মাতৃভক্তি

নেতাজীর মাতৃভক্তি ও মায়ের উপর তাঁর প্রবল আকর্ষণের কথা উল্লেখ করে কর্নেল দত্ত বলেন যে, নেতাজীকে অত্যন্ত গোপনে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি সেই কারণে তাঁর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসতে পারেন নি। জননীর পায়ের ধুলা গ্রহণ করতে তিনি সেই গভীর রাত্রে তিন তিন বার তাঁর ঘরে যান, কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে প্রত্যেকবারই আত্মসংবরণ করে ফিরে আসেন। নেতাজী যখনই এ কথা বলতেন, তখনই তাঁর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত দেখা যেত।

সৈন্যদের জন্য নেতাজীর অসীম যত্ন

আজাদহিন্দ ফৌজের প্রত্যেক সৈনিকের জন্য নেতাজী যে কী পরিমাণ যত্ন নিতেন, সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কর্নেল দত্ত বলেন যে সৈনাদের অতি তুচ্ছ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও নেতাজীর দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজে মাঝে মাঝে একপক্ষকাল সাধারণ সৈনিকের খাদ্যবরাদ্দের উপর নির্ভর ক'রে থাকতেন।

তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সেই খাদ্য তাদের জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত ও পরিমাণে যথেষ্ট কিনা সেটা পরীক্ষা করা। মাঝে মাঝে নেতাজী হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকে তরকারি আস্বাদ ক'রে দেখতেন, এবং চালগুলি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা তাও দেখতে তিনি ভুলতেন না।

সাধারণ সৈনিকের মতো জীবনযাপন

তিনি সাধারণ সৈনিকের খাদ্য গ্রহণ করে আছেন, এমন সময় একদিন একজন পদস্থ জাপানী সেনাপতি তাঁর সংগে দেখা করতে আসেন। সৌজন্যের খাতিরে জাপানী সেনাপতিকে চা দেওয়া হ'ল, আমরা ভাবলাম এবার নেতাজী নিশ্চয়ই এক পেয়ালা চা পান করতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু নেতাজীর প্রকৃতি অন্যরূপ; নিয়মপালনের প্রতি তাঁর এমনি নিষ্ঠা ছিল যে, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, এই অজুহাতে তিনি সেই বাড়তি একপেয়ালা চা হাসিমুখে ফিরিয়ে দিলেন।

ব্রিটিশের অধীনে ভারতীয় সৈনিকের খাদ্যবরাদ্দের মাপেই আজাদহিন্দ ফৌজের খাদ্যের বরাদ্দ ছিল। নেতাজী মনে করলেন যে, এ ছাড়াও আজাদ-হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এজন্য তিনি প্রতিদিন জনপ্রতি ৪ আউন্স চিঁড়া, মুড়ি অথবা ছোলা এবং ২ আউন্স গুড়ের বরাদ্দ করে দিলেন।

নেতাজীর আত্মসম্মান জ্ঞান

নেতাজী কোনো জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষকে নিজের অপেক্ষা বড়ো বলে মনে করতেন না, এবং কখনো তাদের প্রতি অতিরিক্ত বা অশোভন সম্মানও দেখাতেন না, অথচ, তাঁর মধুর ও ভদ্র ব্যবহারে সকলে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমীহের চক্ষে দেখত। বর্মা অভিযানের সময় একদিন একজন জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষ নেতাজীর সংগে সাক্ষাতের জন্য আসেন। নেতাজী উপরতলা থেকে নেমে এসে তাঁকে সংবর্ধিত ক'রে উপরে নিয়ে গেলেন না। তাঁর নির্দেশমতো সৈন্যাধ্যক্ষকে উপরতলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জাপসৈন্যেরা তাঁকে বলত, 'চন্দ্র বোস',

এবং আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টকে বলত, 'চন্দ্রবোস আর্মি'; কেউ কেউ আবার তাঁকে বলত 'বিহারী বোস'। বর্মীরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখত এবং তাঁর ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টার প্রতি তাদের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল।

মালসরবরাহের বিবরণ

কর্নেল দত্তের অধীনে ছিল সৈন্যদের বাসস্থান, খাদ্য, পোশাক এবং রণসম্ভারের ব্যবস্থাবিভাগ। এর মধ্যে বহু জিনিস জাপান সরবরাহ করত, কিন্তু জাতীয়-বাহিনীর প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট ছিল না; সেইজন্য স্থানীয় বাজার থেকেও তাঁদের মাল কিনতে হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাপান ব্রিটিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রপাতি ও গোলাবারুদই সরবরাহ করত। আজাদহিন্দ সরকারের প্রধান আয় হত সাধারণের চাঁদা বা দান থেকে। জাপান দিত রাইফেল, ব্রেনগান, অটোমেটিক মেশিনগান, মর্টার্স; কোনো ট্যাংক তারা দেয় নি, ব্রেনগান বয়ে নিয়ে যাওয়ার গাড়ি দিয়েছিল তারা সিংগাপুরে এসে, কিন্তু সংগে নিয়ে যাওয়ার অসুবিধার জন্য সেগুলি কোনো কাজেই তখন লাগে নি।

চীনা, বর্মা, মালয়ী এবং অন্যান্য বর্মাদেশবাসীদের তুলনায় ভারতীয়দের উপর জাপানীদের ব্যবহার ভালোই ছিল।

নেতাজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

১৯৪৫ সালের ১৭ এপ্রিল নেতাজীর সংগে কর্নেল দত্তের শেষ সাক্ষাৎ হয়। কর্নেল দত্ত বলেন, "আমরা তাঁকে এতই ভালোবাসতাম যে, তিনি যে মারা গেছেন, এ কথা আমরা ভাবতেও পারি না।"

বর্মীদের আচরণ

ব্রিটিশের পরাজয়ের পর বর্মীদের আচরণের সংগে তাদের বর্তমান মনোভাবের সামঞ্জস্য কী করে করা যায়, এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কর্নেল দত্ত বলেন, "সেই ভীষণ সংকটের সময় ৫০,০০০ ভারতীয় যে নিহত হয়েছিল এক থা ঠিক, কিন্তু

আজাদহিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (Indian Independence League) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আধডজন লোকও সেভাবে প্রাণ হারিয়েছে বলে মনে হয় না।"

ঝান্সীরানী বাহিনী

তিনি বলেন, 'ঝান্সীরানী' বাহিনীতে শুশ্রূষা ও সংগ্রাম (Nursing and fighting forces) এই দুইটি বিভাগ ছিল। পঞ্চাশজন নার্সের মধ্যে পঁচিশ-জনই ছিল বাঙালী। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা আজাদহিন্দ ফৌজে নার্সের কাজ করতেন। কাজকর্মও ছিল তাঁদের অতি চমৎকার। এ সম্পর্কে কুমারী বেলা দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"আমরা হিন্দুস্থানী"

কর্নেল দত্ত প্রথমে ব্রিটিশের অধীনে অষ্টম ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর ক্যাশিয়ার ছিলেন। সিংগাপুরে ব্রিটিশ আত্মসমর্পণ করলে তিনি জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সাত মাস জাপানী জেলে কাটানোর পর তিনি ১৯৪২ সালে জেনারেল মোহন সিং-এর অধীনে জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করেন।

এই বাহিনীর সৈন্যগণকে বন্দী অবস্থায় ব্রিটিশ সামরিক বিভাগে নিয়ে এসে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের?" তাঁরা সকলে একবাক্যে উত্তর দিলেন, "আমরা হিন্দুস্থানী, আমরা হিন্দুও নই, মুসলিমও নই।"

মাতাজীর বিবৃতি

ঝাঁসিরাণী বাহিনীর সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা 'মাতাজী' সম্বন্ধে যে সংবাদটি ১২.৫.৫৬ তারিখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে 'নেতাজীর অপূর্ব কর্তব্যনিষ্ঠা'র পরিচয় পাওয়া যায়। নেতাজী বোমা-

বর্ষণের মধ্যেও অকুতোভয়ে হাসপাতালে গেছেন আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উক্ত সংবাদটি এই :—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদহিন্দ ফৌজের সকলেই যাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত মাতাজী বলিয়া ডাকিতেন, ঝাঁসির রানী বাহিনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধা সেই মহিলা এক্ষণে কলিকাতায় বঙ্গীয় আজাদহিন্দ ফৌজ সাহায্য কমিটির একটি বিশ্রাম ক্যাম্পে অবস্থান করিতেছেন।

ইঁহার নাম চন্দ্রমুখী দেবী এবং বয়স হইতেছে ৫৪ বৎসর। গত বৃহস্পতিবার যে দেড়শত আজাদহিন্দ ফৌজকে রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আনিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। কয়েকদিনের মধ্যেই ইনি তাঁহার বাটী গোরক্ষপুর অভিমুখে রওনা হইবেন।

ইনি আজাদহিন্দ ফৌজে যোগদান করিয়া নার্সের কার্য গ্রহণ করেন এবং শেষপর্যন্ত ইহাতে ছিলেন। ইনি আজাদহিন্দ ফৌজের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং এমন-কি সমরক্ষেত্রের কয়েকটি হাসপাতালেও কাজ করিয়াছেন। ইনি ঝাঁসির রানী বাহিনীতে সিপাহীর পদে ছিলেন। ইঁহার তিনটি পৌত্র 'বালসেনা' দলে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাতাজী আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার ফৌজের লোকদের কিরূপ গভীরভাবে ভালোবাসিতেন এবং তাহাদের সেবার জন্য দারুণ বোমাবর্ষণের মধ্যেও কয়েকবার কিরূপভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবাবেগে বিবৃত করেন।

এরূপ ধরনের একটি দৃষ্টান্ত. যাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, বর্ণনা প্রসঙ্গে মাতাজী বলেন যে, ব্রহ্মরণাঙ্গনে যুদ্ধের শেষপর্যায়ে ব্রিটিশরা একবার রেঙ্গুনে মিয়ান হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণ করে। ইহা কতকটা কার্পেট বোম্বিংয়ের ন্যায় হইয়াছিল, দুইবর্গমাইল স্থান জুড়িয়া বোমা বর্ষিত হয়। ঐ হাসপাতালের অতি নিকটেই তাঁহার (মাতাজীর) বাসগৃহ ছিল। শতশত নাগরিক এবং আজাদহিন্দ ফৌজ এই বোমাবর্ষণের ফলে আহত হয়। নেতাজী আহতদের দেখিবার জন্য ছুটিয়া যান। এইসময় মাথার উপর আবার একদল বোমারুবিমান দেখা দেয়, এবং ঐগুলি বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। নেতাজীর গাড়িটি একটি বোমার আঘাতে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু নেতাজী তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া হাঁটিয়াই ঐ হাসপাতাল অভিমুখে অগ্রসর

হন। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে আহতগণ দারুণ বিপদের মধ্যেও উল্লসিত হন।

মাতৃভূমির স্বার্থে আত্মনিয়োগ

আজাদহিন্দ ফৌজের অন্যতম প্রধান সেনানায়ক (Chief of the staff in I. N. A.) মহারাষ্ট্রবীর জেনারেল জগন্নাথরাও ভোঁসলে ১৩ মে (১৯৪৬) তারিখে পুনায় তাঁর সংবর্ধনা সভায় বলেন, ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সৈন্যদল যুদ্ধবন্দীরূপে আত্মসমর্পণ করার পর তাদের সামনে দুটিমাত্র পথ খোলা ছিল: মাতৃভূমির স্বার্থে আজাদহিন্দ ফৌজে যোগ দেওয়া, অথবা জাপানীদের কাছে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় থেকে দেশদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া: এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না; কারণ, জাপানীরা কোনো দেশকে কখনো স্বাধীনতা দেয় নি।

নেতাজী সম্বন্ধে অভিমত

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে জেনারেল ভোঁসলে বলেন:—

After the arrival of Netaji, the whole of East Asia was galvanized and revolutionised, and Indian civilians, even those in humble walks of life, came forward in large number to join the I. N. A.

অর্থাৎ, নেতাজীর আগমনে সমগ্র পূর্বএশিয়ায় দেশপ্রেমের তাড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল। চারি দিকে দেশের মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। এমন-কি অতি নিম্নস্তর থেকেও ভারতবাসীরা দলে দলে আই. এন. এ.-তে যোগদান করবার জন্য এগিয়ে এল।

জেনারেল ভোঁসলে বলেন, নেতাজীই ছিলেন আজাদহিন্দ ফৌজের মূর্ত প্রাণশক্তি। তাঁরাই পরিচালনায় আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ ইম্ফলে যুদ্ধ করেছিল। তিনি যে শুধু আজাদহিন্দ ফৌজের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তাই নয়, তিনি অসামরিক ভারতীয়দের মধ্যেও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ত্যাগস্বীকার করতে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি রেংগুনের জনসাধারণের নিকট থেকে দু'ঘন্টার মধ্যে দুই কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন ; সমস্ত টাকাই তাঁদের স্বেচ্ছাকৃত দান। আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে লোককে বাধ্য ক'রে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে, জোর করে টাকা আদায় করা হয়েছে, এবং জনসাধারণের উপর আজাদহিন্দ সরকারের ব্যবহার ছিল নিষ্ঠুর নৃশংস। এটা সবৈব মিথ্যা কথা, কারণ বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানদের নিয়েই এই গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। লজ্জিত হওয়ার মতো কোনো কাজই তারা করে নি।

আজাদহিন্দ গভর্নমেণ্ট

ভারতবাসীকে আজাদহিন্দ ফৌজের নিয়মশৃংখলা ও ত্যাগস্বীকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য অনুরোধ ক'রে তিনি বলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব সামরিক ঐতিহ্য আছে। ইম্‌ফলের যুদ্ধে আজাদহিন্দ ফৌজ দুঃখ-কষ্ট ভোগ এবং ত্যাগস্বীকার দ্বারা ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন, তাই দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন :—

"The glorious chapter of the Azad Hind Government under the inspiring leadership of Netaji Subhaschandra Bose, should be written in letters of gold on pages of Indian history".

অর্থাৎ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের গৌরবময় অধ্যায় ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

সাধারণ সৈনিকের বিবৃতি

নীলগঞ্জ বন্দীশিবির থেকে মুক্তিলাভ করে একজন আজাদহিন্দ ফৌজের সৈনিক আমাদের 'হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স' অফিসে তাঁর পলিসি সংক্রান্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান করতে আসেন। ভদ্রলোকটি বাঙালী, সিলেটে তাঁর বাড়ি, বয়স ৩০।৩২ হবে ; তাঁর নাম অমূল্যচন্দ্র ভদ্র। বর্মায় তাঁর গহনার দোকান ছিল। তিনি তাঁর যা-কিছু সম্পত্তি আজাদহিন্দ ভান্ডারে সমর্পণ ক'রে নিজে 'ফৌজে' যোগদান করেন, কর্মচারীরূপে নয়, সৈনিক হিসাবে। বর্মাপ্রবাসী যে-কোনো

লোকের 'পলিসি', প্রিমিয়াম না দিতে পারলেও বাতিল হবে না, এই মর্মে আমাদের কোম্পানি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং ভদ্রলোকটির 'পলিসি' ও সে-কারণে চালু ছিল। সেই বিষয়ের সন্ধান নিতেই তিনি এসেছিলেন। ভদ্রলোকটির সংগে দুজন শিখ সৈনিক ছিলেন, তাঁরাও আজাদহিন্দ ফৌজের লোক। তাঁদের নিয়ে আমার বন্ধুবর চন্ডীপ্রসাদ মুখার্জির (তখন তিনি 'হিন্দুস্থান'-এর চীফ অ্যাকাউনটেন্ট ছিলেন) ঘরে গেলাম— তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা কিছু শুনব বলে। অমূল্যবাবু যা বললেন, তার অধিকাংশ কথাই পরে আমরা সংবাদপত্রের মারফত বিভিন্ন সৈনিক ও পদস্থ কর্মচারীর বিবৃতিতে জানতে পেরেছি। অমূল্যবাবু বললেন :—

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেবতা

আপনারা নেতাজীকে কী মনে করেন জানি না; কিন্তু আমরা তাঁকে দেবতা বলে মনে করি। ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন না হলে, তিনি অসাধ্যসাধন করতে পারতেন না, এবং নিজে বারবার সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়েও বেঁচে আসতে পারতেন না।

রেঙ্গুনে ধনপ্রাণ রক্ষা

শুধু আমরা নয়, বর্মীরা, জাপানীরা, বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়েরা তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি ক'রে থাকে। রেংগুনে ও সিংগাপুরে অনেকে নেতাজীর ফোটো পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে, ধূপদীপ জ্বালিয়ে প্রত্যহ পূজা করে। এর প্রধান কারণ ব্রিটিশ সৈন্য রেংগুন ত্যাগ ক'রে চলে গেলে সেখানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাতে প্রত্যেক নরনারী ও শিশুর প্রাণসংশয় হয়ে পড়ে এবং নেতাজী যাওয়ার আগে বহু লোকের প্রাণহানিও হয়েছিল, বহু লোকের সম্পত্তিও লুণ্ঠিত হয়েছিল। নেতাজী আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করেছেন। তাঁর সুব্যবস্থায় শৃংখলা ফিরে আসে রেংগুনে এবং জাপসৈন্য আত্মসমর্পণ করার পর তিনি যখন রেংগুন পরিত্যাগ করেন তখনো ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আজাদহিন্দ ফৌজের কিছু সৈন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন।

রেঙ্গুনে ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে নেতাজীকে অর্থ দিয়ে, লোক দিয়ে সাহায্য করেছে। একজন খুব ধনী ব্যবসায়ী রেঙ্গুনে একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নেতাজীকে বাস করবার জন্য দিয়েছিলেন। নেতাজী সেখানে আজাদহিন্দ ফৌজের হেডকোয়ার্টার্স স্থাপন করেছিলেন।

সোনা দিয়ে ওজন

একদিন রেঙ্গুনের ভারতীয়েরা স্থির করলে যে তারা নেতাজীকে সোনা দিয়ে ওজন করবে। নেতাজী এ কথা শুনতে পেয়ে সকলকে নিরস্ত করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু সকলে এমনি মনক্ষুণ্ণ হলেন যে, অবশেষে তাঁকে মত দিতে হ'ল। আমরা বাঙালী, মনে হ'ল আমাদের বাঙলাদেশের জনপ্রিয় নেতা, আমাদের অশেষ সম্মানের অধিকারী নেতাজীকে সোনা দিয়ে ওজন করতে গিয়ে যদি অপদস্থ হতে হয়। কিন্তু এমনি ভগবানের দয়া নেতাজীর উপর, যে, তাঁর ওজনের চাইতেও গহনা ইত্যাদির ওজন অনেক বেশি হ'ল; সে সমস্তই আজাদহিন্দ ভান্ডারে জমা দেওয়া হয়েছিল।

কর্মব্যস্ত নির্ভীক নেতাজী

নেতাজীকে আমরা দেখেছি সারা দিনরাত কাজ করতে। আগে তিনি রাত্রে নিদ্রা যেতেন চার ঘণ্টা, পরে কাজের চাপে সেটি কমে এসে দাঁড়ায় দুই ঘণ্টা।

ইদানীং খুব কাজের চাপ যখন পড়ত তখন নেতাজী অনবরত সিগারেট খেতেন। নেতাজী তাঁর ক্যাম্পে বসে কাজ করছেন, বোম্বিং আরম্ভ হ'ল, সকলে যে যার মতো 'cover' নিলে, কিন্তু নেতাজীর কেয়ারই নেই। তাঁকে বলা হ'ল trench-এ চলুন, তিনি বললেন, 'যাচ্ছি'; অর্থাৎ অত ব্যস্ত হবার কী আছে?

একদিন যে ট্রেঞ্চটি তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তারি চারিপাশে এমন ভয়াবহ-ভাবে বোম্বিং হ'ল যে আমরা সবাই মনে করলাম নেতাজীকে আর আমরা জীবিত অবস্থায় দেখতে পাব না, কিন্তু নেতাজী হাসিমুখে ট্রেঞ্চ থেকে উঠে

এসে আমাদের সকলের অভিবাদন গ্রহণ করলেন এবং নিজের ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে অসমাপ্ত কাজে মন দিলেন ; যেন কিছুই হয় নি।

নেতাজী সব সময়ে বিপদের সম্মুখে যেতে চাইতেন, যেতেনও ; কারও নিষেধ মানতেন না।

খুব যখন সংকট মুহূর্ত, চারি দিক থেকে দুঃসংবাদ আসছে, কিংবা কোনো ছাউনিতে ভয়ংকর বোম্বিং হচ্ছে, নেতাজীকে তখন আমরা গান গাইতে শুনেছি :—

"প্রলয়নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে,
হে নটরাজ, তোমার জটার বাঁধন
পড়ল খুলে।"

নেতাজীর সহৃদয়তা

নেতাজী আমাদের সংগে এমনভাবে মেলামেশা করতেন, প্রত্যেকের সামান্য সুখ-সুবিধার জন্য এমনভাবে যত্ন নিতেন যে, আমাদেরই লজ্জা করত।

একদিন আমরা অগ্রসর হয়ে চলেছি ; একজায়গায় এসে আমাদের রসদ কম পড়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে নেতাজীর জন্য আলাদা ভালো ব্যবস্থা যে কিছুই ছিল না তা আমরা জানতাম। তা ছাড়া এ-সব কষ্টে আমরা কখনো অভিভূত হয়েও পড়ি নি। কিন্তু এইদিন খাদ্যের পরিমাণ অত্যন্ত কম দেখে অনেক রাস্তা 'মার্চ' করার পর অতিরিক্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে একটি 'ইউনিট' থেকে সকালবেলার খাবার প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এ কথা শুনে নেতাজী স্বয়ং উপস্থিত হলেন আমাদের কাছে ; তাঁর চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত মনে হ'ল। তিনি বললেন :—

বন্ধুগণ, আমি তোমাদের কোনো মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সংগে আনি নি। ক্ষুধাতৃষ্ণা কায়িক কষ্ট, হয়তো বা শত্রুহস্তে অমানুষিক উৎপীড়ন, এ-সব সহ্য করার জন্যই প্রস্তুত হয়ে তোমরা আমার সংগে এসেছ ; ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য। জাপান বারবার আমাদের সন্ধিশর্তের অমর্যাদা করছে। রসদ আমার আছে, কিন্তু সে রসদ এই দুর্গম পথ দিয়ে এখানে নিয়ে আসার মতো

যানবাহন আমাদের প্রয়োজনমতো দিচ্ছে না ; যদিও তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এ-সব অসুবিধা দূর করার জন্য তারা প্রস্তুত থাকবে। তোমরা জানো, বারবার তাদের সঙ্গে আমাকে নানা বিষয় নিয়ে বিবাদ করতে হয়েছে ; সব সময়েই আমাদের কথা তাদের মানতে হয়েছে সত্য, কিন্তু এখন জাপান নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, কাজেই এ-সব বিপদ মেনে নিয়েই তো আমরা "হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু" এই পণ করে এই দুর্গম পথে বেরিয়েছি। আমি জানি, এই পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে গেলেই চর্ব্যচুষ্য আহার এবং ভোগের নানাবিধ উপকরণ তোমরা অনায়াসেই পেতে পারো, কিন্তু সে উদ্দেশ্য নিয়ে তো তোমরা আমার সঙ্গে দুঃখবরণ কর নি। ক্ষুধাতৃষ্ণার যে কী কষ্ট, তা আমিও জানি। কিন্তু তোমাদের আজ স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যে, ভারতবর্ষের যে চল্লিশ কোটি নরনারীর স্বাধীনতার জন্য তোমরা এতদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এসেছ, তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে ও করছে। সুজলা-সুফলা বাঙলাদেশের মন্বন্তর আজ আমাদের এখানকার সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দিক— এই আমি চাই।

নেতাজীর এই আবেগপূর্ণ সম্ভাষণের পর কারও মনে আর কোনো দুঃখ রইল না, সকলে হাসিমুখে খাদ্য গ্রহণ করল।

কোহিমার পাহাড়ে

অমূল্যবাবু বলতে লাগলেন : আমরা এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, মাঝে খানিকটা সমতল বা অর্ধসমতল ভূমি ; ওধারের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্য। আমরা Loud Speaker দিয়ে বলতাম হিন্দীতে—

তোমরা ভারতবাসী, এসো আমাদের সঙ্গে, ভারতকে স্বাধীন করি, আমরা একসঙ্গে। এখানে সুখ নেই, বিলাসিতা নেই, ভোগসুখ নেই ; এ-সব কিছু পাবে না। এখানে কিন্তু আমাদের নেতাজী তোমাদের দেবেন স্বাধীনতা।

ওরা জবাব দিত :—

আরে, তোমরা ঘাসপাতা খেয়ে, একবেলা খেয়ে মরবে কেন ; এসো আমাদের দলে। ভালো ভালো খাবার খেতে পাবে, পোশাক পাবে, সিনেমা দেখবে, সরাব ইত্যাদি পাবে।

এইভাবে তর্কাতর্কি হ'ত। কোনো সময়ে আমরা ওদের দলের লোককে পেয়েছি আমাদের দলে। রাত্রের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তারা আসত। তারপর আমাদের 'অফিসার' তাদের ভালো করে বুঝে দেখতে বলতেন। স্বেচ্ছায় যদি আসত ভালোই, নতুবা জোর করে তাদের আটকে রাখা হ'ত না, তবে তাদের বন্দুক এবং বাড়তি পোশাক আমরা নিয়ে নিতাম।

আমরা কোহিমার পাহাড়ে উঠে জাপানীসৈন্যদের দেখাতাম— ওই আমাদের ভারতবর্ষ। তারা নতজানু হয়ে প্রণাম করত, 'নেতাজী'র দেশকে। জাপানী-সৈন্য টহল দিচ্ছে বা সান্ত্রীপাহারায় নিযুক্ত আছে, এমন সময় শুনতে পেলে, নেতাজী সেইদিকে আসছেন, তিনি তখন হয়তো অনেক দূরে ; তারা সসম্ভ্রমে "প্রস্তুত" (attention) হয়ে দাঁড়াত। তারা তাদের সেনাপতির চাইতেও যেন বেশি শ্রদ্ধার চোখে দেখত আমাদের নেতাজীকে।

জাপানীসৈন্যের উপর কড়া নজর

নেতাজীর উপদেশ ছিল : "জাপানবাহিনীর উপর তোমরা সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ভারতবর্ষে গিয়ে যদি তারা আমাদের মা, বোনদের প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান দেখায় বা অত্যাচার করার চেষ্টা করে তাহলে তোমরা সেই মুহূর্তে তার প্রতিশোধ নেবে। জাপসৈন্য একটি চড় মারলে তোমরা দুই চড়ে তার প্রতিশোধ নেবে।"

জাপসেনাপতি ও অধিনায়কদের মধ্যে টোজো নেতাজীকে শ্রদ্ধা করতেন বেশি এবং সন্ধি-শর্তের অবহেলার জন্য যখনই নেতাজী প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তখনই জাপানকে তাঁর কথা মেনে নিতে হয়েছে। কোনো কারণে, কোনো অবস্থাতেই নেতাজী জাপানের এতটুকু বশ্যতাও স্বীকার করেন নি। এ যেন ঠিক সমানে সমান ; এমন-কি তারও কিছুটা বেশি। এর মূলে ছিল টোজোর সহায়তা।

সুইসাইড স্কোয়াড

এই বাঙালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে একজন শিখ ছিলেন। অতি সুশ্রী তাঁর চেহারা। তিনি ব্রিটিশের তরফ ছেড়ে আজাদহিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। তাঁকে দেখিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, "ওঁর শিখদের মতো দাড়ি ছিল, কিন্তু উনি আর সবাইকার মতো দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন। 'সুইসাইড স্কোয়াড'-এ যে ৮০০ সৈন্য যোগদান করেছিল, উনি তাদের মধ্যে একজন। আর সবাইকার ভাগ্যে কী ঘটেছে, জানি না, উনি বেঁচে গেছেন।" দেখলাম তাঁর জামার উপর আই. এন. এ.-র ব্যাজ এবং নেতাজীর একখানি লকেট।

এই শিখ ভদ্রলোকটি যেমন বিনয়ী, তেমনি মিষ্টভাষী। তিনি কথা বলেন আস্তে, একটু হেসে, কিন্তু বেশি কথা বলেন না ; কোনো কথার জবাব দেবার আগেই হাতদুটি জোড় করে জবাব দেন। নেতাজী সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে এই দুর্ধর্ষ শিখ সর্দারের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন :—

"নেতাজী বেঁচে আছেন। সময় হ'লেই তিনি আসবেন, আমরা তাঁর আসার পথকে প্রশস্ত করে রাখব ; তাঁর বাণী, ভারতের স্বাধীনতার বাণী আমরা বহন করে চলব ঘরে ঘরে, দেশ হতে দেশান্তরে, ভারতের পল্লীতে পল্লীতে।"

মনে হল কী ধাতুতে গড়া এই-সব মানুষ। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাঁরা স্বেচ্ছায় 'সুইসাইড স্কোয়াড' বা আত্মবিকাশ সংঘে যোগদান করেন। এদের কাজ ছিল প্রধানত দুর্গম বিপদসংকুল পথে টহল দেওয়া ; শত্রুপক্ষের সৈন্য-সংস্থান, তাদের গতিবিধি প্রভৃতির খবর গোপনে সংগ্রহ করা। প্রতিমুহূর্তে যে কাজে প্রাণহানির আশঙ্কা, সেই কাজে এঁরা স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন। এঁরা ভারতবাসীর নমস্য, বীরজাতির, স্বাধীন জাতিরও নমস্য হওয়া উচিত।

এমনি আর-একজন আজাদহিন্দ ফৌজের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের অফিসে। তিনি মাদ্রাজী, সিঙ্গাপুরে আমাদের 'অর্গানাইজার' ছিলেন। স্বেচ্ছায় ফৌজে যোগদান করেছিলেন, খাদ্য সরবরাহ বিভাগে। তিনি বন্দী হয়ে কোর্টমার্শালে প্রাণদন্ডে দন্ডিত হন ; সে-সব কাগজপত্র আমাদের দেখালেন। একজন ইংরেজ কর্নেলের সহায়তায় পরে তাঁর দেওয়ানী আদালতে বিচার হয়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তিনি বলেছিলেন :—

"Netaji was always in the fighting line, but he was safe everywhere, why? There was something mysterious about him; he always came back unscathed. I believe through some divine intervention."

যুদ্ধের পুরোভাগে থেকেও নেতাজী সব সময়েই অক্ষতদেহে ফিরে এসেছেন, নেতাজীকে ঘিরে ছিল কি যেন একটা পরম রহস্য। একটি ঐশ্বরিক শক্তি তাঁকে সকল সময়েই যেন রক্ষা করে এসেছে।

ঝাঁসীরানী বাহিনীর কার্যকলাপ

সাংবাদিক বৈঠকে লেফ্‌টেন্যান্ট প্রতিমা পালের বর্ণনা

আজাদহিন্দ ফৌজের ঝাঁসীরানী বাহিনীর দ্বিতীয় লেফ্‌টেন্যান্ট শ্রীযুক্তা প্রতিমা পাল গত ৭ জুলাই (১৯৪৬) মঙ্গলবার বউবাজার স্ট্রীটস্থ বঙ্গীয় আজাদ-হিন্দ ফৌজ সাহায্য সমিতির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে উক্ত বাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন :—

"যে সময়ে আজাদহিন্দ ফৌজে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সেই সময় ঝাঁসীরানী বাহিনীর দুইশত নারীসেনা রণাঙ্গনের ঠিক পিছনে মেমিওতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই দলের উপর ব্রিটিশ বিমান বাহিনী বোমা-বর্ষণ করে এবং তাহাতে কিছু নারীসেনা হতাহত হয়। এই সময় নেতাজীর সহিত মাঝে মাঝে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইত।"

লেঃ পাল বলেন যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ঝাঁসীরানী বাহিনীতে যোগদান করেন। উক্ত বাহিনীর নারীরা সংগ্রামশীল ও শুশ্রূষাকারী, এই দুইটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সংগ্রামশীল বাহিনীকে ৬ মাসের জন্য মেশিনগান, রাইফেল, পিস্তল ও হাতবোমা ছোঁড়া শিক্ষা দেওয়া হইত। বাহিনীর উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মচারীদের দুইমাস জঙ্গল ও গেরিলা যুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হইত। বাহিনীর সদস্যগণকে ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষাদান করা হইত। প্রায়ই নেতাজী তাঁহাদের ক্যাম্পে আগমন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহদান করিতেন।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে মেমিও হইতে তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। তিনি আরো বলেন যে, এই বৎসরে ১৫ আগস্ট তারিখে নেতাজীর

সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয়। ইহার পূর্বে মালয়ের সিরামবাদে নেতাজী ১৪ দিন অবস্থান করেন। লেঃ পালের পিতামাতাও সেখানে থাকিতেন। এখানে নেতাজীর একটি ক্যাম্প খোলার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ঘটনার চাপে তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিতে হয়। নেতাজীর যাত্রার দিন লেঃ পাল, নেতাজীর ব্যবহারের জন্য কিছু মিষ্টান্ন দিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন।

লেঃ পাল আরো বলেন যে, তিনি ১৯৪৪ সালে যখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত অটলবিহারী পাল পরলোকগমন করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নেতাজী ব্রহ্মদেশ হইতে ২২.৮.৪৪ তারিখে বাংলায় স্বহস্ত লিখিত এক পত্র প্রেরণ করেন। গভীর সহানুভূতিপূর্ণ এই পত্রখানি তিনি বৈঠকে সমাগত সাংবাদিকগণকে পাঠ করিতে দেন।

দৈনন্দিন জীবনে সুভাষবাবু

সুভাষবাবুকে ষোলো-আনার উপর আঠারো-আনা ভদ্রলোক বললেও সবটুকু বলা হয় না। আদর্শ বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে তিনি যেমন সকলের কাছে শ্রদ্ধেয়, তেমনি বাঙালীপনার ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ব'লে তাঁকে সবাই সমীহ করে চলত। বেশভূষায় সুভাষবাবুর বাবুয়ানি ছিল না, কিন্তু এমন একটি পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্যের ভাব সর্বদা তাঁর খদ্দরের ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবিতে দেখা যেত, যাকে নিখুঁতই বলা চলে। তিনি সাধারণত চুড়িদার পাঞ্জাবি পরতেন ; সাদা খদ্দরের চাদর, ধারে মুগা পাড় এবং সেখানি সর্বদা এমন একটি সুশ্রী ভঙ্গিতে তিনি গায়ে দিতেন যে, দেখলে মনে হবে সেটা রীতিমতো একটি যত্নসাধ্য ব্যাপার। কোনো রকমের অপরিচ্ছন্নতা বা অগোছালো ভাব তিনি পছন্দ করতেন না।

দেশ সেবায় তিনি সর্বদা একটা দৃঢ়সংকল্পের প্রেরণায় নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্যে উৎসুক থাকতেন, হিসাব করে দেখতেন না ফলাফলের ; কিন্তু নিজের কাজ ও পরের কাজকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাচাই করে নিতেন তিনি একজন পাকা হিসেবীর মতো।

নিজের আরব্ধ কাজকর্মে তিনি যেমন নিজেকে ত্রুটিবিচ্যুতিহীন রাখার

চেষ্টা করতেন, তেমনি কাউকে কাজের ভার দিয়ে তার ত্রুটি বা অবহেলা সহ্য করতেন না ; তাঁরা চোখেমুখে অসহিষ্ণুতা ও বিরক্তির ভাব ফুটে উঠত ; যার জন্যে কেউ কেউ তাঁকে বলে থাকে 'Haughty', অর্থাৎ উদ্ধত ও অহংকৃত। কিন্তু যারা তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু তারা জানে, যে, সে কারণে মন তাঁর বেশিক্ষণ কারও উপর বিরূপ থাকত না, এবং কৃতকর্মের যে সাফল্য, তার গৌরব ও আনন্দ সুভাষচন্দ্র কর্মীর সংগে সমভাবেই অনুভব করতেন।

সুভাষবাবু ভাজামশলা খেতে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মাতৃসদৃশ মেজোবৌদিদি সে বস্তুটির নিয়মিত জোগান দিতেন। বিদ্যাপীঠে চাপানের পর, প্রত্যহ তাঁর পকেটে সযত্নে রক্ষিত মোড়ক থেকে আমরাও বঞ্চিত হতাম না, কিন্তু তার পরিমাণটা অনেক সময়েই আমাদের নিরুৎসাহ করে দিত। পকেট থেকে অতি সন্তর্পণে কাগজের মোড়কটি খুলে আমাদের হাতে ভাজা মশলাকটি তুলে দিতে যেন সুভাষবাবুর হাত আর উঠত না। একদিন কিরণবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "সুভাষবাবু, ভারতবর্ষটা হাতে এলে আমাদের ভাগ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারাটা কি এই ওজনের হবে ?"

সুভাষবাবু হা হা ক'রে হেসে বললেন, "অবশ্য ভবিষ্যতের সে বস্তুটির চাইতে বর্তমানের এ বস্তুটির প্রতি আমার লোভটা আপাতত বেশি। তবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার উপর আপনারা অনায়াসেই নির্ভর করতে পারেন।"

জেলে থাকতে সুভাষচন্দ্র অন্যান্য রাজবন্দীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্ধান নিতে প্রতিদিন সকালে বের হতেন। একথা ওঁদেরি কাছ থেকে শুনেছি। কারও অসুখ, তার ঔষধপত্রের ব্যবস্থা, কারও কাপড়জামা বা ফতুয়া নেই, কারও দাঁতের মাজন নেই, গামছা তোয়ালে নেই, সে-সবের ব্যবস্থার জন্যে ফর্দ চলে যেত তাঁর স্নেহময়ী মেজোবৌদিদির কাছে। ফর্দ মোতাবেক জিনিস-পত্রও যথারীতি সরবরাহ হয়ে যেত। সুভাষচন্দ্র বেলা দ্বিপ্রহরে যখন নিজের ঘরে (cell) ফিরতেন, তখন তাঁর ঢাকা ভাত-তরকারি হয়তো কাকে উচ্ছিষ্ট ক'রে রেখেছে, ভাত শুকিয়ে চাল হয়ে গেছে, এবং কলে জল নেই। অতএব ট্যাঙ্ক থেকে ময়লা গঙ্গাজলে নিত্য স্নান চলত এবং সেই ভাত-তরকারি সানন্দে গলাধঃকরণ করে তৃপ্তিলাভ করতেন।

কাজ পড়লে সুভাষবাবুর কাছে কোনো সময়ই অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হত না। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল তখন বিলাত থেকে ফিরে এসে আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা হোটেলে উঠেছেন। সুভাষবাবু শুনেছিলেন, যে, তাঁর কাছে কে

নাকি তাঁর সম্পর্কে মাড়োয়ারী মহলের কী একটা ব্যাপার নিয়ে অনুযোগ করেছে। ওদিকে বগুড়ার যতীনদা (যতীন রায়) কলিকাতায় এসেছেন, তিনি কালই চলে যাবেন, তাঁর সঙ্গেও কথাবার্তা আছে। অতএব সেই রাত্রেই এ কাজ দুটো সেরে নিতে হবে। রাত্রি ১১টার সময় উপাসনা প্রেসে এলেন সুভাষচন্দ্র ; আমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। নলিনাক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তার সন্দেহ দূর ক'রে যতীনদার বাড়ি সেরে আমাকে যখন বাসায় নামিয়ে দিলেন তখন কলিকাতা মহানগরী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। এমনি ছিল তাঁর কাজের তাগিদ। এমনি কতদিন, কতরাত্রি কেটেছে সুভাষবাবুর সঙ্গে। কোনোদিন এতটুকু বিরক্তি, ক্লান্তি বা অসুবিধা বোধ করি নি, বরং তাঁর সাহচর্যলাভের আনন্দ অনুভব করেছি।

কারাগারে সুভাষচন্দ্র

সুপ্রসিদ্ধ কথাশিল্পী ও সাংবাদিক সরোজকুমার রায়চৌধুরী কিছুদিনের জন্য জেলে সুভাষচন্দ্রের সংগী ছিলেন। কলিকাতা বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি সুভাষচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। কারাগারে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা তিনি যেমন বলেছেন, এখানে ঠিক সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

"১৯৩১ সাল। শীতের তীক্ষ্ণতা গেছে, কিন্তু শীত একেবারে যায় নি। আলিপুর সেন্ট্রালজেলের লীডার্স ওয়ার্ডের সামনের গাছটিতে কচি কচি পাতা দেখা যাচ্ছে। চিলের বাসাটি ভাঙবার জন্যে কয়েকটি কাক অসংখ্য কৌশল খাটাচ্ছে। এবারে তাদের নিজেদের বাসা দরকার। কিন্তু কাঠি কুড়িয়ে বাসা বাঁধবার পরিশ্রম স্বীকারে তারা নারাজ। সংসারের তাই তো দেখা যায়। একটি বাসা না ভেঙে বুঝি আর একটি বাসা বাঁধা যায় না।

জেল তখন ভর্তি। কত জায়গা থেকে কত কর্মী যে এসেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

বিকেলে আমরা কয়েকজন ওয়ার্ডের সামনের উঠানটুকুতে ব্যাডমিন্টন খেলছিলাম।

খেলা খুব জমে উঠেছে। অনুভব করলাম পাশ দিয়ে কারা যেন গেলেন। কিন্তু ফিরে চাইবার সময় নেই।

হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনলাম।

চমকে উপর দিকে চাইলাম, কিন্তু যিনি ডাকলেন, ব্যান্ডেজে তাঁর মাথামুখ এমন করে ঢাকা যে, চিনতে পারলাম না।

আর একবার ডাকতেই উপরে ছুটলাম।

জেলসুপার তখন ব্যান্ডেজ খুলে ঘা ধুইয়ে দিচ্ছেন। সে কী দৃশ্য!

মাথার কয়েকটি জায়গা ফেটে গেছে। তাতে তখনো রক্ত জমে আছে। হাজতে ভালো করে তা ধোয়া পর্যন্ত হয় নি। ডানহাতের কড়ে আঙুল ফুলে রয়েছে। পরে জানা গেল, সেটা ভেঙেই গেছে। আর দুই হাতের কত জায়গা যে লাল হয়ে ফুলে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

সে দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। সুভাষচন্দ্রের অঙ্গে কোনো কারণেই যে, কেউ এমন করে লাঠি অথবা ব্যাটন চালাতে পারে, একথা ভাবতেই ক্লেশ হয়।

অথচ সুভাষচন্দ্রের মুখে-চোখে ক্ষোভ অথবা যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই।

তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যমুখে সমবেত সকলের সঙ্গে রহস্যালাপ করছেন। যেন কিছুই হয় নি। আহত খেলোয়াড় খেলার শেষে ঘরে ফিরে যেমন চিন্তিত মনে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে রহস্যালাপ করে, তেমনি।

আঘাতটা স্বাধীনতাদিবসের জের।

কিন্তু এবারের ঘটনার একটা বৈচিত্র্য ছিল। পুলিস আগের দিন রাত্রে নেতৃবৃন্দের বাড়ি ঘেরাও করে, যাতে ভোরে কেউ স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপনের জন্যে বাড়ির বার হতে না পারেন।

খবরটা সুভাষচন্দ্রের কাছে আগেই পেঁছে গিয়েছিল। তিনি রাত্রে আর বাড়িই ফেরেন নি। সকালে অতর্কিতে সকলকে বিস্মিত করে তিনি মিছিল বের করেন।

তার ফলে তাঁকে কী লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল, সে আমার নিজের চোখে দেখা। ভাঙা কড়ে আঙুলটা অনেকদিন ধরে কষ্ট দিয়েছিল।

সাধারণত যাদের সাহসী, এমন-কি দুঃসাহসী বলা হয়, সুভাষচন্দ্র তাদের থেকেও স্বতন্ত্র। ভয় জিনিসটাই তাঁর মনে নেই। শুধু তাই নয়, বিপদকে তিনি ডেকে আনেন। শান্ত জীবনযাত্রা তাঁকে পীড়িত করে। তাকে ফুলিয়ে তরঙ্গসংকুল না করা পর্যন্ত তিনি আরাম পান না। এমন মানুষ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

তাঁর সঙ্গে জেলে থাকা একদিকে খুব সুখের। কত জায়গা থেকে কত

খাবার জিনিস যে তাঁর জন্যে আসত, তার আর ইয়ত্তা নেই। ঝুড়ি ভর্তি ফল আর সোডা-লেমনেড তো আসছেই। বলতে কি, জল আমরা বড়ো একটা খেতামই না। এসব খুবই আরামের।

কিন্তু বিপদও আছে।

কখন কোন্‌দিকে কী ঝড় তোলেন, তার ঠিকানা নেই। যে ওয়ার্ডে আমরা থাকতাম, তার দোতলায় থাকতেন বাছা বাছা বিপ্লবী নেতা : শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলি, হরিকুমার চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র ঘোষ। সেইখানে 'হংস মধ্যে বকো যথা' একপাশে আমিও থাকতাম।

সংবাদপত্রের গুরুতর পরিশ্রম থেকে কিছুকালের জন্যে নিষ্কৃতি পেয়ে আমি মনের আনন্দে দেহের ওজন বৃদ্ধি করছি। সে একটা লজ্জাকর ব্যাপার। প্রতি সপ্তাহেই ওজন বাড়ে; এবং সকলেই তা দেখে আমাকে 'ভ্যাগাবন্ড' বলে ভদ্রসমাজ থেকে খারিজ করে দিয়েছেন।

এমন সময় একদিন সকালে সুভাষচন্দ্র আমার সেলে এসে বললেন, একখানা চিঠি লেখো তো।

হাত তাঁর তখনো অকেজো। চিঠি লেখবার শক্তি ছিল না।

আমি তৎক্ষণাৎ কাগজকলম নিয়ে বললাম, বলুন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, কালকের মধ্যে তাঁর আঙুল এক্সরে করা না হলে তিনি প্রায়োপবেশন করবেন।

লেখা শেষ করে আমি করুণনেত্রে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম।

সুভাষচন্দ্র হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

সবিনয়ে বললাম, সবে দুপাউন্ড ওজন বেড়েছে, এইসময়…

বহু ক্লেশে চিঠিখানায় নাম সই করতে করতে তিনি বললেন, তোমাকে প্রায়োপবেশন করতে হবে না।

বললাম, একি একটা কথা হল। আপনি খাওয়া বন্ধ করলে মুখে খাবার তুলতে পারবে, এমন লোক বাংলাদেশে আছে বলে আমি জানি নে।

কোনো উত্তর না দিয়ে চিঠিখানা নিয়ে হাসতে হাসতে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আমিও বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি যে বললে আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করলে বাংলাদেশের লোকের মুখে খাবার উঠবে না, একি সত্যি?

আমি যতদূর জানি, সত্যি।

কিন্তু এই বাংলাদেশেরই খবরের কাগজে আমার নামে কত নির্লজ্জ মিথ্যা-কথা বেরোয়, সেও তো পড়েছি।

আমিও পড়েছি। আমার মনে হয়, তাদেরও আপনার উপর শ্রদ্ধা কম নেই। তবু যে তারা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যে রটায়, সে তাদের স্বভাব। আরো একটা কথা আমার মনে হয়।

বলো।

একটু ইতস্তত করে বললাম, আপনি হলেন খাঁটি সোনা। অলংকার গড়াতে গেলে সোনায় একটু খাদ মেশাতে হয়। সর্বদিকে আপনি এমন নিষ্কলঙ্ক যে, সকলে আপনাকে ঠিক সহ্য করতে পারে না।

কথাটা সুভাষচন্দ্র কিভাবে গ্রহণ করলেন, জানি না। তিনি নিঃশব্দে গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

প্রায়োপবেশন সেবার তাঁকে করতে হয় নি। তাঁর চিঠি জেল-অফিসে পেঁছিবার আগেই তাঁর আঙুল এক্স-রে করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ওই আঙুলটার জন্যেই যে তিনি প্রায়োপবেশন করতে উদ্যত হয়েছিলেন, এ আমার বিশ্বাস হয় না। (যেখানেই থাকো, সেইখান থেকেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও, এ শুধু তাঁর নীতি নয়, এ যেন তাঁর জীবনধর্ম।)

যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন, তারাই জানেন, কী কঠোর পরিশ্রম তিনি করতেন। সকাল দুটো থেকে রাত্রি দুটো আড়াইটে তিনটে পর্যন্ত তাঁর আর বিশ্রাম ছিল না। জেলে এসে সে বিশ্রাম তিনি নিতে পারতেন। নেবার প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু নেবে কী?

জেলেও দেখেছি, রাত্রি আড়াইটে তিনটের আগে তিনি কোনোদিন শুতে যেতেন না। আমাদের সকলকেই সন্ধ্যার পর নিজের নিজের সেলে বন্ধ করে রাখা হত। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা ছিল না। বহু রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনেছি, বারান্দায় সুভাষচন্দ্রের পদচারণের শব্দ, গুনগুন করে তিনি শ্যামাসংগীত গাইতেন।

কালী সাধনার অনুরাগ বোধ করি কৈশোর থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। জেলেও কালীর একটা প্রকান্ড ছবি তিনি এনেছিলেন। সেলটিকে কম্বল টাঙিয়ে দু'ভাগ করে একভাগে তিনি সাধনা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাতেই তিনি নিমগ্ন থাকতেন।

জেলের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সংগে কিছুকাল ভোর থেকে সন্ধ্যার কিছু পর পর্যন্ত একসংগে কাটিয়েছি। ভোরে একসংগে চা খেয়েছি, তারপরে জেলের বড়ো দুটি পাঁচিলের মধ্যবর্তী সরু লাল রাস্তাটিতে একসংগে বেড়িয়েছি, দুপুরে বিকেলে একসংগে গল্প করেছি, বেড়িয়েছি। একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, জীবনে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাঁর আনন্দ নেই। তাঁর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত চিন্তা এবং সমস্ত আনন্দ এই একটি ধারায় প্রবাহিত।”

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

অনেকে সুভাষচন্দ্রকে কঠোর হৃদয় ভাবেন এবং সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি বইতে পড়লাম ; গ্রন্থকার লিখছেন যে, সুভাষচন্দ্রের সহকর্মীদের সংগে তাঁর অন্তরঙ্গতা কখনো হয় নি, বা তিনি নিজেও তা হতে দেন নি ; তিনি আরো লিখেছেন যে, “তাঁর কথাবার্তাতে আদরযত্ন, সস্নেহ কোমলতা, এ-সকল কখনো প্রকাশ পেত না।” লেখক মনে করেন যে, সুভাষচন্দ্র “রাজনৈতিক সহকর্মীদের সংগে অতি অমায়িকভাবে মিশে কাজ করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে অন্তরঙ্গতা কর্মীদের সংগে কখনো করেন নি। তাঁর প্রকৃতি সেরূপ ছিল না।” তাই লেখক, সুভাষচন্দ্রের আচরণের মধ্যে ‘ফাঁক’ আবিষ্কার করেছেন এবং সে ফাঁককে ‘বিরাট’ ব’লে অভিহিত করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। “শত শত কর্মীদের সংগে মাসের পর মাস তিনি কাজ করেছেন, কিন্তু কারও সংগে তাঁর অনুরাগ জন্মায় নি। কারো সংগে তাঁর হৃদয়ের যোগাযোগ হয় নি··· কেউ কোনোদিন তাঁর অন্তরলোকে প্রবেশ করতে পারে নি” ; লেখকের এ-প্রকার সুভাষ-চরিত্র বিশ্লেষণের মূলে হয়তো ব্যক্তিগত কোনো কারণ থাকতে পারে। তবে তাঁর এইপ্রকার অভিমত যে নিজেই তিনি খন্ডন করেছেন, তা তিনি হয়তো বুঝতে পারেন নি। তিনি কয়েকজন সহকর্মীর নাম উল্লেখ ক’রে লিখেছেন যে, অমুকের সংগে “একটু বেশি অন্তরঙ্গতা, খানিকটা হৃদয়ের টান দেখেছি।” অথবা অমুকের সংগে “বেশি অন্তরঙ্গতা, ব্যক্তিগত প্রীতিবন্ধন ছিল।” অথবা অমুকের প্রতি “আন্তরিক টান ছিল” বা “গভীর বন্ধুত্ব ছিল”।

'গভীর বন্ধুত্ব' 'আন্তরিক টান' 'অন্তরঙ্গতা' 'হৃদয়ের টান' প্রভৃতি যে ব্যক্তির থাকে, তিনি যে আবার কী করে 'কঠোর হৃদয়', সহকর্মী বা বন্ধুদের সঙ্গে 'অন্তরের সম্পর্কে উদাসীন' বা 'অন্তরঙ্গতাশূন্য' হতে পারেন তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

কারণ, আমরা তাঁর সঙ্গে যেটুকু অন্তরঙ্গভাবে মিশবার সুযোগ লাভ করেছিলাম, পরিচয়ের প্রথমদিন থেকেই যে গুণে তিনি সহকর্মীদের হৃদয় জয় করেছিলেন, সে গুণে মানুষকে কোমল করে, স্নেহপ্রবণ করে, প্রীতিকামী করে। তা ছাড়া হৃদয়ের যে কঠোরতার কথা বলা হয়েছে, সেটা যে তাঁর সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য নয়, সেটা আমি এই পুস্তকে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা ও সমাবেশে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি। জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষকে চেনা যায় তার প্রাত্যহিক আচরণ ও কার্যকলাপে। সুভাষবাবুর বন্ধুরা, সহকর্মীরা এবং বাংলাদেশের অসংখ্য কংগ্রেসকর্মীরাও জানেন যে, হৃদয়বৃত্তিতে তিনি কতখানি কোমল ছিলেন। অবশ্য বাহিরটা দেখে মনে হ'ত তিনি খুব কঠোর। যাঁদের সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো জ্ঞান নেই, আমার এই বইখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে তাঁরা আমার কথার তাৎপর্য গ্রহণ করতে পারবেন বলে ভরসা করি। বহিরাবরণে কঠোর হলেও, অন্তরে ছিলেন তিনি অতিশয় কোমল।

নিজের ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা ছেড়ে দিলেও আমরা আজাদহিন্দ ফৌজের একাধিক সৈনিকের মুখে সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহারে ও আচরণের কথা যা শুনেছি তাতে আমরা তাঁকে যদি নাও জানতাম, তাহলেও তাঁকে অন্তরঙ্গতা-বিহীন কঠোর প্রকৃতির লোক বলে মনে করতাম না। আজ যাঁরা আজাদহিন্দ ফৌজ সংগঠন ও পরিচালন-ব্যাপারের ইতিহাস সংবাদপত্রে পাঠ করেছেন বা জনসভায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন উচ্চপদস্থ আজাদ-হিন্দ ফৌজের অফিসারদের মুখে 'নেতাজী'র কথা শুনবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই বলবেন যে, একমাত্র 'অন্তরঙ্গতা'-র গুণেই সুভাষচন্দ্র বহু বর্ণ, বহু জাতি ও বহু মতবাদী সহস্র সহস্র সৈনিকের উপর স্নেহ, প্রীতি ও সমবেদনার দাবিতেই অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একান্ত হৃদয়ের কাছে তাদের টেনে আনতে পেরেছিলেন বলেই বহু দুঃখ, বহু ক্লেশ এবং বিপর্যয় ও প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও তিনি তাদের উপর একাধিপত্য করে গেছেন এবং আজও তাদের মুখে আমরা 'নেতাজীর জয়'

ধ্বনি শুনেছি, এখনো তারা তাঁর প্রতি সেই অবিমিশ্র আনুগত্য ও মমত্ববোধ নিয়ে গর্ব করে থাকে। সেই কারণেই আজাদহিন্দ ফৌজে জাতি, ধর্ম ও বর্ণবৈষম্যের কোনো স্থান ছিল না। হৃদয়ী সুভাষচন্দ্রের কথা স্মরণ করেই আজ শানওয়াজের মতো বীর সৈনিক বালকের মতো অশ্রুবর্ষণ করে; নেতাজীর প্রতিকৃতির সামনে নতজানু হয়ে বলে; "নেতাজী, নেতাজী, ক্ষমা করো, তোমার আদেশ পালন করতে পারি নি, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছি কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

একই স্থানে, একই পঙ্‌ক্তিতে, একই খাদ্য গ্রহণ, একই স্থানে বিশ্রাম, নিজের হাতে আহত সৈনিকের সেবাশুশ্রূষা, প্রত্যেকের খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি, ব্যক্তিগতভাবে আদরযত্ন; এ-সকলই মানুষ সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয়। বৃদ্ধাকে নিজের হাতে, পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় তার হাত দুখানি রেখে তার আশীর্বাদ গ্রহণ এবং সেই ঘটনায় স্বদেশে উৎকণ্ঠিতা, স্নেহময়ী জননীর কথা স্মরণ করে অশ্রুবিসর্জন করার সকরুণ দৃশ্যে আমরা মানুষ সুভাষচন্দ্রের সুকোমল স্নেহার্ত হৃদয়েরই পরিচয় পাই। সুভাষচন্দ্রকে কখনো কেউ 'দাদা' বলে ডাকতে পারে নি ব'লে উক্ত লেখক দুঃখ করেছেন। একথা ঠিক যে, তিনি কোনোদিন সার্বজনীন 'দাদা' সেজে নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারান নি, যেমন হারান নি অন্যান্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ। একথা ঠিক যে, সুভাষচন্দ্রের আভিজাত্যবোধ ছিল খুব তীব্র কিন্তু তা অহংকৃত ঔদ্ধত্যে কখনো অসহ্য বা অশোভন মনে হত না। স্বাভাবিক গুণে সে আভিজাত্যবোধ তাঁকে চিরদিন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে আমাদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে রেখেছিল।

(বাহিরের আবরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠিন, হয়তো বা কঠোরও, কিন্তু অন্তরটি ছিল তাঁর রক্তমাংসের মানুষেরই মতো কোমল ও মধুর, তার বাহিরের প্রকাশ অবশ্য হামেশা দেখতে পাওয়া যেত না।) ঠাট্টাবিদ্রূপ বা রসিকতা যে তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল, লেখকের এ ধারণাও ঠিক নয়। স্বগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর চরিত্রের এই দিকটি অতি মধুরভাবেই প্রকাশ পেত। তাঁর প্রকৃতি ছিল, Serious type, অর্থাৎ গুরুগম্ভীর। অতি সামান্য ঘটনা যা আমরা সচরাচর উপেক্ষা করেই চলি, সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও অনুভূতিকে সে ঘটনা আচ্ছন্ন করে দিত। নিজের জীবনের সঙ্গে দেশকে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ মিশিয়ে ফেলেছিলেন; সেখানে 'Compromise' বা আপসের কোনো

স্থান ছিল না। এতে করে রাজনৈতিক জীবনে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা যেমন অসংখ্য হয়েছিল, তেমনি বুদ্‌বুদের মতো ঘটনাস্রোতে তাদের ডুবে যেতেও বেশি সময় লাগে নি। তবু তাঁর জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন বন্ধু যে তাঁর একাধিক ছিল, তার একমাত্র কারণ তাঁর নিজের হৃদয়মাধুর্য ও চারিত্রিক আকর্ষণ।

তা ছাড়া মানুষ সুভাষচন্দ্রের হৃদয় ও অন্তরলোকের সন্ধান যাঁরা পেয়েছেন রাজনৈতিক মতভেদ, দলাদলি ও বিরুদ্ধ ঘটনাপরম্পরার মধ্যেও তাঁদের অন্তরে সুভাষচন্দ্রের জন্য এমন একটি কোমলকান্ত অনুভূতি আছে যা তাঁরা অবসর সময়ে নির্জনে, স্থির মুহূর্তে জাগিয়ে রাখেন, হয়তো বা রাজনীতির শুষ্ক পরিবেশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে, একান্তে সুভাষবাবুর বন্ধুপ্রীতি, সাহচর্য ও সান্নিধ্য কামনা করেন। কেন করেন? একদিন তাঁরা সুভাষচন্দ্রের অন্তরের গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন বলেই। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা তাঁকে প্রিয় হতে প্রিয়তর নেতার আসনে অধিষ্ঠিত রেখেছিল, তবুও যে তাঁকে বারবার অসংখ্য বাধা ঠেলে নিজের পথ ক'রে নিতে হয়েছে, তার জন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চিত্তরঞ্জনের মতো নেতার জীবনেও এমন দুঃখ ও আক্ষেপ করার কারণ বহুবার ঘটেছে। রাজনীতির মধ্যে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাকে মেনে নিতে হয়, ওঁরা মেনে নিয়েছিলেনও। তাই ভবিষ্যতের অভ্যুত্থান অন্ধকার বিদীর্ণ করে প্রকাশ পেল তাঁর আপন মহিমায়। এখন তাই দেখছি, যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একদিন সুভাষচন্দ্রের বিপক্ষতা করেছেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে তাঁর অযথা অসম্মান করেছেন, তাকে অপদস্থ করবার জন্য দল পাকিয়েছেন, নিছক বিদ্বেষ প্রবৃত্তি থেকেই নিন্দা করেছেন, গালাগালি দিয়েছেন; তাঁরাই আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজ হয়তো তাঁরা অন্তরে অন্তরে এজন্য অনুতপ্ত এবং তাঁদের মনের বিদ্বেষ প্রবৃত্তি আজ লোপ পেয়েছে সুভাষচন্দ্রের গুণপনার সত্যকার উপলব্ধিতে।

সুভাষচন্দ্র নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তায় নিজের পথ নিজে করে গেছেন। কর্মজীবনের সূচনা থেকে, পূর্ব এশিয়ার সংগ্রামরত জীবন পর্যন্ত সে জীবনের এখনো শেষ হয় নি বলেই আমরা বিশ্বাস করি। সুভাষচন্দ্রের কথা সেইজন্যেই অন্য হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু এটা ঠিক যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের অত্যন্ত শোচনীয় দুর্গতি এই বিদ্বেষ-

প্রবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন, 'বরযাত্রিক মনোবৃত্তি'। আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই নীচ মনোভাবের চরম বিকাশ দেখেছি কিছুকাল পূর্ব অবধি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকই অকারণে অবথা ব্যক্তিগত আক্রমণে পুনঃ পুনঃ অপমানিত হয়েছেন। আবার সাহিত্য যাঁদের ধর্ম নয়, পেশা, তাঁরাও রাজনীতিক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ ক'রে নেতৃস্থানীয় সম্মানী ব্যক্তিদের অসম্মান করেছেন; এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। কিন্তু যে মহৎজীবন নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা, তার মধ্যে কোনো 'ছোটো কথা'র অবতারণা করতে চাই না। কিন্তু এ কথা এই প্রসংগে বলে রাখা দরকার যে, সত্য প্রতিষ্ঠার অজুহাতে অভব্য সমালোচনার মধ্যে যেখানে হিংস্র নখদন্তের বিকাশ দেখি, সেখানে ভদ্র মন স্বভাবতই সংকুচিত হয়ে পড়ে। দেশের এই সংকট মুহূর্তে আমরা কি এই বিদ্বেষের পঙ্কিল পথ পরিহার ক'রে চলতে পারব না?

বসু-পরিবার

ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের আলোচনার সংগে প্রাসংগিকভাবে এসে পড়ে, তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন— সেই পরিবারের কথা। তাঁর জীবনের গতিবেগ-প্রাবল্যে সেই পরিবারটি ভেঙেচুরে একটি বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। আজকের দিনে সেই বসু-পরিবারের কথা ভাবতে গেলে, সুভাষচন্দ্রের আই. সি. এস. ছাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে আজাদহিন্দ ফৌজ ও আজাদহিন্দ গভর্নমেন্ট গঠন, অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের ভিত্তি স্থাপনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মহিমান্বিত বলেই মনে হয়। সুভাষচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ, শ্রদ্ধাস্পদ শরৎচন্দ্র বসু, দেশের জন্য অশেষ নির্যাতন ভোগ ক'রে, ত্যাগে ও দুঃখবরণে দেশবরেণ্য সর্বভারতীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অরবিন্দ, দ্বিজেন্দ্র, অমিয়নাথ, শিশিরকুমার প্রভৃতি সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত। অরবিন্দ ও দ্বিজেন্দ্রের কারাগৃহে যে অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে, তাতে তাঁরা সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। অমিয়নাথ আজ মুক্ত ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (I.N.A.) বা আজাদহিন্দ ফৌজের আশ্রয়ের ব্যবস্থা, সেবা ও সাহায্যের কাজে আত্মনিয়োগ করে সমগ্রদেশের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

তাঁদের 'রাঙাকাকা' আজ শুধু ভারতবর্ষের নয়, অন্যান্য স্বাধীন দেশেও 'নেতাজী' বলে অভিনন্দিত। তাঁরা যে বংশে সৌভাগ্যক্রমে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে বংশ আজ পবিত্র, সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা হবেন গৌরবান্বিত।

এইরকম পরিবেশে মানুষ বদলে যায়। তার মন, তার আদর্শ ও আচরণের পরিবর্তন ঘটে। কয়েক বৎসর পূর্বে পিতা জানকীনাথ বসুর কটকের বৃহৎ বাড়িটি কংগ্রেসের নামে পুত্রেরা (বসু ভ্রাতারা) উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আবার সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এবং তাঁর জনৈক বন্ধুর আনুকূল্যে লক্ষাধিক টাকায় উত্তমর্ণের ঋণশোধ করে দায়মুক্ত অবস্থায় ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িখানিও 'নেতাজীভবন' নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। সিকি অংশ ছাড়া, বাড়িখানি মুক্ত জাতীয় বাহিনীর আশ্রয় ও বিশ্রাম আবাসন হয়েছে। নেতাজী ফিরে আসার পর তিনি যেভাবে দেশের কাজে বাড়িটি ব্যবহার করতে ইচ্ছা করেন, সেইভাবেই করতে পারবেন, এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র যে ঘরটি থেকে একদিন অন্তর্ধান করেছিলেন, সে ঘরটিকে, এবং তাঁর অফিস, লাইব্রেরি ও বসবার ঘর প্রভৃতি ঠিক যেমন ছিল, তেমনিভাবে রাখা হয়েছে। 'নেতাজীভবন' এখন থেকে ভারতের পুণ্যতীর্থ-রূপেই পরিগণিত হবে।

কেমন করে একটি পরিবারে এইপ্রকার আমূল পরিবর্তন ঘটল, এ প্রশ্ন আজ আর কারো মনে জাগবে না। কারণ সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবনের অভূতপূর্ব কীর্তিকলাপের দ্বারা সকল প্রশ্নেরই সমাধান ক'রে দিয়েছেন। আমরা যারা দেশসেবক সুভাষচন্দ্রকে জানি, মানুষ সুভাষচন্দ্রকে জানি, তাদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামরত সর্বাধিনায়ক নেতাজীকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ না ঘটলেও প্রকাশিত তথ্য ও আনুপূর্বিক ঘটনাগুলির সহিত পরিচিত হয়ে তাঁকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারা কঠিন হবে না। যাঁরা তাঁকে সম্যকভাবে জানতেন না, তাঁরাও এই বইখানি পড়ে সুভাষচন্দ্র ও নেতাজীর আসল পরিচয় পাবেন।

কেহ হয়তো মনে করতে পারেন যে, এমনই যখন সুভাষচন্দ্র, তখন তাঁকে বিপক্ষতা সহ্য করতে হয়েছিল কেন ? আমাদের মনে হয় যে, স্বরাজ্যদলের উপর ব্যক্তি বা দলবিশেষের বিরুদ্ধ মনোভাবই সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তৎকালীন বিপক্ষতার কারণ হয়েছিল। গান্ধীজি স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের ভিতর থেকে কাউন্সিলে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের মতামত বা কর্ম-পদ্ধতির জন্য তখন কংগ্রেস থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করে দেবার কোনো প্রস্তাব উঠেছিল বলে আমরা শুনি নি। ঠিক কংগ্রেসনীতির দিক থেকে কোনো প্রশ্ন তখন উঠেছিল কিনা, তাও জানি না, এবং উঠলেও সে অনুসারে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা তখন যে করা হয় নি, এ-কথা নিশ্চিত। যদিও উত্তরকালে আমরা তার ব্যতিক্রম দেখতে পেলাম সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুভাষচন্দ্র যখন মনে করলেন যে, কংগ্রেসের তৎকালীন কর্মপদ্ধতি ও মনোভাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সুযোগকে আরো দীর্ঘকাল পিছিয়ে দেবে, এবং তারই প্রতিবিধানের জন্য 'আপসহীন' সংগ্রাম চালাবেন ব'লে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন, তখনি তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করা হ'ল।

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গান্ধীজীর কাউন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে রফা হওয়া, গোঁড়া কংগ্রেসী (No-changer) বা চিত্তরঞ্জনের আজীবন বিদ্বেষী অথবা কংগ্রেসের ধারে কাছে ভুলেও আসেন নি, এমন অনেকেই খুব খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন এবং যেহেতু স্বরাজ্যদলের প্রধানকর্মী এবং চিত্তরঞ্জনের প্রিয়তম শিষ্য সুভাষচন্দ্র, সেজন্য তাঁর উপর গিয়ে পড়ল তাঁদের আংশিক বিদ্বেষ। তাঁদের এই বিদ্বেষ নানাভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অদম্য উৎসাহ, অনমনীয় সংকল্পের দৃঢ়তা, তীব্র দেশপ্রীতি, দুর্জয় সাহস ও অসীম কর্মশক্তি, মিথ্যা-প্রচারকে উপেক্ষা করে চলার মতো মানসিক বল, দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন বরণ করে নেওয়ার জন্য নিরন্তর প্রস্তুতি, তাঁকে সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল, বাঙলা ও ভারতবর্ষের নেতৃত্বের চিরআকাঙ্ক্ষিত উচ্চ আসনের দিকে।

এর প্রমাণ পেলাম আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে। সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলীর মধ্যে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে, আজ তার সম্যক বিচারের প্রয়োজন হয়েছে ; কোনো যোগ্যতর লেখকের হাতে তার পক্ষপাতশূন্য বিচার-বিশ্লেষণের

প্রত্যাশায় বর্তমানযুগ হয়তো অপেক্ষা করে থাকবে, কিন্তু নেতাজীর পরমাশ্চর্য কার্যকলাপের গুরুত্বে সেদিনকার সুভাষচন্দ্রের বাধাবিপত্তি ও বিদ্বেষ-সংকুল উদ্বিগ্ন দিনগুলির কথা তখন হয়তো আর কারো মনেও থাকবে না। তবে আমাদের মতো যারা দীর্ঘদিন তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে নিকটে পেয়ে তাঁর কর্ম-জীবনের সংগে সংশ্লিষ্ট থাকবার সুযোগ লাভ করেছে, সেদিনের দলবিভক্ত রাজনৈতিক বাঙলার সংকট-সমাকীর্ণ পথে তাঁকে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে দেখেছে, দিবস-রাত্রির সুখদুঃখ আশানিরাশার মধ্যে তাঁর সস্নেহ প্রীতি-পরিপূর্ণ বন্ধুত্ব লাভ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছে; তারা 'নেতাজী'কে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবে, কিন্তু 'সুভাষচন্দ্রে'র সেই দুশ্চর্য সাধনার দিনগুলির কথা ভুলতে পারবে না।

সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড ব্লক

সভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে থেকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর দ্বারা জনমত গঠন ক'রে দেশকে 'আপসহীন সংগ্রাম'-এ উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। এতে যদি অপরাধের কিছু থাকে তা হলে স্বরাজ্যদল গঠনে চিত্তরঞ্জনও সমভাবে অপরাধী ছিলেন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর সমালোচনা করেছিলেন, চিত্তরঞ্জনও গান্ধিজীর চৌরিচৌরার ব্যাপারকে 'Himalayan Blunder' বলতে কুণ্ঠিত হন নি। আমাদের মনে হয়, এই দুই ক্ষেত্রে কাজের ধারা অনেকটা একরকমের হলেও, কংগ্রেস বা গান্ধিজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কোথাও এমন একটি মতানৈক্য ঘটেছিল, যার জন্য সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-সভাপতি (ত্রিপুরী) হওয়াতে মহাত্মাজী উৎফুল্ল না হয়ে ক্ষুণ্ণ হলেন, এবং বললেন, "সুভাষচন্দ্রের জয়, আমারই পরাজয়।"

কিন্তু গান্ধিজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা যে পূর্বাপর অক্ষুণ্ণ ছিল, তার প্রমাণ তিনি পূর্বএশিয়ায় গিয়েও যথেষ্ট দিয়েছেন। তার আলোচনা আমরা স্থানান্তরে করেছি। গান্ধিজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ২ অক্টোবর (১৯৪৩) তারিখে ব্যাংকক থেকে তাঁর বেতারভাষণে প্রকাশ পেয়েছে :

"For twenty years and more Mahatma Gandhi has worked for India's salvation, and with him the Indian people too have worked. It is no exaggeration to say that if in 1920, he had not

come forward with his new weapon of struggle, India to day would perhaps have been still prostrate. His services to the cause of India's freedom are unique and unparallaled. No single man could have achieved more in one single life-time under similar circumstances.'

"Since 1920, the Indian people have learnt two things from Mahatma Gandhi, which are the indispensable preconditions for the attainment of independence. They have first of all learnt national self-respect and self-confidence, as a result of which, revolutionary fervour is now blazing in their hearts. Secondly, they have now got a countrywide organisation, which reaches the remotest villages of India... Mahatma Gandhi has firmly planted our feet on the straight road to liberty. He and other leaders are rotting behind the prison-bars. The task that Mahatma Gandhi began has, therefore, to be accomplished by his countrymen, at home and abroad. Indians at home have everything that they need for the final struggle, but they lack in one thing, an army of liberation, that army of liberation has to be supplied from without, and it can be supplied only from without."

অর্থাৎ, বিশ বছর কি তারও বেশি মহাত্মাগান্ধী ভারতের মুক্তির জন্য কাজ ক'রে গেছেন ! তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন ভারতবাসীরাও। এটা অত্যুক্তি নয় যে, ১৯২০ সালে, তিনি সংগ্রামের নূতন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে না এলে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষ বোধহয় তেমনি শক্তিহীন অবস্থায় পড়ে থাকত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর কাজ অদ্বিতীয় ও তুলনাবিহীন। একটি জীবনে একজনের পক্ষে এইপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এতখানি সাফল্য-অর্জন আর কেউ করতে পারত না।

১৯২০ সাল থেকে (মহাত্মাগান্ধীর কাজ থেকে ভারতবাসীরা দুটি জিনিস শিক্ষা পেয়েছে।) সে দুইটি জিনিসই স্বাধীনতালাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। প্রথম শিখেছে তারা (জাতীয় আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাস ;) যার ফলে আজ তাদের অন্তরে বৈপ্লবিক উৎসাহ ও প্রেরণা জাগ্রত আছে। দ্বিতীয়ত তারা দেশব্যাপী এমন একটি প্রতিষ্ঠান পেয়েছে, যার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে

সুদূরবর্তী পল্লী পর্যন্ত।·) মহাত্মাগান্ধী স্বাধীনতার সোজা পথে আমাদের দৃঢ়পদে চলতে শিখিয়েছেন। তিনি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ কারারুদ্ধ। সেইজন্য যে কাজ মহাত্মাগান্ধী আরম্ভ করেছেন, তাঁর স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থিত দেশবাসীদেরই সে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতবাসীরা শেষ সংগ্রামের উপযোগী সব-কিছুই প্রস্তুত রেখেছেন, কিন্তু তাঁদের একটি জিনিসের অভাব আছে; মুক্তিফৌজের। সেই মুক্তিফৌজ ভারতের বাহির থেকে জোগাতে হবে, এবং সেই সেনাবাহিনী একমাত্র বাহির থেকেই জোগানো যেতে পারে।

পক্ষান্তরে মহাত্মাগান্ধী বলছেন :—

"I have not read what Subhasbabu is reported to have said about me. But I am not surprised at what you tell me. My relations with him wore always of the purest and best. I always knew his capacity for sacrifice. But a full knowledge of his resourcefulness, soldiership and organising ability came to me only after his escape from India. The difference of outlook between him and me as to the means of attaining the common goal is too well known for comment."

অর্থাৎ, সুভাষবাবু আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন বলে প্রকাশিত হয়েছে, আমি তা পড়ি নি, কিন্তু আপনি, কিন্তু আপনি যা বলছেন, তাতে আমি বিস্মিত নই। তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সর্বদাই সর্বোত্তম ও পবিত্রতম ছিল। তিনি যে কী পরিমাণ ত্যাগস্বীকার করতে পারেন, তা আমি জানতাম, কিন্তু তাঁর বিপুল আয়োজন, সামরিক গুণপনা এবং সংগঠনশক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল আমার তিনি ভারতবর্ষ থেকে অন্তর্ধান করার পর। একই লক্ষ্যে পেঁছিবার উপায় সম্পর্কে আমাদের দুজনের মতদ্বৈধের কথা সকলের কাছে সুবিদিত, কাজেই, সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

উপায় সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকলেও কংগ্রেসের 'Fundamentals' থেকে আরম্ভ করে National Planning এবং Constitution making, অর্থাৎ মূলনীতি ও কার্যক্রম তৈরি, জাতীয় সংগঠন ও শাসনব্যবস্থার বিধিবন্ধ পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্র তাঁর রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে, জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে একাধিক-বার উপস্থিত করেছিলেন, তত্রাচ তাঁর প্রতি সম্যক বিচার করা হয়েছিল বলে আমরা মনে করি না। গত মহাযুদ্ধের ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে তিনি যে পূর্ব-

নির্দেশ করেছিলেন, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের আন্তর্জাতিক জ্ঞানের তারতম্যের জন্যই সে-সব কথা তখন আমল পায় নি। আজ যে Constituent Assembly বা গণপরিষদ গঠিত হতে চলেছে, তার প্রয়োজন ও সার্থকতার কথা তখন, সুভাষচন্দ্র যখন বলেছিলেন, তখন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তা উপলব্ধি করেন নি, বা করতে প্রস্তুত হন নি। Indian Republican Government. বা ভারতীয় সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রই প্রথম। কিন্তু বার বার সুভাষচন্দ্রের সে-সকল প্রস্তাব উপেক্ষিত হয়েছিল, কেন হয়েছিল, তার রহস্য হয়তো একদিন ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

একথা আমরা সকলেই জানি, এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে একথা আমরা বলতে পারি যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণের সহযোগিতার অভাবেই সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, তিনি ভুল করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপরম্পরায় একথা মনে করা যায় যে, তিনি ভুল করেন নি, ঠিকই করেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মতো কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তিনি যে তাঁর কার্যক্রম অনুসরণ করার সুযোগ পাবেন না, একথা সুভাষচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই আমরা দেখলাম, কংগ্রেস থেকে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার পর থেকেই তিনি সরাসরিভাবে নিজের ভাবাদর্শে জনমত গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। সারা ভারতবর্ষে চলতে লাগল তাঁর অবিশ্রান্ত সফর, সভা-সম্ভাষণ, দলগঠন ও কর্মতালিকা প্রস্তুত। তাঁর মনের দৃঢ়তা, কর্মক্ষমতা ও অফুরন্ত উৎসাহের বলে তিনি অল্পকাল মধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক'কে সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংঘে পরিণত করলেন; যার প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেলাম রামগড়-কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনের পাশে 'আপস বিরোধী সম্মেলন'-এ।

গান্ধীজি ও কংগ্রেসের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্য

একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, গান্ধীজি ও কংগ্রেসের উপর এতৎসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের আনুগত্য, বিশ্বাস ও অনুরাগ পূর্বাপের অক্ষুন্ন ছিল। গান্ধীজিকে

তিনি Father of our Nation, ভারতবাসীর পিতৃস্থানীয় ব'লে, সুদূর সিংগাপুর থেকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই, কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর পর সুভাষচন্দ্র নিজের কার্যকলাপ সম্পর্কে গান্ধীজিকে বেতারযোগে জানাচ্ছেন :—

"Mahatmaji, after the sad demise of Srimati Kasturba in British Custody, it was natural for our countrymen to be alarmed over the state of your health. For Indians outside India, differences in method are like domestic differences. Ever Since you sponsored the Independence Resolution at the Lahore Congress in December 1929, all members of the Indian National Congress have had one common goal before them. For Indians outside India, you are the creator of the present awakening in our country... Mahatmaji, I should now like to say something about the Provisional Government that we have set up here. The Provisional Government has as its one objective, the liberation of India.

Father of our Nation ! In this holy war for India's liberation, we ask for your blessing and good wishes."

"মহাত্মাজী, ব্রিটিশের বন্দীনিবাসে শ্রীমতী কস্তুরবার শোকাবহ মৃত্যুর পর, আমাদের দেশবাসীর পক্ষে আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে শংকিত হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের কাছে, স্বাধীনতালাভের উপায় সম্বন্ধে পার্থক্য ঘরোয়া বিরোধের মতো। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর-কংগ্রেসে আপনি যে স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছিলেন, সেই থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণের সম্মুখে একই মাত্র লক্ষ্য আছে। ভারতের বাহিরে, ভারতীয়দের কাছে, আমাদের দেশের বর্তমান জাগরণের আপনিই স্রষ্টা··· মহাত্মাজী, আমরা এখন এখানে যে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট স্থাপন করেছি, সে সম্বন্ধে আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করতে চাই। এই গভর্নমেন্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।···

আমাদের জাতীয়ভাবোধের স্রষ্টা আপনি, আজিকার দিনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের এই পবিত্র সংগ্রামে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি।"

তা ছাড়া কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দের নামে সেনাবাহিনীর নামকরণ ও

আজাদহিন্দ ফৌজ ও গভর্নমেন্টের তরফ থেকে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা প্রতীক হিসাবে গ্রহণ ও মর্যাদা-দানের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অনুরাগ ও আনুগত্যই প্রকাশ পায়।

২৩ জানুয়ারি (১৯৪৬) নেতাজীর জন্মদিনে মেজর জেনারেল শানওয়াজ বলেছেন, "আমরা নেতাজীর কাছ থেকে আদেশ গ্রহণ করতাম। তাঁর শেষ আদেশ ছিল আমাদের প্রতি, follow the leadership of the Indian National Congress অর্থাৎ, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার নেতৃত্ব মেনে চলবে।" মে. জে. শানওয়াজ আরো বলেছেন, "Netaji Bose's actual words were —Indian National Congress is the flesh of my flesh and the bone of my bone ; অর্থাৎ, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস আমার দেহের রক্ত, জীবনের জীবন। শানওয়াজ আই. এন. এ. সৈনিকদের লক্ষ্য করে বলেছেন :

"The task we had undertaken has not yet been fulfilled. We will have to continue the fight although in a different way. Netaji is no longer with us today. But you must not be disheartened. We will have Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Pandit Nehru, Mr. Sarat Ch. Bose and other leaders behind us. So long we were fighting with arms. Now we will fight in a different way under the guidance of Mahatma Gandhi and other leaders, who will always keep you all in their minds."

অর্থাৎ, আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছিলাম, সে কাজ এখনো শেষ হয় নি। যুদ্ধ আমাদের চালাতে হবে, কিন্তু সে অন্য উপায়ে। আজ নেতাজী আমাদের সঙ্গে নেই, কিন্তু তোমাদের নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না। আমাদের পিছনে আছেন মহাত্মাগান্ধী, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মিঃ শরৎচন্দ্র বসু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এতদিন আমরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছি, এখন আমরা অন্যভাবে যুদ্ধ করব। আমাদের পরিচালিত করবেন, মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা সর্বদা তোমাদের কথা মনে রাখবেন।

তবুও সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক মতভেদের জন্য প্রথম কর্মজীবনের বিশ্বস্ত সহকর্মী ও অনুরাগী বন্ধুদের মধ্যে অনেকের সাহচর্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের আশ্চর্য সাহস ও দুর্জয় অভিমান তাঁকে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গেল যে, তাঁকে প্রথমটা বহুজন-সমাদৃত হয়েও নিজের শক্তির উপর বেশির ভাগ নির্ভর করতে হয়েছিল। দৃঢ়

আত্মপ্রত্যয়, অসীম মানসিক বল এবং ঈশ্বরের প্রতি অটুট নির্ভরতার জন্যই দুই দুইবার তাঁর যক্ষ্মা রোগও আরোগ্য হয়ে গেল ; অতি দুঃসাধ্য সম্পূর্ণ অপরিচিত সামরিক জীবনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতেও তিনি এতটুকু ক্লেশ বা দ্বিধা বোধ করলেন না। দুর্গম পার্বত্য পথে, চড়াই উতরাই পার হয়ে, বাইশদিনের মাথায় নিজের খাদ্য পিঠে বহন করে ভারী রাইফেল প্রভৃতি কাঁধে চাপিয়ে তিনি অবিরাম অগ্রসর হয়ে যেতে লাগলেন, তার জীবন-মরণের পণকে সফল ও সার্থক করে তুলতে। কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা তাঁকে আটকে রাখতে পারল না।

সুভাষচন্দ্রের উপর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেমন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, বাংলা কংগ্রেস থেকেও সেইরকম Ban বা নিষেধাজ্ঞা স্বরাজ্য-পার্টির পঞ্চমুরুব্বীর অন্যতম নলিনীরঞ্জন সরকারের উপরেও জারি করা হয়েছিল। এই কারণে নলিনীবাবু কংগ্রেস সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অফ্ কমার্স (Bengal National Chambers of Commerce)-সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৩৭ সালে এ ঘটনা ঘটে। নলিনীবাবু নির্বাচিত হয়ে আইন পরিষদে আসেন এবং মন্ত্রীমন্ডলে অর্থ সচিবের পদ গ্রহণ করেন। কংগ্রেস থেকে যে নিষেধ তাঁর উপর জারি করা হয়েছিল, তার সদুত্তর তিনি দিয়েছিলেন, কয়েক হাজার রাজবন্দীর মুক্তিদানের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে। তাঁর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার যে শর্তটি তিনি মন্ত্রীমন্ডলে দিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে রাজবন্দীর মুক্তি।

তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনের সহিত তাঁর দীর্ঘকাল এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার ফলে বহুসংখ্যক রাজবন্দীর মুক্তির অনুকূলে গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গভর্নরের আশঙ্কা ছিল যে, এই-সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিলে তাঁরা বাইরে এসে আবার সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করবেন। এ-বিষয়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে নলিনীবাবুর পত্রবিনিময়ের ফলে স্থির হয় যে, গভর্নরের সঙ্গে গান্ধীজি সাক্ষাৎ ক'রে রাজবন্দীদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। গভর্নর তখন দার্জিলিঙে, কিন্তু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বললেন, যে গান্ধীজির স্বাস্থ্য দার্জিলিং যাওয়ার পক্ষে একেবারেই অনুকূল নয়। তখন, নলিনীবাবুর চেষ্টায় বারাকপুর গভর্নমেন্ট হাউসে, গান্ধী-অ্যান্ডারসন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হ'ল এবং গান্ধীজির আশ্বাসবাক্যে গভর্নর

রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হলেন। পরে ইউরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইউরোপীয়ান এবং স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতিকে নলিনীবাবু নিজ বাড়িতে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে রাজী করান।

এইভাবে, নলিনীবাবুর চেষ্টায় যখন ব্যাপারটা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন একদিন গভর্নর অ্যান্ডারসন বললেন যে তিনি, হিজলি বন্দী আবাসে, রাজবন্দীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে চান। সেই সময় একটি পুল খোলার ব্যাপারে গভর্নরকে মেদিনীপুর যেতে হয়েছিল। নলিনীবাবু সেই সুযোগ নিয়ে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেন এবং তার অব্যবহিত পরেই, তাঁরা দু'জনে এবং আরো প্রায় কয়েক হাজার রাজবন্দী বিভিন্ন জেল থেকে খালাস পান।

এখানে এই ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, কংগ্রেস সব সময়েই যে অভ্রান্তভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন, একথা মনে করা যায় না।

অবশ্য সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার সঙ্গে নলিনীবাবুর দেশসেবার তুলনা করা চলে না তা আমরা জানি। সে-দিক থেকে নলিনীবাবু কোনোদিন গোঁড়া কংগ্রেসী ব'লে নিজেকে জাহির করেন বলে কখনো শুনি নি, কিন্তু দেশবন্ধুর সময় থেকে বাঙলা কংগ্রেসকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছেন, একথা আমরা জানি। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর অনুরাগ না থাকলে, কংগ্রেসের Ban মাথায় করে তিনি রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য এতখানি চেষ্টা নিশ্চয়ই করতেন না। আজ শুধু জেলে যাওয়ার ছাড়পত্র নিয়ে কংগ্রেসে মোড়লি করা যে চলবে না, সে-কথা সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজি বলেছেন। যার কাছ থেকে দেশ যেটুকু সেবা পায়, যতখানি আনুগত্য ও সহায়তা কংগ্রেস লাভ করতে পারে, সেটা যে উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যানের বিষয় নয়; এইটুকুই আমার বলার উদ্দেশ্য।

সুভাষচন্দ্রের বন্ধু ও সহকর্মী

কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকের কাছ থেকে দূরে চলে গেলেও, এই পৃথক যাত্রায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গীর

অভাব হয় নি। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান থেকে কংগ্রেসের আজীবন সেবক, এমন অনেকে কংগ্রেসের শাস্তিমূলক আদেশ উপেক্ষা করেও ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেছিলেন। স্বামী সহজানন্দ, শার্দুলসিং কভিসার, হরিবিষ্ণু কামাথ, শীলভদ্র যাজী, বিশ্বম্ভরদয়াল ত্রিপাঠী প্রভৃতি বিখ্যাত কংগ্রেস নেতারাও ক্রমশ সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাঙলাদেশের একাধিক প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী নেতা ও কংগ্রেসকর্মী, এই সংকটকালে সুভাষবাবুর সহায়তা করতে লাগলেন। তিনি কর্মী পেলেন, ত্যাগীও পেলেন ; আনুগত্য, নিষ্ঠা ও দুঃখ-বরণের সাহসের অভাব হ'ল না তাঁর দলে। নিজের বন্ধনদশা, ভগ্নস্বাস্থ্য, অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যে তাঁর সান্ত্বনা লাভের অভাব ছিল না। তার মূলে ছিল কর্মপথের অসংখ্য সহযাত্রীর ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতনভোগের বহুল দৃষ্টান্ত।

তা ছাড়া, দেশের মধ্যে তরুণদের মন সুভাষচন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগে আকৃষ্ট হতে দেখা গেল এবং অন্যপ্রদেশ ছাড়াও, বিশেষ করে বাঙলাদেশে তাঁর পুরাতন বিরুদ্ধাচারীদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সংগতিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তিকে সুভাষচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল ; তাঁদের শক্তিসামর্থ্য ও আনুকূল্য দিয়ে তাঁর আরব্ধ কাজকে সফল করে তুলতে। সুভাষচন্দ্রের পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে অবশ্য মনে করেন যে, এঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য, সুভাষবাবুর প্রভাবপ্রতিপত্তি বজায় রাখতে বিশেষ কাজে লাগলেও, সেই পুরাতন বন্ধু-সহকর্মীদের সংগে পুনর্মিলনের পথে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অন্তরায় সাধন করেছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পুনর্মিলন ঘটার পথে প্রধানতম বাধা ছিল, আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির পার্থক্য। যদি স্বীকারই করা যায় যে, ব্যক্তি বা দলবিশেষের অবাঞ্ছিত আওতায় সুভাষচন্দ্র নিজেকে দূরে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবুও মূলনীতি, আদর্শ ও কর্মধারার যে প্রভেদ ছিল, তার সমন্বয় সাধন হতে পারত কেমন করে? অফিসিয়াল কংগ্রেসের কিরণশংকর প্রভৃতি বন্ধুগণের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক অব্যাহত থাকলেও, তাঁদের পক্ষে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান না করে, সুভাষচন্দ্রের সহায়তা করা, সেই কারণেই কোনোরকমে সম্ভব ছিল না। অতএব, যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে সুভাষচন্দ্র আদি কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি পরিহার করে একদা সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করলেন এবং বৈদেশিক সাহায্যে ভারতবর্ষকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন, সেদিক

থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় যে, সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন কার্যকলাপের সাময়িক বিরুদ্ধাচরণ তাঁর আগামীদিনের সাফল্যের পথকে অনেকটা প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

(কংগ্রেসের তরফ থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার অক্ষুন্ন দাবি, সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রই পেশ করেন, গান্ধী প্রমুখ বয়োবৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও।) এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনার কৃতিত্ব, দায়িত্ব এবং গৌরব যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রেরই প্রাপ্য, একথা বোধহয় নিঃসংশয়ে বলা যায়। ১৯২৮ সালের কলিকাতা-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের এই প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজির সংগে আপস-মীমাংসার চেষ্টা ও তার ফলাফলের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পণ্ডিত জওহরলালের সভাপতিত্বে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে, লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি পেশের কথাও আমরা জানি। লাহোর-কংগ্রেসে 'স্বাধীনতা'-র সংকল্প (Independence Resolution) গান্ধীজি স্বয়ং যদি উপস্থাপিত না করতেন এবং নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল যদি তার সমর্থন না করতেন, তা হলে সুভাষচন্দ্র বাঙলা, পাঞ্জাব এবং মহারাষ্ট্রের পূর্ণ সহযোগিতায় স্বাধীনতার সংকল্প অনায়াসেই ভোটাধিক্যে পাস করিয়ে নিতে পারতেন। সুতরাং ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের 'স্বাধীনতা'র সংকল্প যে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে পেশ করা হয়েছিল, একথা ঠিক বলা যায় না। এর কারণ গান্ধীজি প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণে এযাবৎকাল প্রস্তুত ছিলেন না। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে, আমাদের এই মন্তব্যের তাৎপর্য গ্রহণ করা কঠিন নয়। কারণ, একথাও আমরা জানি যে, যখন সুভাষচন্দ্র লাহোর-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত (ভারতের স্বাধীনতা) কার্যে পরিণত করার উপায়স্বরূপ অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতে সাধারণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট ('Provisional Government of the Republic of the United States of India') স্থাপনের প্রস্তাব করলেন, তখন সে প্রস্তাব কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ অগ্রাহ্য করলেন। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী মন ও তাঁর সতত সংগ্রামশীল কর্মনীতি, তদানীন্তন কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের মনঃপূত ছিল না বলেই বহুদিন

যাবৎ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তত্রাচ, কংগ্রেসের তরুণতম নেতা হয়েও দুই-দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সুভাষচন্দ্রের প্রতি দেশের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

বিংশশতকের প্রথমভাগে 'যুগান্তর' প্রভৃতি বিপ্লবী সংঘের পরিবেশের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার ভাবাদর্শ গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়। সেই হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে বিপ্লবী বাঙলার এক অপূর্ব সৃষ্টি বলা চলে। কাজেই তাঁর সঙ্গে এযাবৎকালের রাজনৈতিক আন্দোলনকারী কংগ্রেসের মতের সম্পূর্ণ মিল না হওয়ারই কথা। কংগ্রেস যখন শাসক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সুখ-সুবিধা আদায় করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন বাঙলাদেশ থেকেই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পূর্ণদাবি উপস্থিত করা হয়েছিল। খ্যাতনামা লেখক ও বিপ্লবী ড. তারকনাথ দাসের নিম্নের এই উক্তিটি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি :—

"Subhaschandra Bose was the product of Indian Revolutionary movement of Bengal, nurtured at the beginning of the twentieth century by those, who were known as the Jugantar group and others. The majority of the Congress Leaders were constitutional agitators, seeking some concessions from the alien rulers, whereas it was from Bengal that the first demand for absolute Independence of India from a foreign yoke came."

ড. দাস 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অবদান যে কী পরিমাণ, তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির কথা প্রথমত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়, বাঙলাদেশের গুপ্তসমিতির যে-সকল সভ্যবৃন্দ তখন ভারতের মুক্তির জন্য গোপনে কাজ করছিলেন, তাঁদেরই মনে জাগে এবং জাতীয়রাষ্ট্র সভার (National Congress) যে কর্মনীতি, 'attainment of Independence of India by all possible and legitimate means', অর্থাৎ সর্বপ্রকার সম্ভাব্য ও বৈধ উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ—তাঁরা তার পরিবর্তনের আবশ্যক বোধ করেন। কংগ্রেস-কর্তৃক এ প্রস্তাব গৃহীত না হলেও, একটা রফা ক'রে 'স্বাধীনতা'র বদলে তখন 'স্বরাজ' কথাটির প্রবর্তন করা হয়েছিল।

ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে, ভারতের বিপ্লবীরা দেশে ও বিদেশে

কিভাবে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টাকে অব্যাহত রেখে চলেছিলেন, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা পাই, ড. দাসের এই সুলিখিত প্রবন্ধটিতে। তিনি লিখেছেন যে, কংগ্রেস পূর্বাপর বিপ্লবীদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে ভরসা পান নি বটে, কিন্তু ১৯০৬ সালেই আমেরিকা থেকে বাঙলার বিপ্লবীদের বাণী শোনা গেল, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত 'স্বাধীন হিন্দুস্থান' নামক পত্রিকায়। এই পত্রিকার আদর্শবাক্য ছিল :

"Attainment of Indian Independence and establishment of a Federated Republic of the Unites States of India." অর্থাৎ, ভারতের স্বাধীনতালাভ এবং যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সন্ধিবন্ধ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থই হচ্ছে— ভগবানের প্রতি আনুগত্য ও মানবসেবা ; ভগবদ্‌গীতার এই যে শিক্ষা, তা থেকেই উপরোক্ত ঘোষণার উদ্‌ভব এবং এই ছিল বিপ্লবীদের রাজনীতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। এক কারণেই ড. দাসের মতে, ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প যে, বর্তমানযুগের কংগ্রেস নেতাদেরই সৃষ্টি, এ ধারণা ঠিক নয়, ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষীয় দেশপ্রেমিকদের রক্তে রয়েছে তার মূলদেশ গভীরভাবে প্রোথিত। ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন ব'লে, তোপের মুখে তাঁদের মধ্যে অনেককেই প্রাণ দিতে হয়েছিল।

তারপর ভারতের, বিশেষ ক'রে বাঙলার বিপ্লবীদের দীর্ঘ ২৬ বৎসরের (১৯০৪-১৯৩০) প্রাণপণ চেষ্টা চলল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য এবং ১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হ'ল লাহোর-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির এই তো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বৈদেশিক শক্তির সহিত যোগাযোগ

ড. দাস-প্রদত্ত এই-সকল তথ্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনে ভারতের পক্ষে যে-সকল সুযোগ আসার সম্ভাবনা, সেগুলির যথাযথ সুবিধা গ্রহণ করা, অর্থাৎ সেই সুযোগে বৈপ্লবিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করতে না পারলে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়— এ ধারণা একেবারেই অভিনব নয়।

সাভারকারের 'The Indian War of Independence of 1857' (১৮৫৭

সালের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম) পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে সংগঠিত গুপ্তসমিতির বৈদেশিক মন্ত্রীরূপে আজিমুল্লা খান, তুরস্ক, রুশিয়া এবং পারস্যদেশে গিয়ে সেই-সকল জাতির সাহায্য চেয়েছিলেন। এটা ঘটে ঠিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (Crimean War) পর। ব্রিটেনের পরম মিত্র তুরস্ক, রুশিয়ার সঙ্গে লড়াই করে তখন অটোমান সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire) অস্তিত্ব রক্ষা করছিলেন। কাজেই, ব্রিটেনের শক্তি হ্রাস হতে পারে, এমন কোনো ভারতীয় বিপ্লবে সহায়তা করা তখন তুরস্কের পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং সে ইচ্ছাও তার ছিল না বলেই মনে হয়।

বস্তুত ব্রিটেনের অনুকূলে তুরস্ক সেদিন সমগ্র মোসলেম জগৎকে সাহায্য করবার জন্য আহ্বান করলে, তদানীন্তন হায়দ্রাবাদের নিজাম, এই আহ্বান বা ঘোষণা অনুযায়ী কাজও করেছিলেন। রুশিয়া ও পারস্য সেদিন ব্রিটিশনীতির ঘোর বিরোধী ছিল এবং ভারতীয় বিপ্লবপন্থী বৈদেশিকমন্ত্রী আজিমুল্লাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্য করবে ব'লে উৎসাহিতও করেছিল।

পারস্য থেকে সাহায্যলাভ সম্বন্ধে ভারতীয় বিপ্লবীরা এতই নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁরা ১৮৫৭ সালে যে ঘোষণা করলেন, তার ভাষা এইরূপ :—

The army of Persia is going to free India from the hands of the Feringhis. So. young and all, big and small, literate or illiterate, civil and military, all Hindusthanee brothers should leap forth into the field to free themselves from the Kaffirs*.

অর্থাৎ, পারস্যের সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষকে ফিরিংগীদের হাত থেকে স্বাধীন করতে চলেছে। অতএব, যুবক, বৃদ্ধ, ছোটো, বড়ো, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সামরিক ও অসামরিক সকল হিন্দুস্থানী ভাইদের কর্তব্য, এখন কাফেরদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া।

কিন্তু এই পারস্য বা রাশিয়া থেকে এই বৈদেশিক সাহায্য এসে পেঁছিল না। উপরন্তু যথাযথ সংগঠন কার্য, চতুর্দিকের কার্যাবলীর একই সময়ে, একইভাবে সুপরিচালন ও জাতীয় ঐক্যের অভাবে এবং ব্রিটিশপক্ষে ভারতীয়-

*Indian War of Independence of 1857 by an Indian Nationalist, page 65 or Kaye's Indian Mutiny, Vol. II, page 30.

রাজন্যবর্গের সহায়তার দরুন এবং ব্রিটিশের সংগঠন ও অস্ত্রশস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের জন্য সেদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের সম্পূর্ণরূপে পরাজয় ঘটেছিল।

জাপানের সহায়তালাভের চেষ্টা

ড. দাসের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ১৯০৫-১৯০৬ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের পর, এবং রুশ-জাপানের যুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই, বাঙলা ও মহারাষ্ট্র থেকে ভারতীয়বিপ্লবীরা জাপানের সহযোগিতা লাভের জন্য জাপানে যান; অন্ততপক্ষে তখন জাপানে পাশ্চাত্যশক্তির কবল থেকে ভারত, এমন-কি সমগ্র এশিয়ার মুক্তির জন্য ভারত ও জাপানের ভ্রাতৃসংঘ (Fraternal Association of Japan and India) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-সকল বিপ্লবীদের সংকল্প ছিল :—

"To free India, the Anglo-Japanese Alliance should be replaced by an Indo-Japanese-Chinese Alliance and Indian Independence is the prime requisite for Asian Independence."

অর্থাৎ, ভারতকে স্বাধীন করতে হ'লে চাই, ইঙ্গ-জাপানের মৈত্রীর বদলে 'চীন-ভারত-জাপান'-এর মৈত্রী স্থাপন এবং এশিয়ার স্বাধীনতার জন্য প্রধানতম প্রয়োজন ভারতের স্বাধীনতা।

ড. দাস বলেন যে, ভ্রাতৃসংঘের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১৯০৬ সাল থেকে জাপান এবং এশিয়ার মুক্তিকামী প্রত্যেক জাতির অনুমোদন ছিল, একথা তিনি জানেন। মারকুইস্ ওকুমা, ব্যারন কান্দা এবং এম্‌টেইয়ামা ও ব্যারন গোটো প্রভৃতি জাপানী রাজনীতিবিদগণ ভারত-জাপানের ঐক্যে বিশ্বাস করতেন।

সম্মিলিত এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস

ড. দাস বলেন যে, এযুগের জাতীয় নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত যে অন্তত চল্লিশ বৎসর আগে, রবীন্দ্রনাথ টোকিওতে সম্মিলিত এশিয়ার স্বাধীনতার উপর তাঁর নিজের বিশ্বাসের কথা যেদিন নির্ভীকভাবে ঘোষণা করলেন, তার দশ-বৎসর পূর্বে এবং ঠিক একই সময়ে ড. সান্-ইয়াত সান সাংহাই থেকে ঘোষণা করলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় চীনের সাহায্যে করা উচিত.

কেননা পরপদানত ভারতবর্ষ চিরদিন চীনের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার পথে কণ্টকস্বরূপ হয়ে থাকবে। এইপ্রকার মনোভাব থেকেই ভারত ও জাপানের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার কথা উঠেছিল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, জাপান ভারতের মিলন-প্রচেষ্টার একটা পুরাতন ইতিহাস রয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র লালা লাজপত রায়ই কেবল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কিছু পরিমাণে জাপানের সংস্পর্শে আসেন এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অতিরিক্ত চাপ সত্ত্বেও জাপান সেদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল, এ সম্পর্কে স্বর্গীয় রাসবিহারী বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা, তিনিই সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টার পথকে অনেকটা প্রশস্ত করে রেখেছিলেন।

চীনের সহিত যোগাযোগ সাধন

পণ্ডিত জওহরলালের চুংকিং যাওয়া এবং পরিবর্তে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের ভারতবর্ষে আসা, ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ সাধনের প্রথম চেষ্টা নয়। এ চেষ্টা বহুদিনের। 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' এবং ভারতের অন্যান্য ব্যক্তি, যাঁরা এখনো জীবিত আছেন, এবং যাঁদের নাম ড. দাস উল্লেখ করতে চান না, তাঁরা জওহরলালের চীনমহাদেশের সংগে সংযোগ বিধানের পথকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, এবং বস্তুতপক্ষে চিয়াং কাইশেক, ডাঃ সানই-য়াত সান, চীন সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ডাঃ টংশ্যাও ই, ইউনাইটেড্ স্টেট্ প্রভৃতির চীনামন্ত্রী ডাঃ উ. টিং ফাং প্রভৃতির রাষ্ট্রনীতিরই অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

সাময়িক স্বাধীন গভর্নমেণ্ট স্থাপন ও বৈদেশিক সহায়তা লাভ

সুভাষচন্দ্র যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাধারণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট স্থাপনের প্রস্তাব ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন, এবং যে প্রকার গভর্নমেন্ট তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সিংগাপুরে স্থাপন করেছিলেন; ভারতীয়

বিপ্লবীরা সেইপ্রকার গভর্নমেন্ট স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। এই গভর্নমেন্ট তখন কাবুল এবং পৃথিবীর বহুরাষ্ট্রের রাজধানী থেকে কাজ চালানোর চেষ্টা করেছিল। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে এইরকম স্বাধীন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত ও বিকৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিরূপে বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, এই অভিযোগ নিয়ে যুক্তরাস্ট্রে (United States) অবস্থিত অনেক ভারতীয় দেশসেবকদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

ড. দাস বলেন যে, ভারতের নেতৃবৃন্দের চেষ্টাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যে তিনি এই-সকল ঘটনার উল্লেখ করেছেন, একথা যেন কেউ না মনে করেন। তিনি এই কথা জোর করে বলতে চান যে, ভারতের রাজনীতির বর্তমান গতি. অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য আজকের দিনের যে আন্দোলন এবং বৈদেশিক শক্তির সংগে এই ব্যাপারে যোগাযোগ ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা সম্প্রতি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, সেটা ভারতের বৈপ্লবিক শক্তির ঐতিহাসিক ক্রমবর্ধমান এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ক্রমপরিণতির ফলেই হয়েছে, অর্থাৎ পরস্পর বিবদমান বৈদেশিকশক্তিসমূহ যখনই ভারতবর্ষকে নিজের স্বার্থে নিযুক্ত করার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেছে, তখনি তার সুবিধা গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন ভারতের বিপ্লবীদল।

ড. দাস বিশ্ব-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাই তিনি মনে করেন যে, জাতীয় আন্দোলনের চরম লক্ষ্য শুধু ভারতের স্বাধীনতা নয়, তার বৃহত্তর উদ্দেশ্য বিশ্বের স্বাধীনতা; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র জাতিও সাম্রাজ্যবাদী-শক্তির শাসনাধীনে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত, ভারতের স্থায়ী স্বাধীনতা বা বিশ্বের সত্যকার স্বাধীনতা আসতে পারে না।

ভারতীয় বিপ্লবীরা এই ধারণা থেকেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টার সংগে সংগে, সাম্রাজ্যবাদীশক্তির হাত থেকে সমগ্র এশিয়ার, তথা বিশ্বের মুক্তিলাভের কথা চিন্তা করেছেন, অর্থাৎ, তাঁরা যে পূর্বাপর ভারতবর্ষের বাইরে আপন আপন কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, এবং বৈদেশিকশক্তির সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছেন, তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। সুভাষচন্দ্র বিশ্বের ইতিহাস থেকে পাঠগ্রহণ করেছিলেন, তীক্ষ্নবুদ্ধি অনন্যমনা মেধাবী ছাত্রের মতো। আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় যে উত্থানপতনের বাস্তব দৃষ্টান্ত

তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে উপলব্ধি করেছিলেন, তারই প্রেরণায় তাঁর বিপ্লবীমন তাঁকে একদা গভীররাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিল, নিজের জীবন দিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালাভের জন্যে।

বৈদেশিক সাহায্যলাভের ব্যাপারে, সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তিনি স্বাধীন ভারতবর্ষের নায়করূপে ভারতের মানমর্যাদার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাকে কোনো কারণেই এমন-কি অত্যন্ত সংকট মুহূর্তেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি, বরং বর্তমান ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে, একথা জোর ক'রে বলা যায় যে, সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে স্বাধীন ভারতের জীবন্দশা স্বল্পকালীন হলেও, পৃথিবীর ইতিহাসে তার স্থান চিরস্থায়ী হয়েই থাকবে। যাঁরা এতদিন সুভাষচন্দ্রের বৈদেশিক সাহায্যলাভের সম্মানকর প্রয়াসকে তাঁবেদারি আখ্যা দিয়ে, সুভাষচন্দ্রকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেন, আশা করি আজ তাঁদের সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়েছে এবং যাঁরা মনে করতেন যে, ভারতের বাইরে গিয়ে অন্যজাতির সাহায্যে ভারতের মুক্তিলাভের চেষ্টা ন্যায়সংগত নয়; তাঁরাও আশা করি এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আজ সুভাষ-চন্দ্রের কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসাই করবেন।

জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে সম্বন্ধ

তা ছাড়া, আমাদের জেনে রাখা দরকার যে সুভাষচন্দ্র কোনো জাতির তাঁবেদারি করতে বিদেশে যান নি। দেশের মধ্যে কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের মন জুগিয়ে কাজ করতে পারলেন না বলে, কংগ্রেসের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান থেকে যিনি নিজেকে অনায়াসে বঞ্চিত করলেন, তিনি যাবেন জাপানের তাঁবেদারি করতে, এটা শত্রুপক্ষ ছাড়া কেউ বলবে না; জাপান বা জার্মানির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ধারণা, মতবাদ, আদর্শ ও কর্মপন্থার সম্পূর্ণ প্রভেদ ছিল। এই প্রসঙ্গে, একটা কথা মনে পড়ে। ১৯34 সালে 'নাজি'দল (Nazi Party) মিউনিকে সুভাষচন্দ্রকে পৌরসংবর্ধনায় সংবর্ধিত করবে ব'লে স্থির করে। কিন্তু সংবর্ধনার ঠিক আগের রাত্রে হিটলার ব্রিটিশের ভারতশাসন সম্পর্কে খুব প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দেন, তার ফলে সুভাষচন্দ্র শেষ মুহূর্তে এই সংবর্ধনা

প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেন, Hitler is at liberty to lick British boots. অর্থাৎ, হিটলার ব্রিটিশের জুতা চাটতে পারে।

হিটলারের সেই বক্তৃতার উত্তরে তিনি ডাবলিন (আয়ার্ল্যান্ড) থেকে British misrule in India. 'ভারতে ব্রিটিশের কুশাসন' এই নাম দিয়ে, বেতারে একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

সুভাষচন্দ্র গতযুদ্ধের সময় জার্মানিতে থাকাকালীন, কিভাবে মাথা উঁচু করে বেড়াতেন, তার পরিচয় আমরা পাই, বার্লিনপ্রবাসী একজন ভারতীয় মুসলমানের কথায়। তিনি বলেন :—

Whatever might have been Mr. Bose's politics, I am proud, that he kept very high his self-respect in Germany, and won German admiration for dignity, and was absotutely not like Grand Mufti of Jerusalem, who made himself cheap.

অর্থাৎ, মি. বসুর রাজনীতি যাই হোক-না-কেন, তিনি যে জার্মানিতে তাঁর আত্মসম্মানকে বহু ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন, এবং তাঁর মর্যাদাবোধের জন্য জার্মানির প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, এবং তিনি যে জেরুজালেমের গ্রান্ড মুফ্‌তির মতো নিজেকে সুলভ করেন নি, এজন্য আমি গর্বিত।

জাপানের সংগে ব্যবহারেও, সুভাষচন্দ্র এই মর্যাদাই রক্ষা করেছেন। ১৯৪৫, ১৫ আগস্ট তারিখে, জাপান আত্মসমর্পণ করেছে শুনে, তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছে বেতারযোগে তাঁর বাণী পাঠাতে চান। সিংগাপুরের জাপানী 'সেনসর' বললে যে, তিনি কী বলবেন, সেটা আগে তাদের পড়ে শোনানো উচিত। সুভাষচন্দ্র তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন, এবং সোজা আজাদহিন্দ রেডিওকক্ষে প্রবেশ করে তাঁর বেতারবক্তৃতা প্রদান করলেন। তিনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আত্মত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা ক'রে সেদিন সাময়িক ব্যর্থতায় তাদের বিচলিত হ'তে নিষেধ করেছিলেন।

বৈদেশিক প্রভুত্ব থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য তিনি আমেরিকা, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মতো বৈদেশিক-শক্তির সাহায্যলাভের চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের দিক দিয়ে অন্য শক্তির অপেক্ষা, বরং রাশিয়ার সংগেই তাঁর মিল ছিল বেশি। তাঁর জীবনের রাজনৈতিক প্রচেষ্টা, প্রধান প্রধান রুশনেতার সংগে তাঁর বন্ধুত্ব এবং মার্শাল স্তালিনের কাছ থেকে মস্কো যাওয়ার আমন্ত্রণ পাওয়া থেকেই, সেটার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যদিও জাপান ও জার্মানি আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের মিত্রশক্তি ছিল, কিন্তু রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে সংগ্রামে রত না হলে সুভাষচন্দ্র আজাদহিন্দ গভর্নমেন্টের স্বাতন্ত্রই প্রমাণ করেছেন, এবং আমাদের মনে হয় ব্রিটিশের সঙ্গে আমেরিকা এতখানি মাখামাখি না করলে, হয়তো তার বিরুদ্ধে আজাদ-হিন্দ গভর্নমেন্ট যুদ্ধ ঘোষণা করত না।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দিয়ে এযাবৎকাল যে মিথ্যা কথা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে রটেছিল, তার মূল ছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের চিরাচরিত প্রচারনীতি ও চালবাজি।

সুভাষচন্দ্র বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্য দেশত্যাগ করলেও, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যখন দেশে ফিরবেন, তখন দেশবাসী, দল ও মত-নির্বিশেষে তাঁর সহায়তা করবে। তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই তারিখে বর্মাপ্রবাসী ভারতবাসীগণ-কর্তৃক উদ্‌যাপিত নেতাজী সপ্তাহে বিরাট জনসভায় তাঁর বক্তৃতায়। তিনি বললেন :—

I am so very hopeful and opitmistic about the outcome of our struggle, because I do not rely on the efforts of three millions Indians in East Asia. There is a gigantic movement going on inside India and millions of our countrymen are prepared for maximum suffering and sacrifice in order to achieve liberty.

অর্থাৎ, আমাদের এই সংগ্রামের ফল সম্বন্ধে আমি খুবই আশান্বিত, কারণ, আমি পূর্বএশিয়ার ৫০ হাজার সৈন্যর উপরই শুধু নির্ভর করি না। ভারতবর্ষে আজ বিপুল আন্দোলন চলেছে এবং সেখানকার লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বোত্তম ত্যাগ ও চরম দুঃখ ভোগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

তিনি আরো বললেন :—

We should have but one desire today ; the desire to die, so that India may live, the desire to face a martyr's death, so that the path of freedom may be paved with the martyr's blood.

Friends, my comrades in the war of Liberation, today I demand of you – one thing, above all. I demand of you— blood. It is blood alone that can avenge the blood, that the enemy has spilt. It is blood alone that can pay the price of freedom. Give me blood and I promise you freedom.

অর্থাৎ, আজ আমাদের মাত্র একটি কামনাই থাকা উচিত, ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য নিজের প্রাণ বলিদানের কামনা, শহীদের মতো মৃত্যুবরণের কামনা, যাতে স্বাধীনতার পথ শহীদের রক্তে নির্মিত হতে পারে।

(বন্ধুগণ, মুক্তিসংগ্রামের সহকর্মীগণ, সকলের উপর একটি জিনিস আজ তোমাদের কাছ থেকে দাবি করব। তোমাদের কাছ থেকে আমি চাই রক্ত। শত্রু যে রক্তপাত করেছে তার একমাত্র প্রতিশোধ রক্তদান। স্বাধীনতার মূল্য একমাত্র দিতে পারে আমাদের রক্ত। আমাকে রক্ত দাও— আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি দিব তোমাদের স্বাধীনতা।)

অন্য দিকে ব্রিটিশের অনুগত ভারতীয় সৈনিকরা বলছে:—

We will shoot and shatter the fellow Subhaschandra Bose or any of his soldiers, if we happen to see them. They were puppets of the Japanese, whom we have defeated. They have done a lot of atrocities to our people in East Asia and enslaved them to the Japanese who have murdered hundred of thousand of our people. We have come here to liberate you all. The cruel Chinese and the lazy Malayees will learn their lessons soon from us for having ill treated you Iudians here.

অর্থাৎ, সুভাষচন্দ্র বসু লোকটাকে, কিংবা তার কোনো সৈনিককে দেখতে পেলেই গুলি করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। যে জাপানীদের আমরা পরাজিত করেছি, তারা তাদেরই হাতের পুতুল বিশেষ। পূর্বএশিয়ায় আমাদের লোকদের উপর, তারা যথেষ্ট অত্যাচার করেছে, তারা জাপানীদের কাছে, তাদের ক্রীতদাস করে দিয়েছে— যে জাপানীরা আমাদের শতসহস্র সৈনিকদের হত্যা করেছে। তোমাদের সকলকে মুক্তি দিতে আমরা এখানে এসেছি। নিষ্ঠুর চীনা ও অলস মালয়ীরা অতিবিলম্বে ভারতীয়দের প্রতি এই দুর্ব্যবহারের জন্য আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পাবে।

এইভাবে, মিথ্যা প্রচারকার্যে তাদের শিক্ষিত করা হয়েছিল। ভারতের জাগ্রত মনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না। কূপমণ্ডূকের মতো সংকীর্ণ জ্ঞান থাকায়, তারা ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখত না। পেটের দায়ে সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়ে তারা গিয়েছিল যুদ্ধ করতে, কিন্তু কাদের দেশরক্ষার জন্য তারা যুদ্ধ করছিল, সে কথা বোধহয় তারা জানত না।

এরকম মিথ্যা প্রচারের কথা, নেতাজীরও অবিদিত ছিল না, তাই তিনি ১৯৪৩ সালের জুনমাসে টোকিওতে এসে, ভারতবাসীদের কাছে বেতারযোগে বক্তৃতা দিলেন :—

Believe me, when I say that, I am an Indian for Indian. The crow is the most cunning and cruel among the birds, the fox among the animals, and the British imperialist is among the human beings. If such a British cannot deeive me I tellyou that there is no other power on earth, who can even dream of deceiving me. Nevertheless I am fully aware of the doubts in your minds. I call upon you, Indians of East Asia to rally round under one flag for that noble cause of the freedom of our Mother Hindusthan. India is one country. Indians are one nation. Our only flag is the tricolour flag. Our only enemy is Britain. March on to Delhi and hoist the tricolour flag on the Red Fortress. I expect you to keep up the chivalrous and heroic traditions of Hindusthan.

অর্থাৎ, আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমি বলছি যে আমি ভারতবাসী, ভারতের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষাই আমার লক্ষ্য। পাখিদের মধ্যে কাক, পশুদের মধ্যে খেঁকশিয়াল, মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সর্বাপেক্ষা ধূর্ত ও নিষ্ঠুর। যদি সেই ব্রিটিশ আমাকে প্রতারণা করতে না পারে, তাহলে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো শক্তি নাই, যারা আমাকে প্রতারণা করার কল্পনাও করতে পারে। যাই হোক, আপনাদের মনের সন্দেহ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। আমি আপনাদের, অর্থাৎ পূর্বএশিয়ার ভারতীয়দের আহ্বান করছি, আমাদের ভারতমাতার মুক্তির জন্য একই পতাকার নিম্নে, আপনারা সমবেত হউন। ভারতবর্ষ একটি অখন্ড দেশ। ভারতীয়েরা একটি অবিভাজ্য জাতি; আমাদের একমাত্র পতাকা ত্রিবর্ণ পতাকা; আমাদের একমাত্র শত্রু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন, দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হউন, লালকেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিন। আশা করি আপনারা হিন্দুস্থানের শৌর্য ও বীরত্বের যে ঐতিহ্য আছে, তার মর্যাদা রক্ষা করবেন।

নেতাজী ও তাঁর সেনাবাহিনীর নামে আর-একটি মিথ্যা প্রচার করা হ'ত; সেটি হচ্ছে এই যে, বলপূর্বক নির্যাতন ক'রে লোকদের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হ'ত; সেটি যে কতখানি মিথ্যা, কুয়ালালামপুর (মালয়)-নিবাসী

মিঃ কে. বি. সুব্বাইয়া, ভারত গভর্নমেন্টের মালয়স্থ সরকারী প্রতিনিধির কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে আমরা জানতে পারি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ঝান্সীরানী বাহিনী ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সামরিক পরিদর্শন অনুষ্ঠানে সর্বাধিনায়ক নেতাজী বসু অভিনন্দন গ্রহণ করলেন; সেই ঐতিহাসিক দিবসে স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট এবং স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীর প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল।

নেতাজীর দর্শনলাভ করে এবং তার বক্তৃতা শুনে সকলেই বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়ল। নেতাজীও খুব বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হ'ল। পূর্ণ পনেরো মিনিট কাল, কেউ এক ইঞ্চি নড়ল না, কোথাও এতটুকু শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না। এই পনেরো মিনিটকাল স্বাধীন ভারত গভর্নমেন্ট ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠা এবং ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সমর্থনে, সেই বিরাট জনতা হাত তুলে থাকল। নেতাজীর আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে হাত তারা নামালে না।

ব্রিটিশের ভারতীয় সৈন্যগণ (যুদ্ধবন্দীর দল) দলে দলে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়ে নেতাজীর সম্মুখে নতজানু হয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানালে।

নেতাজী বলতে লাগলেন :—

I have nothing to give but hunger, difficulties and a very hard fight. You will have to sacrifice your all before you reach the Red Fortress to hoist our National flag. The way is long and difficult. I do not force anyone to join me. But the patriotic Indians will know their duties. Those who have no courage, and who cannot endure the utmost difficulties, can go away from I.I.L. and I.N.A., and I assure them that, they will not be criticised. For I want only tried and tested men and women, who could make history.

অর্থাৎ, ক্ষুধা, সংকট এবং অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম ছাড়া আমার দেবার মতো

অন্য কিছুই নেই। লালকেল্লায় জাতীয়পতাকা উড়াবার আগে, তোমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে। এ পথ অতি দীর্ঘ ও বিপদসংকুল। আমার সংগে যোগদান করতে আমি কাউকে বাধ্য করছি না। কিন্তু দেশহিতৈষী ভারতীয়েরা, তাঁদের কর্তব্য কি জানেন। যাদের কোনো সাহস নেই, যারা চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী থেকে চলে যেতে পারে এবং আমি তাদের কথা দিচ্ছি যে, তাদের সম্বন্ধে কোনো সমালোচনাই হবে না। কারণ আমি একমাত্র সেই পুরুষ ও মহিলাদেরই চাই, যারা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ; দুঃখের কষ্টিপাথরে যাদের যাচাই হয়েছে ; যারা ইতিহাস রচনা করতে পারে।

"Recruits have come to us from every corner of East Asia ; from China, Japan, Indo-China, Philippines, Java, Borneo, Celebes, Sumatra, Malaya, Thailand and Burma."

অর্থাৎ, চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন্‌স্‌, জাভা, বোর্নিও, সেলিবিস, সুমাত্রা, মালয়, থাইল্যান্ড এবং বর্মা প্রভৃতি পূর্বএশিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে লোকেরা আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছে।

নেতাজীর এই কথায় বোঝা যায় যে, তাঁর প্রভাব পূর্বএশিয়ার দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল, তিনি অল্পকাল মধ্যেই প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা থেকে একমাত্র অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও আত্মশক্তি বলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে, মুক্তিসংগ্রামের যে সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যাশ্চর্য অধ্যায়টি রচনা করলেন, ব্যক্তি-সাফল্যের অম্লান গৌরবে সমগ্র পৃথিবীর কাছে তা চিরদিন বিস্ময়ের সামগ্রী হয়ে থাকবে। সুভাষচন্দ্র চিরকালই আশাবাদী ; কোনো প্রতিকূল অবস্থা, সাময়িক ব্যর্থতা বা আশাভংগে তিনি কখনো নিজের সংকল্প ত্যাগ করতেন না, বরং চিত্তের দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় তাঁকে অতি দুরূহ সংকট থেকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত।

১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগদান ক'রে সুভাষচন্দ্র তাঁর বিপ্লবীজীবনের প্রথম অধ্যায়ের সূচনা করেন, তার চরম পরিণতি ঘটে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সম্মান রাষ্ট্রপতির পদে উপর্যুপরি দুই-দুইবার নির্বাচনে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের রোমাঞ্চকর তৃতীয় অধ্যায়ে সূচিত হয় তাঁর গৃহত্যাগ ও বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতালাভের চেষ্টায়। তাঁর বিপ্লবী জীবনের চতুর্থ

অধ্যায়ে ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁকে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে দেখা গেল।

আজ দলনির্বিশেষে ভারতবাসী তাঁর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার সংগে অভিনন্দন জানায়, ভারতের নরনারী ও শিশু, নেতাজীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে দিন কাটায়। তাঁর একক জীবনের দুশ্চর্য তপস্যার কথা, তরুণের মনকে বিহ্বল ক'রে দেয়।

পাঁচবছরের ছেলে, কার ঘুড়ি ছিঁড়ে 'ন্যাশন্যাল ফ্ল্যাগ' বা জাতীয়পতাকা তৈরি করে, বাড়ির সামনের ঘাসেছাওয়া উঠানটিতে দড়ি টাঙিয়ে তোরণ তৈরি করে, বলে; "নেতাজী আসবেন।" 'জয়হিন্দ' বলে 'অ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়ায়। মাসিক পত্রিকা ও খবরের কাগজ খুঁজে খুঁজে, নেতাজীর ছবি বের করে বলে, বাবা, এমনি পোশাক পরে কি নেতাজী আসবেন? তার খেলার সাথীদের মুখেও অবিরাম শুনি; "জয়হিন্দ, নেতাজী জিন্দাবাদ।" কবে ফিরে আসবেন নেতাজী, এইটিই একমাত্র প্রশ্ন; বেঁচে আছেন কিনা, এ প্রশ্ন শিশুর মনেও জাগে না। ছোট্ট শিশুও নেতাজীর ছবি দেখলে, তার অর্ধস্ফুট ভাষায় "জেই ইন্দ" বলে সারা বাড়িতে 'লেফ্‌ট্‌ রাইট্‌' করে বেড়ায়। মেয়েরা গান গায়, 'কদম কদম বাড়ায়ে যা', 'দিল্লী চলো দিল্লী চলো।' এমনি ভাবের খেলা চলছে সারা পাড়ায়, সারা শহরে ও পল্লীতে। কোথা থেকে এল এই ভাবতরঙ্গ? ছোটো ছোটো ছেলেরা, খেলার মাঠে নিজেদের মধ্যে একজনের নায়কত্বে প্রতিদিন 'ড্রিল' করে, হাতে তাদের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয়পতাকা। বিস্ময়ে ও আনন্দে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভাবি, অনাগত ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করছে বর্তমানের এই শিশুর দল। আমাদের খেলা তো শেষ হয়ে এসেছে। এবার যে খেলার আয়োজন চলছে প্রতীক্ষমাণ দেশের অন্তরে ও বাহিরে, তার সূচনা হয়েছে উষার মাঙ্গলিকে। শেষও হবে সন্ধ্যাপ্রদীপের মংগল আরতিতে। সেই শুভক্ষণে, চিরপ্রার্থিত সেই প্রিয়তম অতিথির দেখা আমরা পাবই পাব। সুভাষচন্দ্র আজ দেশের সর্বস্থলে 'নেতাজী' রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত; তাই আবালবৃদ্ধবণিতার কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে:

জয়হিন্দ।

নেতাজী জিন্দাবাদ।

প রি শি ষ্ট

দেশনায়ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধশক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণদেশে রোগের মতো তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে, আপনাকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন ক'রে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল করে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে, তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রযুপ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর-বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এইরকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে

আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্য-ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনী-শক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে ; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি ; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর-বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলাদেশ যত-কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত করে তুলবে, এই চাই। আপাতপরাভবকে অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারি দিকেই দেখতে পাই বাংলাদেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই ; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে, তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছিবই, যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব 'যদি', কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচাতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপর মাথা তুলবে। (তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচালিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব-মুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে, অসন্দিগ্ধ দৃঢ়-

কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্ম-সংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে; হীনতা লজ্জিত ও দীনতা বিকৃত হোক তোমার আদর্শে, জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।)

বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম-উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যাবুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমস্ত দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্র সন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য; ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতা মাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতউদ্যত ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্বপদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তি-স্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কিনা এ নিয়ে সেদিন বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তীকালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল করে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চির-দিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রসাদ দেখা দিয়েছিল, তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে।

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয়, সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে ; বাঙালীর স্বভাবে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনা-বৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই-সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর করে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত করে নব বসন্তে তার নূতন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

বলতে পার, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। সে কথা সত্য। বহুলোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হতে পারলে তবেই হবে অসাধ্যসাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি, তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে, আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সংগে সংগে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই, রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক ; তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর-এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর-এক আকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে

তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তার পরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।

[সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাষণ, ১৩৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্তু তখন উহা প্রচার হয় না। —আনন্দবাজার পত্রিকা। পরে 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।]

'হুকুমনামা' ও 'বাণী'

সুভাষচন্দ্রের 'তরুণের স্বপ্ন' সফল হয়েছে নেতাজীর জীবনে। কংগ্রেসী সুভাষবাবু, অসহযোগী সুভাষচন্দ্র, সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে পূর্বএশিয়ায় আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তির জোরে, এমন একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান করে নিয়েছিলেন, যাতে অগণিত ভারতীয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য পেয়েছিলেন তিনি স্বতঃস্ফূর্ত নিবেদনের পরম আগ্রহে। তিনি কঠোর সামরিক সংস্থানের মধ্যে নিজের চারিত্র মাধুর্যে যে মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলেন, বর্ণবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তার অসংখ্য চিত্র এখানে অঙ্কিত করতে পারা যেত, কিন্তু তার সুযোগ এখানে স্বভাবতই সীমাবদ্ধ, তবুও নেতাজীর অসংখ্য 'হুকুমনামা' ও 'বাণী' এবং 'বিদ্রোহিনী মেয়ে'র রোজনামচার মধ্য থেকে মাত্র কিছু কিছু অংশ বঙ্গানুবাদ-সহ এখানে উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মহান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গৌরবময় স্বল্পকালীন সামরিক জীবনের আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব :—

July 5, 1943 : Address at Military Review :

'Soldiers of India's Army of Liberation :

Today is the proudest day of my life. Today it has pleased Providence to give me the unique honour of announcing to the whole world that India's Army of Liberation has come into being. This Army has now been drawn up in military formation on the battle field of Singapore, which was once the bulwark of the British Empire. This is the Army that will emancipate India from British Yoke.

Comrades, my Soldiers, let your battle-cry be— To Delhi ; To Delhi. How many of us will individually survive this war of freedom, I do not know. But I do know this, that we shall ultimately win and our task will not end until our surviving heroes hold the victory parade in the Lalkilla of ancient Delhi. Throughout my public career, I have always felt that, India is otherwise ripe for independence in every way, but she lacks one thing : an army of liberation.

Comrades, you are today the custodians of India's national honour, and the embodiment of India's hopes and aspirations. So conduct yourselves that your countrymen may bless you and posterity may be proud of you. I assure you that I shall be with you in darkness and in sunshine, in sorrow and enjoyment, in suffering and in victory. For the present, I can offer you nothing except hunger, thirst, suffering, *forced marches* and death. It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free. May God now bless our Army and grant us victory in the coming fight."

৫ই জুলাই, ১৯৪৩ ; সামরিক পরিদর্শনে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ :

"ভারতের মুক্তিফৌজের সৈনিকগণ, আজ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের দিন। বিধাতার অনুগ্রহে আজ আমি অদ্বিতীয় সম্মানে সম্মানিত, কারণ, আমি আজ সমগ্র পৃথিবীর সমক্ষে ঘোষণা করছি, যে, ভারতের মুক্তির জন্য জাতীয়বাহিনী গঠিত হয়েছে। এই সৈন্যবাহিনী আজ সামরিক কায়দায় সিংগাপুর যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়েছে—এই সিংগাপুরই একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ দুর্গ ছিল। এই জাতীয়বাহিনীই ব্রিটিশের দাসত্ব-শৃংখল থেকে মুক্ত করবে।

বন্ধুগণ, আমার সৈনিকগণ, তোমাদের রণ-আহ্বান হোক— দিল্লী চলো দিল্লী চলো। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে ক'জন যে এই যুদ্ধে বাঁচবে, তা আমি জানি না, তবে এটা আমি জানি যে, অবশেষে আমরা জয়ী হব এবং যতদিন পর্যন্ত না আমাদের মধ্যেকার জীবিত সৈনিকগণ পুরাতন দিল্লীর লালকিল্লায় গিয়ে বিজয়গর্বে সামরিক উৎসব না করে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ হবে না। আমার রাজনৈতিক জীবনে সর্বদা আমি এটা অনুভব করছি যে, অন্য বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার উপযুক্ত হলেও, একবিষয়ে তার অভাব আছে, সেটা হচ্ছে মুক্তিসেনাবাহিনী।

বন্ধুগণ, তোমরা আজ ভারতের জাতীয় মর্যাদার রক্ষক, তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। অতএব এমনভাবে চলো, যাতে দেশবাসী তোমাদের আশীর্বাদ করে, ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা তোমাদের সুদিনে দুর্দিনে, তোমাদের দুঃখে ও আনন্দে, তোমাদের জয়লাভ ও যন্ত্রণাভোগের মধ্যে সর্বদা তোমাদের সংগী

হব। আপাতত তোমাদের দিবার মতো আমার কিছু নেই, আজ আমি তোমাদের দিতে পারি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দুঃখভোগ, কষ্টসাধ্য যুদ্ধযাত্রা— ও মৃত্যু। কিছু এসে যায় না— আমাদের মধ্যে কে ভারতকে স্বাধীন দেখবার জন্য বেঁচে থাকবে। ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হবে এবং আমরা ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য যে সর্বস্ব দান করব এইটাই যথেষ্ট। ভগবান আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আশীর্বাদ করুন, যেন তারা আগামী সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে।

Sept. 22, 1944 : Address on Jatin Das Anniversary and Martyrs' Day Ceremony :

"Our motherland is seeking liberty. She can no more live without liberty. But liberty demands sacrifice at its alter. Liberty demands the unstinted sacrifice of your strength, your wealth, all that you value, all that you possess. Like the revolutionaries of the past you must sacrifice your ease, your comfort, your pleasure, your cash, your property. You have given your sons as soldiers for the battlefields. But the Goddess of Liberty is not yet appeased. I shall tell you the secret of pleasing her. Today she demands not merely fighters, soldiers for the Fouj. Today she demands rebels— men rebels and women rebels who, will be prepared to join Suicide Squad, for whom death is a certainty, rebels who will be ready to drown the enemy in the streams of blood that shall flow from their own body.

'*Tum hum ko khun deo, mai tumko Azadi doonga*'

'You give me your blood, I shall get you freedom, that is the demand of liberty.' Shouts arose from the audience spontaneously : "We are ready, we shall give our blood, take it now." Netaji continued : "Listen to me, I do not want your emotional approval. I want rebels to step forward and sign this Suicide Squad oath, this document which is an appointment with death on the alter at the Goddess of Liberty."

"We are ready to sign", came back the answer from every corner of the hall.

"But you cannot sign an appointment with death in ordinary ink. You shall have to write with your own blood. Step up those who dare. I am here to witness your blood shed for the liberty of our Motherland."

The vast andience suddenly was on its legs and frantic humanity surged towards the platform..."

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ ; যতীন দাসের মৃত্যুবার্ষিকী ও শহিদ দিবসে প্রদত্ত নেতাজীর ভাষণের অংশ :—

"আমাদের দেশমাতা চান স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া তিনি আর বেঁচে থাকতে পারেন না। সেই স্বাধীনতা চায় দেশমাতৃকার পাদপীঠে আত্মবলিদান। স্বাধীনতার জন্য চাই তোমাদের অকুণ্ঠিত আত্মত্যাগ, তোমাদের শক্তি, তোমার সম্পদ, তোমাদের কাছে যা মূল্যবান, তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য। সেদিনের বিপ্লবীদের মতো ত্যাগ করতে হবে তোমাদের স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগবিলাস, তোমাদের অর্থ, তোমাদের সম্পত্তি। সন্তানদের তোমরা দান করেছ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরূপে। কিন্তু তাতে মুক্তিদেবতা এখনো তুষ্ট হন নি। কী উপায়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায়, তার সন্ধান আমি তোমাদের দেব। আজকের দিনে তিনি যোদ্ধা চান না, ফৌজের সেনা চান না, আজ তিনি চান বিদ্রোহীদের— যারা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মনাশসংঘে যোগ দিতে প্রস্তুত তিনি চান সেই বিদ্রোহীর দলকে, যারা নিজেদের দেহের রক্তস্রোতে শত্রুকে ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত হবে। তুম হামকো খুন দেও, হাম তুমকো আজাদী দুংগা : তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। স্বাধীনতার এই হচ্ছে দাবি।"

শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি উঠল, 'আমরা প্রস্তুত, আমরা আমাদের রক্ত দেব, এখনি গ্রহণ করুন আমাদের রক্ত।'

নেতাজী বলতে লাগলেন, "আমার কথা শোনো, আমি তোমাদের আবেগ ও উত্তেজনাপ্রসূত স্বীকৃতি চাই না। আমি চাই বিদ্রোহীর দল অগ্রসর হয়ে আসুক, আত্মনাশসংঘের প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করবার জন্য, মুক্তিদেবতার বেদীতলে মৃত্যুবরণ করার প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষরিত হবে এই পত্র।"

"স্বাক্ষর করার জন্য আমরা প্রস্তুত"— এই উত্তর এল হলঘরের চারিদিক থেকে। নেতাজী বললেন :—

"কিন্তু মৃত্যুবরণের প্রতিজ্ঞাপত্রে সামান্য কালি দিয়ে তোমরা স্বাক্ষর করতে পার না। স্বাক্ষর করতে হবে নিজেদের রক্ত দিয়ে। যার সাহস আছে, এগিয়ে এসো। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তোমাদের রক্তপাত দেখবার জন্য আমি এখানে নিজে দাঁড়িয়ে আছি।"

উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সহসা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং সভামঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেই বিরাট জনসমুদ্র উদ্‌বেল হয়ে উঠল।

Sept. 27. 1944. ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪

I met Subhas Babu at the Headquarters today. He was going out and I was coming in. I smartly came to attention and saluted 'Jai Hind'. He stopped, asked about my wounds, and said nice things about P. ... I told him that Delhi Radio had called him a dreamer.

Netaji was silent for a minute, then he replied, and the words were so softly spoken, they were not spoken in anger, they were words in which he put his soul. He said, "They call me a dreamer, do they ? But I confess that I am a dreamer. I have always been a dreamer, even when I was a child. I have been a dreamer of dreams, but the dream of all my dreams, the dearest dream of my life has been the dream of freedom for India. They think it is a discredit to be a dreamer. I take pride in being one. They do not like my dreams. But that is nothing new. If I did not dream dreams of India's freedom, I would have accepted the chains of slavery as something eternal. The real crux of the question is, can my dreams become realities ? I submit they have increasingly become realities. The Army is one such dream come true. You with your husband is another. No, I do not mind being a dreamer. The progress of the world has depended on dreamers and their dreams, not dreams of expliotation and aggrandisement and perpetuating injustice, but dreams of

progress, happiness for the widest masses, liberty and independence for all nations."

And he stepped away, What a grandman he is. (Jai Hind)

হেড্‌কোয়াটার্সে সুভাষবাবুর সংগে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আসছিলাম ভিতরে। আমি চকিতে সামরিক কায়দায় 'জয়-হিন্দ' বলে তাঁকে অভিবাদন ক'রে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি থামলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ঘা'টা কেমন আছে ; 'পি' সম্বন্ধে অনেক মিষ্ট কথা বললেন। আমি বললাম, দিল্লী রেডিও তাঁকে বলেছে স্বাপ্নিক।

নেতাজী মিনিটখানেক চুপ ক'রে থাকলেন। তারপর উত্তর দিলেন, অতি কোমল সে কণ্ঠের স্বর, ক্রোধ নয়, তিনি অন্তর দিয়ে কথা ক'টি বললেন :—

"তারা বলে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি স্বাপ্নিক। কেমন ? তারা বলে ? কিন্তু আমি স্বীকার করি আমি স্বাপ্নিক। আমি চিরকাল স্বপ্ন দেখেছি, এমন-কি, আমার শৈশবেও। সারা জীবন স্বপ্নই দেখেছি, কিন্তু আমার সকল স্বপ্নের সেরা স্বপ্ন, আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্বপ্ন, ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন। তারা মনে করে স্বাপ্নিক হওয়া খুব একটা অখ্যাতির কথা। কিন্তু আমি তাতে গৌরব বোধ করি। তারা পছন্দ করে না আমার স্বপ্ন ; এতে নূতনত্ব কিছু নেই। আমি যদি ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন না দেখতাম, আমি তা হলে চিরদিনের জন্যে দাসত্বের শৃংখল বেছে নিতাম। আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, আমার স্বপ্ন কি সফল হতে পারে ? আমি বলছি, আমার স্বপ্ন ক্রমশ বহুলাংশে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তার প্রমাণ এই সৈন্যবাহিনী ; স্বপ্ন যে সত্য হয়েছে তার অপর একটি প্রমাণ তুমি ও তোমার স্বামী। না, আমি যে স্বাপ্নিক, তাতে আমি কিছু মনে করি না। সমস্ত পৃথিবীর অগ্রগতি নির্ভর করেছে স্বাপ্নিক ও তাদের স্বপ্নের উপর ; শোষণ, আত্মপ্রসারের স্বপ্ন নয়, অবিচারকে কায়েমী করার স্বপ্ন নয়, প্রগতির স্বপ্ন, অগণিত জনসমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন, সমগ্র জাতির মুক্তি ও স্বাধিকারের স্বপ্ন।

'জয়হিন্দ' আমাদের জাতীয় অভিবাদন, যখনই ভারতবাসীর সংগে ভারতবাসীর সাক্ষাৎ হয়।

টিপু সুলতানের স্মৃতিবিজড়িত 'ব্যাঘ্র' আমাদের শাসনতন্ত্রের প্রতীক।

চরকা-সংবলিত 'ত্রিবর্ণ' পতাকা আমাদের জাতীয় পতাকা।

"চলো দিল্লী" আমাদের রণহুংকার; "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" ও "আজাদহিন্দ জিন্দাবাদ" আমাদের জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'জয় হোক' আমাদের জাতীয় সংগীত।

বিশ্বাস, একতা, বলিদান আমাদের আদর্শ বাক্য।

আরজি হুকুমত-ই-আজাদ হিন্দ

(স্বাধীন ভারতের সাময়িক গভর্নমেণ্ট)

সুভাষচন্দ্রের লিখিত দুখানি বাংলা পত্রের অনুলিপি ও ইংরাজীতে লিখিত একখানি পত্র

C/o. Dr. N.R. Dharmavir
Dalhousie, Punjab
৩।৭।৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আমার মুক্তির পর আপনার 'কবিতালিপি' যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তার-জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। উত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল বলিয়া আপনি কি ভাবিতেছেন জানি না।

আপনি আজকাল কি করিতেছেন? সাহিত্যের দিক দিয়াই বা কি করিতেছেন? ছাপাখানার কাজ কি এখনও চালাইতেছেন? আপনার খবর পাইতে ইচ্ছা করি।

এখানে আসিয়া আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা কতকটা ভাল। আপনি কেমন আছেন? আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি।

ইতি
আপনাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

Dalhousie (Punjab)
১০।৮।৩৭

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার ৮।৭ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। তার সঙ্গে আপনার 'আহিতাগ্নি' ও 'মনোমুকুর' পাইয়াছি। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। ইয়ুরোপে থাকিতে আপনার রচিত 'মনীন্দ্রচন্দ্র' পাইয়াছিলাম; একথা আমার বেশ স্মরণ আছে। কিন্তু অন্য দুইটী বইর কথা বলিতে পারিতেছি না। আপনি যে সাহিত্য চর্চা এখনও রাখিতে পারিয়াছেন এবং তাহা হইতে আনন্দ পান—ইহা সুখের বিষয়। মনের খোরাক যতদিন জোগাইতে হয় ততদিন বুঝিতে হইবে যে মনের সজীবতা আছে।

ওয়ার্ধা সিদ্ধান্তের বিষয় কিছু বলি নাই কারণ তখন বলিবার দরকার

ছিল না। সময়ে ২ 'Silence is golden'— এই নীতিই ভাল। তবে আমার মতামত এই মাসের (august) 'মডার্ন' রিভিউ'তে লিখিয়াছি— হয়তো দেখিয়াছেন।

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল— কিন্তু আরোগ্য ধীরে ২ হইতেছে— তাই এখানে আরও কিছুকাল থাকিতে হইবে। আশাকরি আপনাদের কুশল। আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

ইতি
আপনাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

(True Copy)

Censored and passed
Sd/ Illegible
1/11,
for D.I.G. I.B., C.I.D.,
Bengal

C/o. The Superintendent
King Edward Sanatorium
Bhowali, U.P.
25. 10. 32

My dear Sabitri Babu,

Your kind letter of 12. 9. 32 reached me when I was at Madras. I am sorry I have not been able to reply to you earlier. Please accept my Vijaya love and embraces.

As soon as I got your letter, I wrote to Mr. Santosh Kumar Basu about your case. I received a reply from him on 17. 10. 32 in whlch he has promised to do his best for you. Hereafter please ask Kiron Babu or some other friend to remind him about your case when necessary.

Why were you so apologetic in your letter ? If I can be of any service to any one even in my present predicament, it will be a source of joy to me. I hope and pray that your financial difficulties may be gradually removed, so that peace of mind may be restored to you. If you can somehow overcome your present

financial difficulties, you should not fret because you were compelled to close down your old business.

Please excuse my writing in English which is meant for facilitating the work of the Local Police Censor. I arrived here about a fortnight ago. It is very bright and cheerful here. It will naturally take sometime to get rid of my long-standing troubles but I hope to improve during my stay here. My difficulty is that the sanatorium will shut down on December 15 and will not reopen till March next year.

Kindest remembrances to all friends.

Yours V. affectionately
Subhas.

Sjt. Sabitri Prasanna Chatterji
39A, Bokul Bagan Rd., Bhowanipore,
Calcutta